ভারতের নদ-নদী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারতের নদ-নদী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BHARATER NAD NADI
(Rivers of India)
Dilip Bandyopadhya

প্রকাশকাল : মে, ১৯৮৪

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অদ্রীশ বর্ধন
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

চিত্রাঙ্কন :
শ্রীনির্মল কর্মকার

প্রচ্ছদ :
শ্রীপূণ্যব্রত পাবলো পত্রী

মূল্য : আঠারো টাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

পদ্মশ্রী অমিতাভ চৌধুরী
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

ভূমিকা

আমার শৈশব কেটেছে নদীনালা-অধ্যুষিত বাংলাদেশের জলজ আবহাওয়ায়। স্বভাবতই নদীকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতি। তাই ছোটবেলার কোন কথা মনে পড়লেই স্মৃতির পটভূমিকে প্লাবিত করে ভেসে ওঠে এক বিস্তৃত ও বিস্মৃত নদীর স্মৃতি। কে জানে হয়তো এভাবেই নদী তার স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে আমার স্মৃতি-সত্তা ও ভবিষ্যতে। আর হয়তো এ কারণেই আমার মধ্যে অনুভব করেছি নদীর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। যতদূর মনে পড়ে খবরের কাগজে জীবনের প্রথম নিবন্ধও লিখেছি জলপাইগুড়ির বন্যাকে কেন্দ্র করে। শুধু টুকরো প্রবন্ধ নয়, নদীকে ঘিরে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখবার তাগিদ বোধ করেছি বহুদিন ধরে। তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্মকর্তা শ্রীদিব্যেন্দু হোতা যখন আমাকে 'ভারতের নদ-নদী' নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করবার প্রস্তাব দিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে সাগ্রহ সম্মতি জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বইটি লিখতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার অফিস থেকে শিলংয়ে বদলির অরডার এলো। তাই লিখবার মালমশলা সংগ্রহের কাজে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেলাম। ফলে বইটির আয়তন ক্ষীণকায় হলো; অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও সংক্ষেপ করতে হলো। যাই হোক, আশা রাখি, পরবর্তী সংস্করণে বইটিতে আরো অনেক বেশি তথ্য দিতে পারব। প্রসঙ্গত বলি, বইটি লিখবার জন্য সবচেয়ে বেশি যে বইটির ওপর নির্ভর করেছি, সেটি হলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাওয়ের 'India's Water Wealth'। আমার বইটির মানচিত্রও মূলত ডঃ রাওয়ের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে।

বইটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের রীডার ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আর কয়েকটি আলোকচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞ জিয়োলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়ার ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল শ্রীদেবব্রত ঘোষের কাছে। এ ছাড়া শ্রীসংকর্ষণ রায় ও 'কিশোর মন' পত্রিকার ডঃ নীরদ হাজরা ও শ্রীঅরুণ আইনও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের অন্যান্য কর্মী বিশেষত সর্বশ্রী অশোক বিশ্বাস, অতীন্দ্র দত্ত, গোপাল দাস এবং অংকনশিল্পী শ্রীনির্মল কর্মকার ও প্রুফ রীডার শ্রীশেখর মুখার্জীর অবদানের কথাও বিনম্রভাবে স্বীকার করতে চাই।

জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া
শিলং ৭৯৩ ০০৩
১৭ই মে ১৯৮৪

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

নদী ও ভূপ্রকৃতি

নদী আমাদের স্নেহময়ী জননী। নদী প্রাণ প্রবাহিনী। অনন্ত অতীত কাল থেকে প্রবহমান নদীর মালায় অলংকৃত ভারতভূমির অঙ্গ। তাই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু ঋষি ও কবি কণ্ঠে নদীর বন্দনা গান বারবার উচ্চারিত। কত শ্লোক, কত গাথা-কাহিনী যে এই ভারত তথা আর্যভূমিতে রচিত হয়েছে মাতৃময়ী জলদায়িনী নদীকে কেন্দ্র করে, তার আর শেষ নেই।

সেই সনাতন আর্যভূমিতে প্রবাহিত প্রধান সাতটি নদী হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ ঋক-বেদে সপ্তসিন্ধু নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লেখা হয়েছে, 'নদী মাতৃসমা। এই পবিত্র জলধারায় মানুষের সব পাপ ধুয়ে মুছে প্রবাহিত সফেন নীল সমুদ্রের দিকে।'

খুব সম্ভবত ঋক-বেদে উল্লেখিত এই সপ্তসিন্ধুর পাঁচটি হলো সিন্ধুর পাঁচটি ধারা ও বাকি দু'টি গঙ্গা ও সরস্বতী। সেই বৈদিক যুগে ভারতের ভৌগোলিক সীমানা সম্পর্কে স্বভাবতই আর্যদের পুরোপুরি ধারণা ছিল না। পরে ভারতের ভৌগোলিক সীমানার ধারণা বিস্তৃত হলে সপ্তসিন্ধুর অর্থও ব্যাপ্তিলাভ করল। সপ্তসিন্ধু বলতে তখন বোঝাত গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী।

গ্রীক জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক টলেমী ভারতীয় নদীর নামকরণ করেছেন জন্মদাত্রী পাহাড়-পর্বতের নাম অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের নদ-নদীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ পরিচয় জানতে হবে। কারণ যে ভূপ্রকৃতিতে পরিপুষ্ট হচ্ছে নদ-নদী, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদ-নদীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

নদীর অনেক নাম। তটিনী, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা, এমনি আরো কত নাম। নদ শব্দটি নদীর পুংলিঙ্গ। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, রূপনারায়ণ—এমনি পুংলিঙ্গ নামযুক্ত জলপ্রবাহকে বলা হয়েছে নদ।

ভারতের নদনদীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার জন্য এই অধ্যায়ে ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো।

ভূপ্রকৃতি

ভারতবর্ষ প্রায় একটি মহাদেশের মতো। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ৩২০০ কিলোমিটার আর পূর্বে নাগাল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত দূরত্ব ৩০০০ কিলোমিটারের বেশি। এই দূরত্ব সারা পৃথিবীর পরিধির দশ ভাগের এক ভাগ। ভারতের আয়তন ৩২,৭৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ (১৯৮১)। পৃথিবীর মাত্র ছ'টি দেশ—সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও চীন—ভারতের চেয়ে আয়তনে বড়।

ভারতের বেশির ভাগই সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। আর উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে রয়েছে চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ব্রহ্মদেশের মতো কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র। ভারতের উত্তর-ভাগে উঁচু হিমালয় পাহাড়, ভারত ও চীনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে। অবশ্য এই পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু গিরিদ্বার, যা পেরিয়ে অতীতের পর্যটকরা যেতেন এক দেশ থেকে আর এক দেশে। হিমালয়কে বাদ দিলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সীমানা ভৌগোলিক দিক থেকে খুব স্পষ্ট নয়। বিশেষত বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমানা কোথাও নদী আবার কোথাও বা জনপদকে দু'ভাগ করে চলে গেছে।

ভারতের অবস্থান উত্তর গোলার্ধে, ৮° ডিগ্রি থেকে ৩৮° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে। কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের প্রায় মধ্যভাগ ভেদ করে চলে গেছে। ফলে আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ থেকে নাতিশীতোষ্ণ।

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ। জলবায়ু বিচার করলে দেখা যায়, ভারতের পশ্চিমে রয়েছে রাজস্থানের শুষ্ক মরুভূমি। সারা বছরে সেখানে ১০ থেকে ১৩ সেণ্টিমিটারের মতো বৃষ্টিপাত হয়। অথচ এই দেশেরই পূর্বপ্রান্তে রয়েছে চেরাপুনজি—যেখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বছরে বৃষ্টিপাত ১১২৫ সেণ্টিমিটারের চেয়েও বেশি। অন্যদিকে কাশ্মীরের বহু জায়গায় শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায় ০° ডিগ্রির বহু নিচে। রাজস্থানের গঙ্গানগরে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা উঠে যায় ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি। আবার কেরালার কোচিন শহরের তাপমাত্রা প্রায় সারা বছরই ৩০° ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে।

বৈচিত্র্য শুধু আবহাওয়ায় নয়, ভারতের বৈচিত্র্য তাঁর ভূপ্রকৃতিতেও। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে যেমন রয়েছে নিচু জলা জংলা জায়গা, তেমনি

ভারতের উত্তরে যে বিস্তৃত হিমালয়, সেখানে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ। মাউণ্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজংঘার নাম কে না জানে!

ভূপ্রকৃতি, শিলা-বিন্যাসের দিক থেকে ভারতকে ভাগ করা যায় তিনটি ভাগে।

(১) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (Peninsular Plateau) ঃ অত্যন্ত প্রাচীন এক মালভূমি।

(২) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (Extra Peninsular mountains) ঃ হিমালয় ও আনুষঙ্গিক পর্বতশ্রেণী। ভূতাত্ত্বিক বয়েসের হিসেবে খুবই নবীন এই পর্বতশ্রেণী। এর প্রকৃতি ভঙ্গিল।

(৩) সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা (Indo-Gangetic Plains) ঃ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত সমতল অঞ্চল। বয়েসের দিক থেকে খুবই নবীন এই অববাহিকা অঞ্চলের মৃত্তিকা।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

এই অঞ্চলের গড়পড়তা উচ্চতা ৩০০ থেকে ২০০০ মিটারের মধ্যে। ঢাল পশ্চিম থেকে পূবে। ভূতাত্ত্বিক বয়েসের হিসেবে এই অঞ্চলের পাথর খুবই প্রাচীন। অতীতে মহাদেশগুলি যখন সচল, তখন এই অঞ্চল ছিল গনডোয়ানা ভূমির (Gondwana land) ভেতরে। তাছাড়া অন্তত ১০০ কোটি বছর ধরে ক্যামব্রিয়ান যুগের (Cambrian) বহু আগে থেকেই সমুদ্রের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত অঞ্চলটি। ফলে জল-হাওয়ার সংস্পর্শে ক্ষয়িত হয়েছে পর্বত প্রান্তর। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ পাহাড়ই ক্ষয়িত (relic) পর্বত। অর্থাৎ জল হাওয়ার প্রভাবে শিলার নরম অংশ ক্ষয়িত হবার ফলে কেবল শক্ত অংশ দাঁড়িয়ে আছে পর্বত হিসেবে। বহুদিন ধরে বয়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলের নদনদী চওড়া অগভীর নদী উপত্যকা সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই অঞ্চলের শিলা বেশির ভাগই রূপান্তরিত (metamorphic) জাতের, সঙ্গে অল্প কিছু গ্র্যানিট পাথর।

এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচুর আগ্নেয়গিরির লাভা দেখা যায়। পশ্চিমে আরব সাগর থেকে শুরু করে পূবে নাগপুর পর্যন্ত এবং উত্তরে গুজরাট থেকে দক্ষিণে বেলগাঁও পর্যন্ত এক বিস্তৃত ভূমি জুড়ে

চোখে পড়ে আগ্নেয়গিরি-নিসৃত গাঢ় সবুজ রংয়ের লাভা। এই বিস্তৃত পুরু আগ্নেয়গিরির লাভার স্থানীয় নাম ডেকান ট্র্যাপ (Deccan Trap)। জল-হাওয়ার প্রভাবে ক্ষয় পেয়ে ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক কারণে কোথাও কোথাও লাভার চেহারা অনেকটা সিঁড়ির মতো।

দাক্ষিণাত্যের এই মালভূমিতে বেশ কয়েকটি পর্বতশ্রেণী রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরাবল্লী, পশ্চিমঘাট পর্বত, পূর্বঘাট পর্বত ইত্যাদি।

আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী

ভারতের সমস্ত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে আরাবল্লীর বয়স সবচেয়ে বেশি। গুজরাট থেকে দিল্লী পর্যন্ত ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বত শ্রেণীর প্রকৃতি ভঙ্গিল। এই পর্বত শ্রেণীর জন্ম আরকিয়ান যুগের (Archaean Period) শেষে—আজ থেকে প্রায় ১০০ কোটি বছর আগে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, পৃথিবীর অধিকাংশ ভাঙ্গা গড়ারই সাক্ষী থেকেছে এই আরাবল্লী পর্বত। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, জন্মের সময় আরাবল্লীর আকার ছিল অনেক বড়। বোধহয় আজকের হিমালয়ের চেয়েও। সে যাই হোক, আরাবল্লীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ১৩০০ মিটার। আধুনিককালে এই আরাবল্লী পর্বত উত্তর-ভারতের জল-বিভাজিকা (Water-shed) হিসেবে কাজ করছে। এই পর্বত থাকার ফলে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর-মুখী দু'টি জলধারার সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা

ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে তাপ্তী নদী উপত্যকা থেকে শুরু করে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বতশ্রেণী। শীর্ণ হলে বিস্তৃত এই পর্বতশ্রেণী আরব সাগর থেকে দেখলে সত্যিই সম্ভ্রম জাগে। অথচ মালভূমির মধ্যভাগ থেকে একে পাহাড় বলেই মনে হয় না। তার কারণ এই যে, উপকূলের দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢাল অত্যন্ত খাড়াই, কিন্তু মালভূমির দিকে খুবই মসৃণ। উপকূলের দিক থেকে মালভূমিতে প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যে রয়েছে তিনটি গিরিদ্বার (mountain pass), যার ভেতর রেলপথে ট্রেন

যাতায়াত করে। এই তিনটি গিরিদ্বারের নাম—থালঘাট, ভোরঘাট এবং পালঘাট।

এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ক্ষেত্রে জল বিভাজিকার কাজ করছে। তাই আরব সাগর খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম ঘাট পর্বত-জাত নদনদী বয়ে গেছে দক্ষিণ-পূর্বে আরব সাগরের দিকে। ভালোভাবে নজর করলে দেখা যাবে, দক্ষিণ-পূর্ব বাহী নদনদী পশ্চিমঘাট পর্বতের ভেতরে গভীর উপত্যকার জন্ম দিয়েছে। তাই ভূবিদদের ধারণা সাম্প্রতিক কালে হয়তো এই অঞ্চল খানিকটা ঠেলে ওপরে উঠে এসেছে। তাই এই অঞ্চলের জলধারা এখনো ভূপ্রকৃতির সঙ্গে ঠিকঠাক খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি।

পূর্বঘাট পর্বতমালা

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মতো পূর্বঘাট পর্বতমালা একটি একক বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী নয়। এটি আসলে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পর্বতের সমাবেশ যাদের মধ্যে শিলার উপাদান কিংবা গঠন বিন্যাসের ব্যাপারে অনেক অমিল আছে। এসব দিক বিচার করে দেখলে বলতে হয়, পূর্বঘাট পর্বতমালা নামটি যুক্তিযুক্ত নয়। তাই পূর্বঘাট পর্বতমালার পাহাড়গুলিকে আলাদা ভাবেই বিচার করা উচিত। যে সব নদনদীর জন্ম পূর্বঘাট পর্বতমালার পশ্চিমে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে, তারা পূর্বঘাট পর্বতমালার বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরের কূলে বহু বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সঙ্গে আর একটি ব্যাপারেও তফাৎ রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে সামনাসামনি আঘাত করে, কিন্তু এই মৌসুমী বায়ু পূর্বঘাট পর্বতমালার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল। ফলে পশ্চিমঘাট অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পূর্বঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বেশ কম।

পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট এই দুই পর্বতমালার মিলন ঘটেছে নীলগিরি পাহাড়ে ডোড্ডাবেট্টা (২৬৩৩ মিটার) শৃঙ্গে। নীলগিরি পাহাড় ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে কেরালার দারুচিনি বন পেরিয়ে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত পর্বতমালা। এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ আনাইমুদি (২৬৯৫ মিটার)।

বিন্ধ্য পর্বত

পশ্চিম উপকূল থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বত প্রসারিত। এই পর্বতের উত্তর ঢালে কোন গভীর উপত্যকা বা উঁচু শৃঙ্গ নেই। কিন্তু দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত চড়া ঢালে আচমকা নেমে গেছে নর্মদা নদীর বুকে। নদীর বুকে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে, ৪০০ থেকে ১৪০০ মিটার উঁচু খাড়া পাহাড়। তবে ভয় পাবার মতো উঁচু খাড়া পাহাড় নয় নিশ্চয়ই। কোন পাহাড়ই নদীর বুক বা আশে পাশের ভূমি থেকে ১৫০ মিটারের বেশি উঁচু নয়। বিন্ধ্য পর্বতের পূবে কাইমুর পর্বতশ্রেণী—তাও খাড়া পাহাড় ছাড়া আর কিছু নয়, তবে ওপরে মালভূমি। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সমান্তরাল রেখায় সাতপুরা পর্বত (সাতটি পাহাড় ?) মহারাষ্ট্রের রাজপিপলা থেকে বিহারের রেওয়া পর্যন্ত প্রসারিত। সাতপুরা পর্বতে চ্যুতি ও ভঙ্গিলতা-জাতীয় ভূ-বিপর্যয়ের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এই অঞ্চলে সাতপুরা পর্বত একটি উল্লেখযোগ্য জল বিভাজিকা। তাই দেখা যায়, নর্মদা ও শোন নদীর জন্ম সাতপুরার উত্তর কোলে, আর তাপ্তী, ওয়াধা, ওয়েনগঙ্গা, ব্রাহ্মণী ইত্যাদির জন্ম সাতপুরার দক্ষিণ ঢালে।

সত্যি বলতে কি বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সীমারেখা হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এই দু'টি পর্বতশ্রেণীতে ভূ-প্রাকৃতিক কারণে যে সব উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে, তারই ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা ও তাপ্তী নদী।

এতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিলো, দক্ষিণ ভারতের সব পাহাড়ই ক্ষয়িত পর্বত, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষয়িত পর্বত হলেও কয়েকটি পর্বতের জন্ম দু'পাশের ভূ-চাপের ফলে। এই জাতীয় পর্বতের নাম হর্স্ট (horst)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোয়েমবাটুরের সমতলের পাশে ৬০০০-ফিট (১৮৩০ মি) উঁচু খাড়া নীলগিরি পাহাড় দেখে সেরকম সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ রকম আর একটি উদাহরণ মাদুরাই শহরের পাশে কোদাইকানালের পালনিস পাহাড়। এছাড়া কিছু কিছু বসে-যাওয়া অববাহিকার সন্ধান মিলেছে গোদাবরী, মহানদী ও দামোদরের উপত্যকায়। অবশ্য এর ফলে কোথাও কোথাও আমরা যথেষ্টই লাভবান হয়েছি। কারণ এভাবে নদী-উপত্যকার অংশ বিশেষ বসে যাওয়ার ফলেই আমরা পেয়েছি মহামূল্যবান কয়লার ভাণ্ডার। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, ভারতের পশ্চিম (মালাবার) তটরেখা অধিকাংশ জায়গায় সরল রেখার মতো। বিশেষজ্ঞদের ধারণা,

মালাবার তটরেখার জন্ম খুব সম্ভবত শিলাস্তরে চ্যুতির (fault) ফলে। হয়তো এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল বেলুচিস্থানের মাকরান তটরেখার। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো যে নর্মদা ও তাপ্তী নদীর খাত মাকরান তটরেখার সমান্তরাল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই নদীখাত দু'টি চ্যুতিরেখার ওপর তৈরি হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ নদীই যে পূর্বমুখী—এটি লক্ষ করে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন, ভারতের পশ্চিম তটরেখায় যখন চ্যুতি ঘটে, খুব সম্ভবত সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মূলভূমির ঢাল তখন পূর্বমুখী হয়ে পড়ে। আর তখনই সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু জলপ্রপাতের। যেমন কাবেরী নদীতে শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত, পাইকারা নদীতে পাইকারা জলপ্রপাত, শারাবতী নদীতে যোগ জলপ্রপাত। এই সব ক'টি জলপ্রপাত থেকে এখন বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হচ্ছে। সুতরাং একথা মনে করার কোন কারণ নেই, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অচল অনড়, কোন ধরনের ভূ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নদী-উপত্যকায় বেশ কিছু চ্যুতির পর আপাতত দাক্ষিণাত্যের ভূপ্রকৃতিতে স্থিতি এসেছে। যদিও প্রান্তভাগে কিছু কিছু চ্যুতির আশংকা থেকে গেছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির স্থিতিশীল ভূপ্রকৃতি এ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়ে উঠেছে। যেমন বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের (নেলোর) অভ্রক্ষেত্রের অভ্র অবিকৃত থেকে গেছে। গোদাবরী, দামোদর ও মহানদী উপত্যকার কয়লা মাটির দিকে নিশ্চিন্তে সংরক্ষিত হয়েছে, কোন ভূবিপর্যয়ের দরুন বিনষ্ট হয় নি। এই মালভূমির ল্যাটেরাইট-যুক্ত পাহাড়ের শীর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বকসাইট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই অঞ্চলের লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের আকরিক। এ সমস্ত খনিজ সম্পদই মোটামুটি অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মূলত এই অঞ্চলের স্থিতিশীল ভূপ্রকৃতির জন্য।

তটরেখা

দাক্ষিণাত্যের তটরেখা মোটামুটি সরলরেখায় অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত। হয়তো তাই স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম। তটরেখার অধিকাংশই বালুময় ও সমুদ্র অগভীর। তবু পশ্চিম তটরেখায় উপহ্রদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় তটরেখায় নিমজ্জিত স্থলভাগের সন্ধান মিলেছে। গড় গভীরতা প্রায় ২০০ মিটারের (১০০ ফ্যাদম) মতো। এছাড়া কয়েকটি জায়গায় তটরেখা প্রায় ৩০ থেকে

৫০ মিটারের মতো উঠে এসেছে। অনেকে মনে করেন, এসবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।

ভারতের পশ্চিম উপকূল ঘিরে যে সমতলভূমি উত্তরে কাথিয়াওয়াড় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত—তা' ঐতিহাসিক মধ্যযুগে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। আজো এই অঞ্চল আদা, গোল মরিচ ও দারুচিনি উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত। আরব দেশীয়, পরতুগিজ ও ওলন্দাজ-স্থাপিত বেশ কিছু প্রাচীন বন্দর ও কারখানা এখনো এই উপকূলে দেখা যায়। এমন একটা সময় ছিল, যখন সমস্ত প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যর কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চল। সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলের সব খাঁড়ি ও উপহ্রদকে যুক্ত করে বেশ কিছু খাল কাটা হয়েছে। ফলে স্থলভাগের অনেক ভেতরেও নৌকোয় চেপে বেশ ভ্রমণ করা যায়। সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের পক্ষে নারকোল বনের ভেতরে নৌকোয় চেপে চাঁদনি রাতে বেড়ানো সত্যিই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

পাহাড় ও পূর্ব-উপকূলের মধ্যে যে সমতলভূমি, তা' চওড়ায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। বৃষ্টিপাত কম হওয়া সত্ত্বেও কৃষির সুবিধের জন্যে অনেক খাল কাটার ফলে এ অঞ্চলে শস্য-ফলন যথেষ্ট। প্রচুর নারকোল গাছ-শোভিত পূর্ব উপকূলে রয়েছে বহু প্রাচীন মন্দির, যা ভাস্কর্য হিসেবে অনন্য। বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, মধ্যযুগে এই মন্দিরগুলিকে ঘিরে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের শস্যাগার বলে অভিহিত করা হয়। আরো উত্তরে ওড়িশার মহানদীর বদ্বীপ অঞ্চলও অত্যন্ত উর্বর শস্যপ্রসবা। পশ্চিম উপকূলের মতো এই উপকূলে বেশ কিছু উপহ্রদ রয়েছে, তবে সংখ্যায় কম। এই অঞ্চলের নদনদী প্রচুর পলিমাটি বয়ে নিয়ে এসে বদ্বীপের মুখগুলিকে জাহাজ চলাচলের অনুপযুক্ত করে তুলেছে।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের উত্তর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ হিমালয় ও আনুষঙ্গিক পর্বতমালা। পাললিক শিলায় গঠিত এই পর্বতমালার বয়েস ভূতাত্ত্বিকের চোখে তেমন বেশি নয়। আজ থেকে কয়েক কোটি (প্রায় ১০-১১ কোটি) বছর আগে কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে (ক্রেটেশাস যুগের আগে) হিমালয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং সমস্ত জায়গা জুড়ে ছিল ভূমধ্য-

সাগরের সঙ্গে যুক্ত এক সমুদ্র যার নাম টেথিস। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সেই টেথিস সাগরের দু'পারে ছিল দুই সহৃদয় প্রতিবেশীর মতো দু'টি মহাদেশ, উত্তরে আঙ্গারা বা লরেশিয়া (চীন, সাইবেরিয়া, কানাডা ইত্যাদি নিয়ে গঠিত) আর দক্ষিণে গনডোয়ানা (ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য, অসট্রেলিয়া, আফরিকা ইত্যাদি নিয়ে গঠিত)। ক্রেটেশাস যুগের শেষভাগে এই অঞ্চলে অস্থিরতা দেখা গেল। আসলে ব্যাপারটা হলো, টেথিস সাগরের গভীরতা কমে আসছে, সমুদ্র ফুঁড়ে বেরোচ্ছে কঠিন স্থলভাগ। প্রাকৃতিক শক্তির টানে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে আঙ্গারা ও গনডোয়ানা মহাদেশ দু'টি। বিপরীতমুখী এই গতির ফলে টেথিস সমুদ্র সংকীর্ণ অগভীর হয়ে এলো। আর সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত পলি থেকে ক্রমশ দু'পাশের চাপের ফলে মাথা উঁচু করল দীর্ঘ ভঙ্গিল পর্বতমালা (fold mountain)। পশ্চিমে পিরেনিজ, আলপস, ককেশাস থেকে শুরু করে পূবে হিমালয়, আরাকান ইয়োমা। এখানে বলা প্রয়োজন, হিমালয় পর্বত একদিনে তৈরি হয় নি। ভূবিজ্ঞানীদের অভিমত, বিভিন্ন যুগে পাঁচটি ভূ-বিপর্যয়ের (Orogeny) মধ্য দিয়ে হিমালয় আজকের এই বিরাট ব্যাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে।

টেথিস সাগর অঞ্চলে প্রথম ভূ-বিপর্যয়ের ঢেউ লাগে ক্রেটেশাস যুগের মধ্য বা শেষভাগে। এই সময় টেথিসের বুকে লম্বালম্বিভাবে অনুচ্চ কিছু পাহাড় ও পাশাপাশি গভীর খাতের সৃষ্টি হয়, যদিও এই পর্বতমালা তখনো খুব সম্ভবত জলের ওপরে মাথা তোলে নি। এরপর ইয়োসিন (প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে) যুগের শেষদিকে, মায়োসিন (প্রায় দু'কোটি বছর আগে) যুগের শেষভাগে টেথিস অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূতাত্ত্বিক আলোড়নের চিহ্ন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন। হিমালয় পাহাড়ের জন্ম যে সমুদ্রের নিচে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিমালয়ের পাথরে রক্ষিত সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল থেকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হিমালয় পর্বতে এখনো স্থিতি আসে নি। তাই হিমালয়ের শরীর কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। সৃষ্টি হয় প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের।

হিমালয় অঞ্চলের অসংখ্য নদনদীর জন্ম সাম্প্রতিক কালে। এই নবীন নদীগুলির তেজ তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। তাই হিমালয়ের অবয়ব খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় করে ফেলছে। ফলে তৈরি হয়েছে গভীর গহন উপত্যকা আর খাদ।

হিমালয় পর্বত পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে পূর্বে অরুণাচল পর্যন্ত তিনটি

সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর আকারে প্রসারিত। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার, প্রশস্ততা ১৬০ থেকে ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে।

এই তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর নাম ঃ

(ক) শিবালিক পর্বত বা বহির্হিমালয় (Outer)
(খ) কনিষ্ঠ (Lesser) হিমালয় বা মধ্য হিমালয় (Middle), এবং
(গ) গরিষ্ঠ (greater) হিমালয় বা অন্তর্হিমালয় (Inner)

এই অন্তর্হিমালয়েই রয়েছে উত্তুঙ্গ শিখরগুলি। যেমন এভারেস্ট, কাঞ্চনজংঘা, কে ২, গডউইন অসটিন, নন্দা দেবী, কেদারনাথ, কামেট ইত্যাদি আরো কয়েকটি শৃঙ্গ। এদের গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটারের চেয়ে বেশি। এদের দক্ষিণে মধ্য-হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির গড় উচ্চতা ৫০০০ মিটারের মতো। এই মধ্য-হিমালয়েই বিখ্যাত শৈল-নিবাসগুলির অবস্থান। যেমন সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরি, দার্জিলিং, কালিমপং, গ্যাংটক। মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বহিঃ-হিমালয়কে অবশ্য ঠিক অবিচ্ছিন্ন পর্বতমালা বলা যাবে না। শিবালিক পাহাড়ের মতো আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়কেও এই বহিঃ-হিমালয়ের মধ্যে ধরা হয়। এদের গড় উচ্চতা ১০০০ মিটারের মতো এবং প্রশস্ততা ১০ থেকে ৫০ কিলোমিটারের মতো।

আর একটি কথা। হিমালয়ের পর্বতের ঢাল উত্তরে চীনের দিকে, কিন্তু ভারতের দিকে হিমালয় অত্যন্ত খাড়াই। ফলে ভারতের দিক থেকে হিমালয়ে চড়া খুবই কষ্টসাধ্য।

বনজ উদ্ভিদের ব্যাপারেও পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণে ঢাল খাড়াই হবার ফলে বনজ উদ্ভিদের পরিমাণও কম, কিন্তু উত্তরের মসৃণ ঢালে উদ্ভিদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

হিমালয় পর্বতের তুলনাহীন সৌন্দর্য যে কোন মানুষকেই মুগ্ধ করবে। এই কথাটি শুধুমাত্র যে সাম্প্রতিক কালেই প্রযোজ্য তা' নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে হিমালয়ের বিশালতায়, তার সৌন্দর্যে। কবি কালিদাস তার কাব্যে হিমালয়কে অনন্যস্থানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

হিমালয় পর্বতে তুষাররেখা (snow-line) দক্ষিণ ঢালে ৪৫০০ থেকে ৬০০০ মিটারের মধ্যে, এবং উত্তর ঢালে ৫৫০০ থেকে ৬০০০ মিটারের মধ্যেই থাকে। নাঙ্গা পর্বত, বদরিনাথ ও কাঞ্চনজংঘা অঞ্চলে হিমবাহ দেখা যায়। হিমালয় পর্বতের কয়েকটি শৃঙ্গের উচ্চতা এই রকম ঃ

এভারেস্ট—৮৮৪৮ মিটার ; কাঞ্চনজংঘা—৮৫৮৬ মিটার ; ধবলগিরি—৮০৭৫ মিটার, ; নন্দাদেবী—৭৮১৬ মিটার ; কামাত—৭৭৫৫ মিটার ; অন্নপূর্ণা—৭৬৫০ মিটার।

হিমালয়ের উপত্যকা

হিমালয়ের প্রধান উপত্যকাগুলির অবস্থান মোটামুটিভাবে হিমালয়ের বিস্তারের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে। হিমালয়ের গভীর খাদ ও উপত্যকাগুলি গড়ে উঠেছে নদীর ক্ষয়ের ফলে। সব উপত্যকাগুলি মোটামুটি লম্বালম্বি গড়ে উঠলেও ব্যতিক্রম রয়েছে। হিমালয়ের নদী উপত্যকাগুলির বিন্যাস এ রকম হওয়ার কারণ এই যে, এই অঞ্চলের জল বিভাজিকার অবস্থান হিমালয়ের মূল অক্ষের উত্তরে।

পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয়ের উপত্যকাগুলির বিন্যাসে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কাশ্মীর-হিমালয়ে উপত্যকাগুলি আকারে U অথবা I এর মতো, আর অত্যন্ত গভীর, খাদের মতো। তবে পূর্ব হিমালয়ের উপত্যকাগুলি অনেক বেশি চওড়া, উপত্যকার প্রান্তগুলি খুবই মসৃণ ঢালের। এই দুই প্রান্তের উপত্যকাগুলির মধ্যে এই অমিলের কারণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণে পার্থক্য। পূর্বপ্রান্তে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে নদী যেমন একদিকে পাহাড়ের তলদেশ ক্ষয় করে চলেছে, ঠিক তেমনিভাবে বৃষ্টিপাত ও উপত্যকার ঢালগুলিকে ক্ষয় করে প্রশস্ত ও মসৃণ করে তুলেছে। কিন্তু পশ্চিম হিমালয়ে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়ায় উপত্যকার দুই প্রান্ত একেবারেই ক্ষয়িত হয় নি, কিন্তু নদী অবিরাম গতিতে ক্ষয় করে চলেছে নদীবক্ষ।

গঠনের দিক থেকে হিমালয়ের উপত্যকাগুলি নবীন। তাই হিমালয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় বহু নাম-না-জানা জলপ্রপাত, ঝরণা। এদের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম মধ্য হিমালয় অঞ্চল। বিশেষত ভোলা যায় না পাহাড় ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় সমস্ত নদনদীর ১৬০০ মিটার নিচের পাহাড়ে পতনের দৃশ্য। প্রয়োজনে এই সব জলপ্রপাত থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভব। পরের পর্যায়ে এই সব পাহাড়ী নদীই শিবালিক অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় গভীর খাদের সৃষ্টি করে যায়। অথচ এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, শিবালিক অঞ্চলের পাথর হয়তো এই নদনদীবাহিত পলি থেকেই তৈরি হয়েছিল।

হিমালয়ের উপত্যকার মতো সুন্দর দৃশ্যময় মনোরম উপত্যকা সারা

পৃথিবীতে বিরল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাশ্মীর উপত্যকা, যার ওপর দিয়ে ঝিলমিল করে বয়ে যাচ্ছে ঝিলম নদী। আধুনিক শ্রীনগর শহর, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, ঝিলম নদীর বুকে হাউসবোট—সব মিলিয়ে কাশ্মীর উপত্যকাকে বলা চলে ভ্রমণার্থীদের স্বর্গ। কাশ্মীর উপত্যকার মতোই মনোরম আরো যে কয়েকটি উপত্যকা রয়েছে আশেপাশে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিসতাওয়ার, চামবা, কাংড়া ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে ধস (landslide) কিংবা হিমবাহ পাহাড় থেকে নেমে এসে উপত্যকার মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন নদীর জল ফুলে ফেঁপে বিরাট বাঁধের মতো বেড়ে ওঠে। পরে জলের চাপে বাধা সরে গেলে প্রচণ্ড বন্যার আকারে নদীর জল প্লাবিত করে নিচের সমতলভূমিকে। এভাবেই আগে বন্যা হয়েছে শতদ্রু (১৮১৯), সিন্ধু (১৮৫৯), গঙ্গা (১৮৯৩) এবং যমুনা (১৯৫৬) নদীতে। সুতরাং খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় এই সব খরস্রোতা পাহাড়ী নদনদী থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

গাঙ্গেয়-সিন্ধু সমতলভূমি

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর ভেতরে রয়েছে এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—যা তৈরি হয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিতে। আয়তন প্রায় ৭,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। সিন্ধু নদীর মুখ থেকে গঙ্গা নদীর মুখ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতীয় অংশে পড়েছে প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার। এই সমতল ভূমি পূর্বে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার চওড়া। পশ্চিমে ৩০০ কিলোমিটার।

এই সমতলভূমির প্রধান উপাদান বালি ও মাটি। নদীর মুখের কাছে মাটির ভাগ বেশি আর উজানের দিকে ক্রমশ বালির ভাগ বাড়তে থাকে। তবে সামগ্রিকভাবে সব মৃত্তিকাই মিহিদানার। ড্রিলিং করে মৃত্তিকার বেধ বের করা হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। কোথাও কোথাও মাটির স্তর প্রায় ৩০০০ ফিট পুরু। অন্যদিকে রাজমহল ও গারো পাহাড় অঞ্চলে মাটির স্তর বেশ পাতলা।

সাধারণভাবে এই গাঙ্গেয় সমতলভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) উঁচু সমতলভূমি : আরেক নাম ভাঙ্গর ভূমি। নাম থেকেই বোঝা যায় এর অবস্থান প্লাবন ভূমির (flood plain) চেয়ে খানিকটা উঁচুতে, তাই বন্যার জলে ডোবে না। উপাদান অপেক্ষাকৃত পুরনো পলিমাটি। (খ)

নিচু সমতলভূমি ঃ আরেক নাম খদ্দর ভূমি। অবস্থান নিচুতে হওয়ায় বন্যার জলে সহজেই ডুবে যায়। মৃত্তিকার উপাদান বালি মিশ্রিত মাটি, ফলে চাষবাসের পক্ষে খুবই উপযোগী।

জলবায়ু

ভূপ্রাকৃতিক কারণে সারা ভারতে মোটামুটি একই ধরনের জলবায়ু দেখা যায়। ভারতের উত্তর সীমানা জুড়ে হিমালয় পাহাড় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকায় একদিকে যেমন উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া ভারতে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি ভারত মহাসাগর থেকে যে জলবাহী বাতাস ভারতে প্রবেশ করে, তা ভারত পেরিয়ে উত্তরের দেশগুলিতে ঢুকতে পারে না। ফলে সারা ভারতের আবহাওয়ায় যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন ভারতবর্ষের আকার এতই বিশাল যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়ায় খানিকটা অমিল থাকতেই পারে। যেমন ভারতের পশ্চিম প্রান্তে রাজপুতানা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১০ থেকে ১৫ সেণ্টিমিটার, অথচ পূর্বপ্রান্তে মেঘালয়ের চেরাপুনজি অঞ্চলে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ বছরে ১১০০ সেণ্টিমিটার (চিত্র ১)।

তাপমাত্রার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কাশ্মীরে এমন জায়গা আছে (যেমন লেহ্) যেখানে শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায়— ৪৫ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডে, আবার গ্রীষ্মে রাজস্থানের গঙ্গানগরে তাপমাত্রা উঠে যায় ৫১ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড।

ভারতবর্ষে দুটি প্রধান ঋতু।

(ক) বৃষ্টিহীন শীত, (খ) বৃষ্টিসিক্ত গ্রীষ্ম।

(ক) ভারতে শীতঋতু থাকে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি। এ সময় বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না, কেবল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ও তামিলনাডুর অংশবিশেষ ছাড়া। এ সময় চীনদেশের মানচুরিয়া ও তিব্বতে তৈরি হয় একটি উচ্চচাপ অঞ্চল, ঠিক এভাবেই আর একটি উচ্চচাপ অঞ্চল গড়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে। এই দু'টি উচ্চচাপ অঞ্চলের মাঝ-খানে সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকায় থাকে একটি নিম্ন-চাপ অঞ্চল। এ সময় ভূ-মধ্যসাগরে সাইক্লোন সৃষ্টি হয়, তা' ভারতের এই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে

ছুটে আসে। এই জলকণাবাহী বাতাস থেকে বৃষ্টি হয় পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। দিল্লীর আশেপাশেও হয়, তবে পরিমাণে কম। মাত্র ৫-৬ সেণ্টিমিটার। তবে উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়ে আরো পূর্বে বৃষ্টিপাত একেবারে হয় না বললেই চলে।

বৃষ্টিহীন শীত ঋতুর পরে আসে প্রাক-বর্ষা গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময় কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি হয় তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

(খ) ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষা ঋতু থাকে ৫ জুন থেকে ১৫ সেপটেম্বর পর্যন্ত। এ সময় সারা ভারতেই থাকে একটি নিম্ন চাপ অঞ্চল। ফলে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে জলকণাবাহী হাওয়া ছুটে আসে স্থলভাগের ভেতরে। মে মাসের শেষ দিকের আবহাওয়া খানিকটা নিশ্চল। কিন্তু জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই আচমকা বর্ষা ঋতু শুরু হয়ে যায়। প্রথমে কেরালা, পরে জুনের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে সারা ভারতেই শুরু হয়ে যায় বর্ষা ঋতু। প্রকৃত-পক্ষে বর্ষার দুটি ভাগ। একটি আরব সাগর-জাত, আরেকটি বঙ্গোপ-সাগর-জাত।

তবে আরব সাগর-জাত বর্ষার তীব্রতা কিছুটা বেশি। এর কারণ ঃ (১) বঙ্গোপসাগরের চেয়ে আরব সাগর আকারে বড়। (২) আরব সাগর-জাত জলকণাবাহী মৌসুমী বায়ুর সবটাই ভারতের মাটিতে বর্ষিত হয় বৃষ্টি হিসেবে। কিন্তু বঙ্গোপসাগর-জাত জলকণার একটি অংশ বর্ষিত হয় ভারতের মাটিতে, বাকিটা যায় বার্মা, মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ডের দিকে।

আরব সাগর-জাত জলকণাবাহী মৌসুমী বায়ু থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে পূর্বে গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ কমে যায়। তাই পশ্চিমঘাটের পূব দিকের নদীগুলিতে জলের পরিমাণ কিছুটা কম।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টি মূলত সিন্ধু, কচ্ছ ও পশ্চিম রাজস্থানে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরির ফলে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এসব অঞ্চলেই বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি হয় এই নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে বহু দূরে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে। এর কারণ বোধহয় এই, কচ্ছ বা পশ্চিম রাজস্থান অঞ্চলে এমন পাহাড়-পর্বত নেই যার বাধায় বৃষ্টি হতে পারে। আসলে আরাবল্লী

পর্বতের বিস্তৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সমান্তরালে। ফলে এই পাহাড়ের অবস্থিতিও বৃষ্টি ঘটাতে পারছে না।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষে যে বৃষ্টি হয়, তা' ভারতের মোট বৃষ্টির শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ। এই বৃষ্টিপাত হয় ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ জায়গায়। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে হিসেবটা খুব নিরাশাব্যঞ্জক নয়, যদিও মাঝে মাঝেই মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর তখনই ঘটে বিপদ।

সারা ভারতে দৈনিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ আনুমানিক ১০০ সেণ্টিমিটার। বৃষ্টির পরিমাণ মোটামুটি ভালোই বলতে হবে। তবে ভারতে বৃষ্টিপাত ঠিক সমানভাবে হয় না। যা হয়, তা' হলো খুব কম সময়ে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাত। তাই হিসেব থেকে দেখা গেছে, দিনে ৫০ সেণ্টিমিটার বৃষ্টিপাত খুবই সাধারণ ঘটনা। তবে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ২৪ ঘণ্টায় ৮৬ সেণ্টিমিটার বৃষ্টিপাত এখনো পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে আছে। অবশ্য খরাপ্রবণ এলাকাতেও (যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলা) ২৪ ঘণ্টায় ৫৭ সেণ্টিমিটার বৃষ্টিপাত হতে দেখা গেছে। বর্ষাকালে দৈনিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমঘাট পর্বত অঞ্চলে ২·৫ সেণ্টিমিটার; পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-প্রদেশে ১·৫ সেণ্টিমিটার; করনাটক ও দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু জায়গায় ১ সেণ্টিমিটার এবং রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলে ০·৫ সেণ্টিমিটার। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে ১৮০ দিনে ১১২০ সেণ্টিমিটার বৃষ্টি হয়, রাজস্থানের গঙ্গানগরে (মরুভূমির ভেতরে) বছরে ১০-১২ দিনেই সারা বছরের ১২ সেণ্টিমিটার বৃষ্টি হয়ে যায়।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ভারতকে ১৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) কেরালা, কোংকন ও পশ্চিমঘাট পর্বত অঞ্চল: বৃষ্টিপাত ২০০ সেণ্টিমিটারের বেশি।

(২) করনাটক, অন্ধ্র, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, খানদেশ ও বেরার (পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে): বৃষ্টিপাত ৫০ থেকে ৭৫ সেণ্টিমিটার।

(৩) কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে পূর্ব উপকূল (করোমনডল) জুড়ে কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত: বৃষ্টিপাত ৫০ থেকে ১২৫ সেণ্টিমিটার। এই অঞ্চলের মধ্যে তিরুনেলভেলি (টিনিভেলি) অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম।

(৪) কৃষ্ণা নদীর উত্তর থেকে সারা ওড়িশা ঃ বৃষ্টিপাত ৭৫ থেকে ১৫০ সেণ্টিমিটার।

(৫) পশ্চিমে বেরার থেকে পূর্বে পাঁচমহল পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চল ঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫ সেণ্টিমিটারের মতো। বৃষ্টিপাত হয় গ্রীষ্মকালীন বর্ষার সময়।

(৬) বিহারের ছোটনাগপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ঃ বৃষ্টিপাত ১৫০ সেণ্টিমিটারের মতো।

(৭) পশ্চিমবঙ্গের নিম্নভাগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চল ঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেণ্টিমিটারের বেশি।

(৮) মেঘালয় ও আসাম ঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (৭) নং অঞ্চলের চেয়েও বেশি। এখানে বর্ষার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি।

(৯) বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা ঃ এখানে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত আরব সাগর জাত মৌসুমী বায়ু থেকে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সেপটেম্বরে বৃষ্টি হয় বঙ্গোপসাগর-আগত মৌসুমী বায়ু থেকে ঃ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ থেকে ১৫০ সেণ্টিমিটার।

(১০) দক্ষিণ বিহার, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমভাগ এবং রাজপুতানার পূর্বভাগ ঃ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেণ্টিমিটার (দক্ষিণ-পূর্বে) ৫০ সেণ্টিমিটার (উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে)

(১১) পাঞ্জাবের সমতলভূমি ঃ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সেণ্টিমিটারের মতো। তবে বৃষ্টিপাত ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে কমে যায়।

(১২) গুজরাট ঃ গুজরাটের বৃষ্টিপাত কোংকনের ২০০ সেণ্টিমিটার ও রাজস্থানের ২০ সেণ্টিমিটারের মাঝামাঝি। এখানে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমে যায়।

(১৩) পশ্চিম রাজস্থান ও থর মরুভূমি অঞ্চল ঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই অনিশ্চিত। সাধারণত ১০ থেকে ১২ সেণ্টিমিটার।

অরণ্য সম্পদ

ভারতের মতো প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর যে কোন দেশেই দুর্লভ। আর তাই উদ্ভিদ জগতেও প্রচুর বৈচিত্র্য। একদিকে হিমালয় পর্বতে বর্ষার ঘন অরণ্য, আবার আর একদিকে মরুভূমিতে ইতস্তত ছড়ানো

গান্ধীনগর
গুজরাট
সাবরমতী
মাহী নদী
নর্মদা নদী
ভূপাল
তাপ্তী নদী
মহারাষ্ট্র
বোম্বাই
আরব সাগর
অন্ধ্র প্রদেশ
হায়দরাবাদ
কৃষ্ণা নদী
পেন্নার নদী
পানাজী
কর্নাটক
মাদ্রাজ
কাবেরী নদী
কভারাট্টী দ্বীপ
কলিকাতা
সুবর্ণরেখা
উড়িষ্যা
মহানদী
ভুবনেশ্বর
গঙ্গার মোহনা
আইজল
বঙ্গোপসাগর
পোর্ট ব্লেয়ার
নির্দেশিকা
নদী উপত্যকা
১ সিন্ধু
২ গঙ্গা
৩ ব্রহ্মপুত্র
৮ সুবর্ণরেখা
৯ ব্রাহ্মণী
১০ মহানদী

ভারতের প্রধান নদ-নদী
স্কেল
১০০ ৫০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ কি.মি.
জম্মু ও কাশ্মীর
শ্রীনগর
ইসলামাবাদ
পাকিস্তান
চণ্ডীগড়
হরিয়ানা
দিল্লী
রাজস্থান
জয়পুর
লক্ষ্ণৌ
কাঠমান্ডু
পাটনা
বিহার
গাংটক
ভুটান
ইটানগর
দিসপুর
কোহিমা
শিলং
ইম্ফল
বাংলাদেশ
সিন্ধু নদী
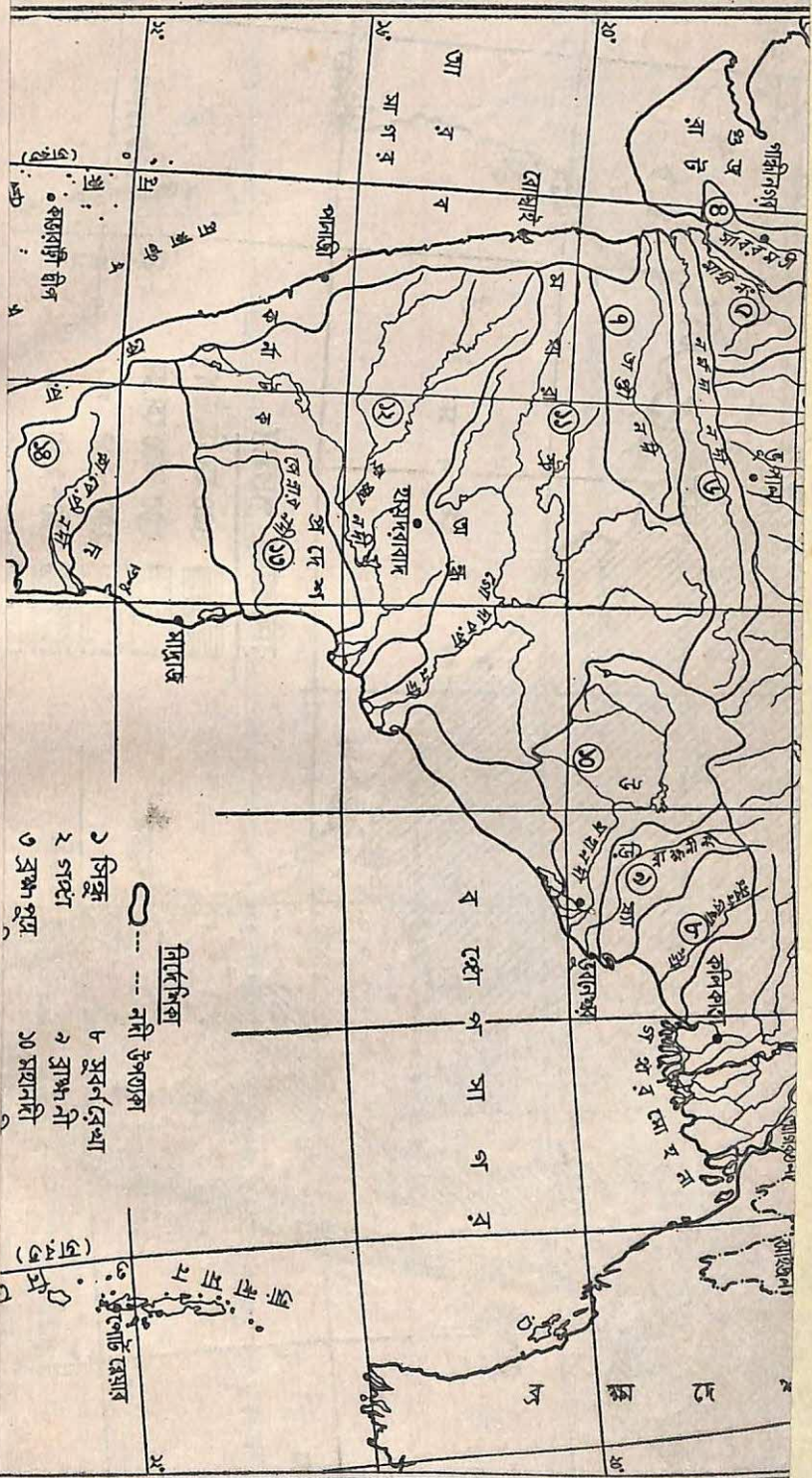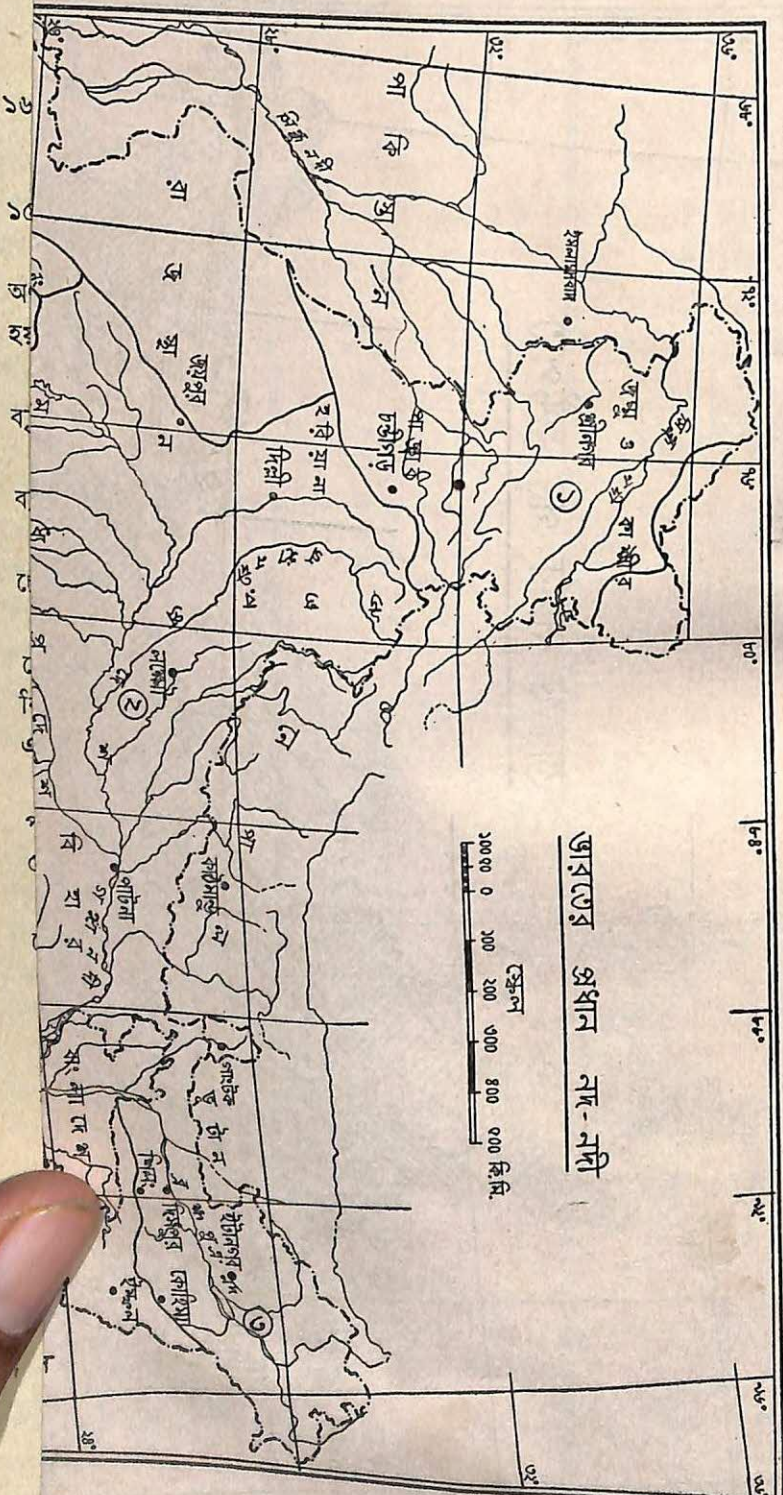
ক্যাকটাস অথবা সুন্দরবনের জলাভূমিতে জলজ উদ্ভিদের (যেমন সুঁদরি) সমাবেশ।

ভারতে যত রকমের উদ্ভিদ রয়েছে, তাদের মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। ক) হিমালয়ের রডোডেনড্রন, খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাইন, গ) দক্ষিণ ভারতের বাঁশগাছ এবং ঘ) রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলের ক্যাকটাস জাতীয় গাছ।

অবশ্য এই চার ধরনের গাছ ছাড়া আরও যা দেখা যায়, তা হলো দক্ষিণ ভারতে নারকোল গাছ, নীলগিরি পাহাড়ে অ্যাকাসিয়া ও স্ট্রোবিলানথিস, আসাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডিপটেরোকারপাস এবং পূর্ব হিমালয়ে শাল অরণ্য।

ভারতের অরণ্যকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১) **চিরহরিৎ অরণ্য** (The Evergreen Forests)ঃ ক) দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুণাচলে হিমালয়ের পাদদেশে এই ধরনের অরণ্য গড়ে উঠেছে মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। এই অরণ্যে দামী টিক, শিশু (rose wood) ও অঞ্জন (ironwood) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। খ) কিছুটা কম বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও করনাটকে এই ধরনের অরণ্য চোখে পড়ে। এখানকার গাছপালা আকারে ছোট হলেও প্রকৃতিতে শক্ত। এই অরণ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত আবলুস (ebony), নিম ও তেঁতুল গাছ।

২) **পাতাঝরা অরণ্য** (The Deciduous Forests)ঃ এ ধরনের অরণ্য পর্যাপ্ত ছড়িয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে। দামী গাছপালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিক, শাল, সেগুন, চন্দন, অঞ্জন (Hardwickia) ইত্যাদি।

৩) **শুষ্ক অরণ্য** (The Dry Forests)ঃ রাজস্থানের যে সব অঞ্চলে অল্প বৃষ্টিপাত হয়, সেসব জায়গায় গড়ে ওঠে এ ধরনের অরণ্য। ভ্যারানডা, বাবলা জাণ্ড (jand) এবং ট্যামারিক্স জাতীয় গাছ দেখা যায় এসব অরণ্যে।

৪) **পাহাড়ী অরণ্য** (The Mountain Forests)ঃ এ ধরনের অরণ্য চোখে পড়ে কাশ্মীর থেকে শুরু করে অরুণাচলের হিমালয় পর্বতে। এই অঞ্চলের গাছপালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেওদার, পাইন, ফার, ওক, আখরোট, মেপল, এল্‌ম, অ্যাস, বার্চ, পপলার, রডোডেনড্রন ইত্যাদি।

৫) **বদ্বীপ অঞ্চলের অরণ্য** (The Tidal or Littoral Forest)ঃ

এ ধরনের অরণ্যের দেখা মেলে গঙ্গা এবং দাক্ষিণাত্যের বড় বড় নদীর বদ্বীপে। এখানকার প্রধান গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গরাণ, সুঁদরি এবং পাম-জাতীয় নীপা গাছ। এই ধরনের অরণ্যের নাম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

ভারতের অরণ্যের মোট পরিমাণ প্রায় ৭৫৫ লক্ষ হেকটর, মোট ভূখণ্ডের শতকরা ২৩ ভাগ। এই অরণ্য সম্পদ থেকে বছরে মোট ৮৪ লক্ষ ঘন মিটার কাঠ, ১২৭০ লক্ষ ঘন মিটার জ্বালানি (১০৮ কোটি টাকা) তাছাড়াও অরণ্য থেকে পাওয়া যায় বাঁশ, বেত, রজন ইত্যাদি যার দাম প্রায় ১১ কোটি টাকা।

মৃত্তিকা

ভারতের মৃত্তিকা মোটামুটিভাবে দু'রকমের।

ক) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকা,

খ) সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকার মৃত্তিকা।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকার জন্ম ও অবস্থান স্বস্থানেই, যদিও অল্পস্বল্প মৃত্তিকা নদীবাহিত হয়ে কোথাও কোথাও জমা পড়তে পারে। কিন্তু সিন্ধু গঙ্গা অববাহিকার মৃত্তিকার অধিকাংশই জলবাহিত পলি হিসেবে জমা পড়েছে।

(ক) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকা

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

i) **রেগুর মাটি** (Regur) : 'রেগুর' নামের উৎপত্তি তেলুগু শব্দ 'রেগাড়া' থেকে। এই মাটি সাধারণভাবে কালো কার্পাস-মৃত্তিকা (black cotton soil) হিসেবে পরিচিত। কারণ প্রথমত, এই মাটিতে প্রচুর কার্পাস জন্মায়, দ্বিতীয়ত প্রচুর জৈব-মৃত্তিকা (humus) ও আয়রন অকসাইড থাকবার ফলে এই মাটির রং কালো। এই মৃত্তিকার জল ধরে রাখবার ক্ষমতা যথেষ্ট। উর্বর ক্ষমতাও প্রচুর, ফলে সার ছাড়াই প্রচুর ফসল ফলে। এতকাল মনে করা হতো, এই মৃত্তিকার জন্ম আগ্নেয়গিরি-জাত লাভা থেকে। কিন্তু পরে বিশদ সমীক্ষায় দেখা গেছে, লাভা-ভূমির বাইরেও এই কালো মৃত্তিকার দেখা মিলেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কালো কার্পাস-মৃত্তিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেণ্টিমিটারের কম।

ii) **লাল মাটি** (Red Soil) : দাক্ষিণাত্যের বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গ্র্যানিট জাতীয় শিলা। এই জাতীয় শিলার আবহক্ষয় থেকেই

জন্ম লাল মাটির। লোহার ভাগ বেশি, তাই মাটির রং লাল। এই মাটি আলগা নরম প্রকৃতির, জল ধরে রাখবার ক্ষমতা কম। তাই ভালো চাষবাসের জন্য সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভালো বৃষ্টিপাতও প্রয়োজন। কিন্তু 'রেগুর' জাতীয় মাটিতে বৃষ্টিপাত হলে আর জল-সেচের প্রয়োজন নেই।

iii) **ল্যাটেরাইট** (Laterite) ঃ এই জাতীয় মৃত্তিকার দেখা মেলে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশে। পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্য, সাতপুরা—সব পাহাড়ের শীর্ষেই দেখা মেলে ল্যাটেরাইটের। পাথর থেকে ল্যাটেরাইট তৈরির একটি প্রধান সর্ত বছরে অন্তত ২০০ সেণ্টিমিটার বৃষ্টিপাত। এত বৃষ্টিপাতের ফলে পাথরের অনেক উপাদানই অ্যাসিড-মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়। যা পড়ে থাকে, তা' হলো লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম-সমৃদ্ধ পাথর। সুতরাং সঠিক অর্থে ধরলে ল্যাটেরাইট ঠিক মৃত্তিকা নয়, আসলে আবহ-ক্ষয়িত পাথর। কোথাও কোথাও এই ল্যাটেরাইটে বেশি অ্যালুমিনিয়াম পড়ে থাকলে তখন তা' পরিণত হয় বকসাইটে। এই বকসাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক।

সুতরাং চাষবাসের কাজে ল্যাটেরাইট বিশেষ উপযুক্ত নয়। তবে কয়েক ধরনের গাছ আছে যা এই ধরনের ল্যাটেরাইটে চাষের উপযোগী। যেমন, কাজু বাদাম ও ট্যাপিয়োকা।

iv) **সমুদ্র-উপকূলের মৃত্তিকা** ঃ সমুদ্র-উপকূলের মৃত্তিকায় থাকে মাটি ও বালির মিশেল।

(খ) সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকার মৃত্তিকা

নদী উপত্যকার নিম্নভূমিতে পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালের নদীবাহিত পলি। নদীর জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চলের থেকে প্রায় ৩০ মিটার ওপরে ভাঙ্গর মাটির (bhangar) স্তর। এতে আছে বালি ও কাঁকর। বয়েসের দিক থেকে এই ভাঙ্গর কিছুটা পুরনো। নদীখাতের পলি খুবই মিহিদানার এবং বয়েসও বেশ কম। নদী উপত্যকার বদ্বীপে মিহিদানার মাটির পরিমাণ বেশি। কিন্তু নদীর উজানের দিকে স্বভাবতই বালির পরিমাণ বেশি।

ভারতীয় নদ-নদীর পরিচয়

ভারতবর্ষে রয়েছে অসংখ্য নদনদী। বহুকাল ধরেই এইসব নদী জড়িয়ে রয়েছে ভারতের প্রাণধারার সঙ্গে। হয়তো তাই ঋকবেদের যুগ থেকেই নদীকে কল্পনা করা হয়েছে দেবী হিসেবে।

ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা। ঋকবেদ, পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্যে রয়েছে গঙ্গানদী সম্পর্কে নানা কাহিনী। একটি কাহিনীতে রয়েছে, দেবতাদের অনুরোধে পিতা হিমালয় গঙ্গাকে দেবতাদের হাতে সমর্পণ করলে দেবতারা তাকে স্বর্গে নিয়ে আসেন। গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাহিনী জড়িয়ে আছে প্রধান শাখা ভাগীরথীর সঙ্গে। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগরপুত্রদের উদ্ধার করবার জন্য সগর বংশের ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে পতনের সময় গঙ্গাকে ধারণ করবে কে? তাই মহাদেব তাকে মাথায় ধারণ করেন। মর্ত্য থেকে পাতালে গমনের সময় গঙ্গা জহ্নুমুনির যজ্ঞশালা প্লাবিত করলে মুনি গঙ্গাকে পান করেন নিঃশেষে ও পরে কান দিয়ে বের করে দেন। তাই গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। ভগীরথের মেয়ের মতো, তাই নাম ভাগীরথী। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—এই তিনলোকেই প্রবাহিত বলে ত্রিপথগা নামে প্রসিদ্ধ।

মহাভারতে রাজা শান্তনুর পত্নী গঙ্গা অভিশপ্ত অষ্টবসুর জননী। গঙ্গা একদিকে যেমন ভারতের প্রধান নদী, তেমনি অন্যদিকে ভারতবাসীর কাছে পবিত্র সলিলা। তাই হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাতীরেই অবস্থিত।

ভাগবত পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনী সম্বন্ধে জানা যায়, ত্রিবিক্রম-রূপী বিষ্ণু বা' পায়ের আঙ্গুলের নখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ থেকে গঙ্গার জলধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়।

দেবী ভাগবত আর ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের মতে রাধা-কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে ও বিষ্ণুর পা থেকে গঙ্গার জন্ম। কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসের উৎসবে মহাদেব কৃষ্ণসঙ্গীত করলে রাধাকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গলে যান।

আর একটি কাহিনীতে রয়েছে, রাধা ঈর্ষান্বিতা হয়ে গঙ্গাকে পান করতে চাইলে গঙ্গা কৃষ্ণের পায়ে আশ্রয় নেন। তখন জলের অভাবে

দেবতারা অনুরোধ করলে কৃষ্ণ তার পায়ের কড়ে আঙুলের নখের গোড়া থেকে গঙ্গাকে বের করে দেন। এজন্য গঙ্গার আর একটি পরিচয় বিষ্ণুপদী নামে।

গঙ্গা মকরবাহিনী, শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজা হিসেবেও পূজিতা। এঁর বিশেষ পুজোর দিন জ্যেষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী। এই দিন গঙ্গাস্নানে দশ রকম পাপ দূর হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। তাই এই তিথিটি গঙ্গা দশ-হরা নামে পরিচিত। রাজা সমুদ্রগুপ্তের কিছু মুদ্রায় বিশাল আকারের মকরে গঙ্গা মূর্তি আভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইলোরার ১৬ নং গুহায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মূর্তি খোদাই করা আছে।

শুধু গঙ্গা নয়, ভারতের অনেক নদনদীর নামের সঙ্গেই কোন না কোন কল্পকাহিনী জড়িয়ে আছে। অবশ্য অনেক নদীর নাম তার চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়েও রাখা হয়েছে।

ঘর্ঘরা নদীর উপনদী সরস্বতী নদীর নাম হিন্দু দেবী সরস্বতীর নামে। পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হলে কুমারীত্ব বাঁচাবার জন্য সরস্বতী নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন মাটির নিচে। কিছুদূর মাটির নিচে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার মাথা তোলেন মাটির ওপরে। পরে ব্রহ্মার ভয়ে আবার মুখ লুকিয়ে ফেলেন মাটির নিচে। সরস্বতী নদী বাস্তবক্ষেত্রেও অনেকাংশেই ফল্গুনদী হিসেবে প্রবাহিত।

নর্মদা শব্দের অর্থ গভীর নীল জল। কথিত আছে, অমরকণ্টক পাহাড়ে বিশ্রামরত ব্রহ্মার চোখ থেকে ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা চোখের জল। সেই চোখের জল থেকে তৈরি হয় পাহাড়ের একপাশে শোন, অন্যপাশে নর্মদা। বাস্তবক্ষেত্রেও শোন ও নর্মদা নদীর মাঝখানে রয়েছে একটি শৈলশিরা। নর্মদা নদীর জলকে মনে করা হয় খুবই পবিত্র। এমন কি দেবী গঙ্গাকেও নিজেকে পবিত্র করবার জন্য বছরে একবার অবগাহন করতে হয় নর্মদা নদীর জলে। পুণ্যলোভাতুরদের ধারণা, সরস্বতী নদীতে তিনদিন, যমুনা নদীতে সাতদিন ও গঙ্গায় মাত্র একবার ডুব দিলে যেখানে পুণ্য সঞ্চয় হয় সেখানে নর্মদা নদীর জল দর্শন করলেই সেই পুণ্য অর্জিত হয়।

কাবেরী নদীর নাম এসেছে তামিল শব্দ থেকে। তামিলে 'কা' শব্দের অর্থ বাগান আর 'এরী' শব্দের মানে সরোবর। সব মিলিয়ে কাবেরী শব্দের অর্থ বাগানযুক্ত সরোবর। কাবেরী নদীকে অর্ধগঙ্গাও বলা হয়।

একটি কাহিনী অনুসারে ব্রহ্মার কন্যার নাম বিষ্ণুমায়া। ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়াকে দান করেন কাবেরা মুনির কাছে। বিষ্ণুমায়া পালক পিতা কাবেরা মুনির নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য কাবেরী নাম নিয়ে নদীর মতো বইতে শুরু করে।

উত্তর ভারতের কয়েকটি নদীর জন্ম তিব্বতের মালভূমিতে মানস সরোবর হ্রদে। এই হ্রদের আয়তন ৫১২ বর্গ কিলোমিটার, গভীরতা ৯১ মিটার। মানস সরোবরের কাছে কৈলাস পর্বত (উচ্চতা ৬৭৭৬ মিটার)। সিন্ধু, শতদ্রু (Sutlej), কারনালি এবং সাং পো (ব্রহ্মপুত্র)—এই চারটি নদীর জন্ম মানস সরোবরের কাছে কৈলাস পর্বতে। শতদ্রু নদীর তিব্বতী নাম 'লাংচেন খামবার'—যার অর্থ হাতি মুখ। এই নামকরণের কারণ—যে হিমবাহ থেকে নদীটির জন্ম তার চেহারা অনেকটা হাতির মুখের মতো। লাঙ্গল ও রূপার নগরের মধ্যে যে উপত্যকা—তার সংস্কৃত নাম হাতৌথ এর অর্থ হাতি-উপত্যকা। পরে এই নদীর নাম হয় শতদ্রাব। শত মানে একশো, দ্রাব শব্দের অর্থ জলধারা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় একশো জলের ধারা। শতদ্রাব শব্দ থেকে শতদ্রু নামের উৎপত্তি। রূপার থেকে শতদ্রু নদীর দু'টি জলধারা, মাঝে দ্বীপ। দু'টি জলধারা আবার মিলেছে লুধিয়ানার কাছে।

মরুভূমির নদী লুনির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'লাভানরী' শব্দ থেকে। এই শব্দের অর্থ নোনা নদী। তাম্রপর্ণী নদীর অর্থ 'তামার জল।' নামকরণ ঠিকই হয়েছে, কারণ নদীগর্ভে পলির রং লাল। করনাটকের মালপ্রভা নদীর নামের অর্থ 'কর্দমাক্ত'। সিলেরু নদীর নামের অর্থ পাথুরে নদী। আবার 'শোন' নদীর নামের অর্থ সাবর্ণ (সোনা)। বংশধারা নদীর নামের অর্থ বাঁশবনের ভেতর থেকে আসা নদী। সাবরমতী নদীর দু'পারে বাস করত বহু সাবর অর্থাৎ হরিণ। তাই এই নাম। মাছকুণ্ড নদীর নাম এই রকম, কারণ ঐ নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

সিন্ধু নদীর নামকরণের সঙ্গে পুরনো যুগের ইতিহাস খানিকটা জড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত আর্যদের প্রথম চোখে পড়ে সিন্ধু নদী। এই নদীটির বিশালতা দেখে আর্যরা মনে করেন, এটি নদী নয়, সাগর অর্থাৎ সিন্ধু। পারসীয় আর্যরা বোধহয় ঠিকঠাক মতো দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করতে পারত না, তাই ওঁদের উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দ শোনাত 'হিন্দু' শব্দের মতো। সেই থেকে এদেশের মানুষদের নাম হয়ে গেল হিন্দু।

অববাহিকার আয়তন ও নদীখাতে জলপ্রবাহের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ভারতীয় নদনদীকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) প্রধান নদনদী খ) মাঝারি নদনদী গ) ছোট নদনদী

ক) প্রধান নদনদী (চিত্র ২)

এসব নদনদীর অববাহিকার আয়তন ২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি।

ভারতে প্রধান নদনদীর সংখ্যা ১৪। এদের নাম ঃ

১) সিন্ধু (The Indus) ২) গঙ্গা (The Ganges)
৩) ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra) ৪) সাবরমতী (Sabarmati)
৫) মাহী (Mahi) ৬) নর্মদা (Narmada)
৭) তাপ্তী (Tapti) ৮) সুবর্ণরেখা (Subarnarekha)
৯) ব্রাহ্মণী (Brahmani) ১০) মহানদী (Mahanadi)
১১) গোদাবরী (Godavari) ১২) কৃষ্ণা (Krishna)
১৩) পেন্নার (Pennar) ১৪) কাবেরী (Cauvery)

খ) মাঝারি নদনদী (চিত্র ২)

যে সব নদীর অববাহিকার আয়তন ২০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে, তারাই মাঝারি নদনদীর পর্যায়ে পড়বে। ভারতে এই পর্যায়ের নদনদীর সংখ্যা ৪৪।

গ) ছোট নদনদী

এ ধরনের নদনদীর আয়তন ২০০০ বর্গ কিলোমিটারের কম। ভারতে এই পর্যায়ের ছোট নদনদীর সংখ্যা ৫৫। এ ধরনের নদনদীর অবস্থান মূলত ভারতের তটভূমি অঞ্চলে।

মাঝারি ও ছোট নদনদীর নাম পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

জলপ্রপাত

ভূবিজ্ঞানীর ভাষায় পাহাড়ী খরস্রোতা নদী যখন চলতে চলতে উঁচু মালভূমি থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাহাড়ের খাদে, তখনই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। সাধারণ চোখে সব জলপ্রপাত এক মনে হলেও বিজ্ঞানীরা এদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। নদীখাতে জলের পরিমাণের ওপরই এদের কৌলিন্য নির্ভর করে। যেমন, যে জলপ্রপাতের ঢাল তেমন বেশি নয়, তাকে বলা হয় র‍্যাপিড। ছোট নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে এই

ধরনের ছোট জলপ্রপাতের প্রায়ই দেখা মেলে। আর যখন জলপ্রপাতের অজস্র ধারা সিঁড়ির মতো ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে আসে চঞ্চলা বালিকার মতো, তখন তার নাম ক্যাসকেড (Cascade)।

রাঁচির কাছাকাছি জোনহা জলপ্রপাতকে বোধহয় এই জাতের মধ্যে ফেলা যায়। আর ক্যাটারাক্ট ধরনের জলপ্রপাতের রূপ ভয়ংকর, ভয়ংকর সুন্দর। ফুলে ফেঁপে খরস্রোতে পাথরের বুকে ধাক্কা খেয়ে এই উত্তাল জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচের অতল গহ্বরে। উত্তর আমেরিকার উগুরাসু অথবা রোডেশিয়ার (আফরিকা) ভিকটোরিয়া জলপ্রপাত মোটা-মুটি এই শ্রেণীতে পড়ে। বিশালতায় বা বিস্তৃতিতে তুলনামূলকভাবে ক্ষীণকায় হলেও রাঁচি থেকে ৪৩ কি. মি. দূরবর্তী হুডরু জলপ্রপাতকে এই জাতের মধ্যে ধরা যায়। এ ছাড়া রয়েছে করনাটকের গেরসোপ্পা জল-প্রপাত, যা উঁচু মালভূমি থেকে প্রায় ৮৫০ ফিট বা ২৬০ মি. নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৃষ্টি করছে অপরূপ সৌন্দর্যের। তামিলনাড়ুর কাবেরী নদীর শিব-সমুদ্রম জলপ্রপাতও (৩০০ ফিট বা ৯১ মি. উঁচু) কম সুন্দর নয়। মহা-রাষ্ট্রের গোকক নদীর বুকে গোকক জলপ্রপাত (১৮০ ফিট বা ৫৫ মি. উঁচু), মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর বুকে জব্বলপুর জেলার ধুঁয়াধার জল-প্রপাত ও গিরিডির কাছাকাছি উশ্রী জলপ্রপাতের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের কাছাকাছি বিডন, বিশপ ও এলিফ্যাণ্ট জলপ্রপাতের প্রসিদ্ধিও কম নয়।

হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর ঝরণা বা জলপ্রপাত চোখে পড়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশই নামহীন। তবে উত্তরবঙ্গের দারজিলিং জেলার পাগলাঝোরা ও সিকিমের লাচুং জলপ্রপাত দু'টি বহু পর্যটককে আকর্ষণ করছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত ভেনেজুয়েলার এনজেল জলপ্রপাত (৩,২১২ ফিট বা ৯৮০ মি.)। তবে সবচেয়ে বেশি জলবহন করে (৪,৭০,০০০ কিউসেক) ব্রাজিল-প্যারাগুয়ের ৩৭৪ ফিট উঁচু গুইরা জলপ্রপাত। পৃথিবীর সবচেয়ে চওড়া জলপ্রপাত লাওসের খোন জল-প্রপাত—যা চওড়ায় ৬·৭ মাইল বা ১০·৭ কিলোমিটার।

প্রধান নদনদীর বর্ণনা

হিমালয়জাত নদনদীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিন্ধু, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র। হিমালয়জাত নদীগুলিতে সারা বছরই জল থাকে। এদের পুষ্টি হয় হিমালয় পাহাড়ের বরফ-গলা জল থেকে। এসব নদীতে প্রচুর পলি থাকে এবং এরা প্রায়ই দিক পরিবর্তন করে। বিশেষত কোশী ও পাগলাদিয়া নদীতে এ ধরনের বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

সিন্ধু নদ

সিন্ধু নদের মধ্যে রয়েছে মূল সিন্ধু নদ ও এর বেশ কয়েকটি উপনদী। এদের মধ্যে পশ্চিম থেকে আসা কাবুল, স্বাত ও কুরাম এবং পূর্ব থেকে আসা ঝিলম, চন্দ্রভাগা বা চেনাব (chenab), রবি, বিপাশা (Beas) ও শতদ্রু (sutlej) উল্লেখযোগ্য। কাবুল নদী সিন্ধু নদের সঙ্গে মিলিত হবার আগেই এর সঙ্গে মেশে স্বাত নদী। কুরাম নদী সিন্ধু নদের সঙ্গে মেশে মিয়াঁওয়ালিতে। পূর্ব দিক থেকে আসা পাঁচটি নদী মিশে জন্ম নেয় পঞ্চনদী, যা সিন্ধু নদের সঙ্গে মিলিত হয় সমুদ্রের মোহনা থেকে ৯৬০ কিলোমিটার আগে (চিত্র ৩)।

মূল সিন্ধু নদের জন্ম তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদে ৫১৮০ মিটার উচ্চতায়। জন্মের পর সিন্ধু নদকে পেরোতে হয় উত্তর কাশ্মীর ও গিলগিটের দুর্গম পর্বত। তারপর পাকিস্তানের পর্বত পেরিয়ে অ্যাটক নামে একটি জায়গায় সমতলভূমিতে নেমে আসে। অ্যাটক থেকে শুরু করে আরব সাগরের মুখ পর্যন্ত প্রায় ১৬১০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করতে হয় সিন্ধুনদকে। পাহাড়ী পথ ধরলে সিন্ধু নদের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২৮৮০ কিলোমিটার।

কাবুল নদীর জন্ম আফগানিস্তানে হলেও পাকিস্তানে প্রবেশ করে ওয়ারসাক নামে একটি জায়গায়। পেশাওয়ার উপত্যকা পেরোবার সময় মিলন হয় স্বাত নদীর সঙ্গে। এই নদীর জন্ম পাকিস্তানের পার্বত্য এলাকায়। কুরাম নদীর জন্ম আফগানিস্তানে। এটি পাকিস্তানে প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট জেলায়।

ঝিলম নদীর জন্ম কাশ্মীরের ভেরিনাগ পাহাড়ে ছোট্ট ঝরণার আকারে। প্রায় ২৫০ বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই জায়গাটিকে নানাভাবে মনোরম সুসজ্জিত করে রেখেছেন। আজো এটি পর্যটকদের কাছে পরম দর্শনীয় স্থান। ঝিলম নদী কাশ্মীরের মনোরম উপত্যকার ওপর দিয়ে ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। পথে পীরপঞ্জাল পর্বতের ভেতর দিয়ে পেরোবার সময় সৃষ্টি করেছে গভীর গিরিখাত। ঝিলম নদীর উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিডার, সিন্ধু ও পোহরু নদী। এই তিনটি উপনদীর জন্ম কাশ্মীরেই। ঝিলম নদী চেনাব নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ট্রিমু নগরের কাছে। ভারত-পাক সীমান্ত পর্যন্ত ঝিলম নদীর অববাহিকার আয়তন ৩৪,৭৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

হিমাচল প্রদেশের কুলু অঞ্চলে জন্মের পর রবি নদী বয়ে গেছে পীরপঞ্জাল ও ধৌলাধর পাহাড় দু'টির মাঝখান দিয়ে। পাহাড় ছাড়িয়ে পানজাবের সমভূমিতে অবতরণ করে মাধোপুরে। পরে পাকিস্তানে প্রবেশ করে অমৃতসর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে। ভারতের ভেতরে অববাহিকার আয়তন ১৪,৪৪২ বর্গ কিলোমিটার।

বিপাশা নদীর জন্ম কুলুর কাছে রোটাং গিরিদ্বারে, ৩৯৬০ মিটার উচ্চতায়। লারজি থেকে তালওয়ারা পর্যন্ত গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে পানজাবের সমতলে হারিকে নগরের কাছে মিশেছে শতদ্রু নদীর সঙ্গে। বিপাশা নদীর দৈর্ঘ্য ৪৬০ কিলোমিটার ও অববাহিকার আয়তন ২০,৩০৩ বর্গ কিলোমিটার।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন চন্দ্র ও ভাগা—এই দু'টি নদীর মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নামে পরিচিত। বর্তমান নাম চেনাব। পানজাব, কাশ্মীর ও পাকিস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী। বাড়লাচ গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ-পূর্বের ৪৮৬৬ মিটার উঁচু তুষারস্তূপ থেকে চন্দ্র নদী নির্গত হয়ে তাণ্ডিতে একই গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত ভাগা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখান থেকেই এই যুক্তধারা চন্দ্রভাগা বা চেনাব নাম নিয়েছে। চন্দ্রভাগা পাকিস্তানের ঝঙ্ জেলায় ট্রিমু-র কাছে বিতস্তা বা ঝিলম নদীর সঙ্গে এবং সিন্ধুর কাছে ইরাবতী বা রবি নদীর সঙ্গে মিলেছে। মদওয়ালার কাছে শতদ্রু নদীর সঙ্গে মিলিত হবার পর পঞ্চনদ নাম নিয়ে সিন্ধু নদীতে গিয়ে মিশেছে। এটি পঞ্চনদের অন্যতম নদী। কালিকা পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি বৈদিকদের কাছে অশিক্নী ও গ্রীকদের কাছে আকেসিনেস নামে পরিচিত। চন্দ্রভাগা নদী অতীতে বেশ কয়েকবার
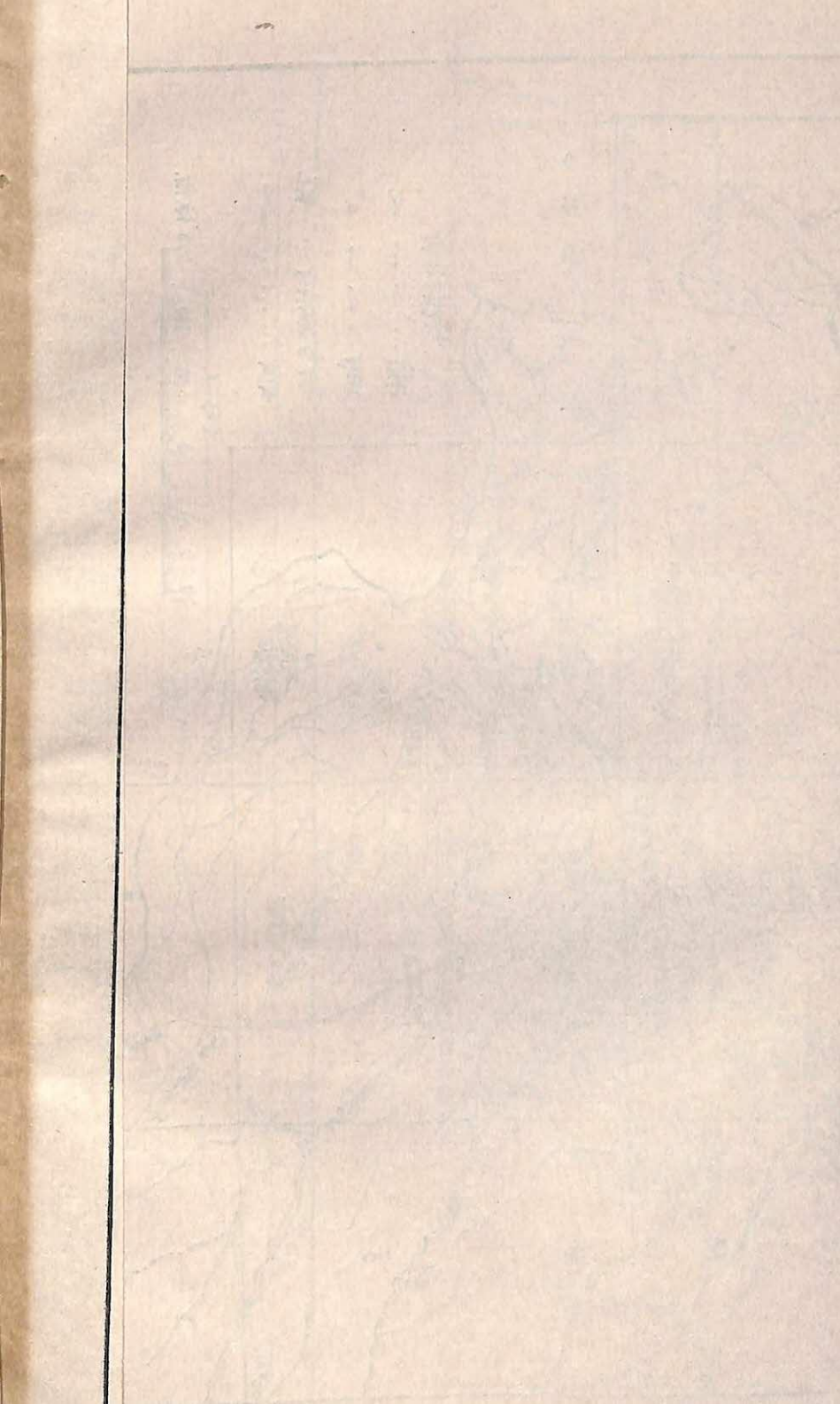
তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ১২৪৫ খ্রী পর্যন্ত মুলতান শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মুলতানে চন্দ্রভাগার তীরে একটি সূর্যমন্দির আছে, যেটি মহাভারতের অন্যতম রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব-এর স্মৃতি-বিজড়িত। কোনারকের সূর্যমন্দিরটি এরই অনুকরণে নির্মিত।

খানকির কাছে চন্দ্রভাগা থেকে খাল কাটা হয়েছে। শাখা-প্রশাখা সমেত ঐ খালের মোট বিস্তার প্রায় ৩৮৯৯ কিলোমিটার। খালগুলি সারা বছরই জলে ভর্তি থাকে। এই জলের সাহায্যে পাকিস্তানের লায়ালপুর ও আশেপাশের প্রায় ৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার মরুভূমির মতো এলাকা উর্বরা ভূমিতে রূপান্তরিত। কাশ্মীরের মারলোর কাছেও আর একটা খাল কাটা হয়েছে। এতেও সারা বছর জল থাকে। এই খালের জল গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট এবং শেইখপুরা অঞ্চলে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। উৎপত্তিস্থল থেকে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত চন্দ্রভাগা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ কিলোমিটার। ভারতের ভেতরে চন্দ্রভাগা নদীর অববাহিকার আয়তন ২৬,১৫৫ বর্গ কিলোমিটার। পাকিস্তানের আখনুরের পর থেকে চন্দ্রভাগা নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী।

মানস সরোবর হ্রদের কাছে দরমা গিরিদ্বারে ৪৫৭০ মিটার উচ্চতায় শতদ্রু নদীর জন্ম। জাসকার পর্বতের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। রূপারের কাছে সমতলভূমিতে নেমে আসবার আগে অন্তর্হিমালয় ও বহিঃ-হিমালয় কেটে বেরোয় শতদ্রু নদী। তারপর প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরত্ব ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছে শতদ্রু নদী। তবে পাকিস্তানে পুরোপুরি প্রবেশ করে সুলেমাংকিতে।

সিন্ধু নদের অববাহিকার মোট আয়তন ১১·৬৫ লক্ষ বর্গ কিলো-মিটার। তবে এর মধ্যে ভারতের মধ্যে পড়েছে ৩,২১,২৯০ বর্গ কিলোমিটার।

গঙ্গা নদী

ভারতের বুকে অনাদি অনন্তকাল ধরে পবিত্র জলধারার মতো বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। এই নদী ভারতের হৃদয়ের মতো। গঙ্গার অববাহিকার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

বলেছেন, ভারতের সব নদীর মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ নদী। ভারতের হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় এর বুকে কান পাতলে। তাইতো সভ্যতার শুরু থেকে গঙ্গা নদীর কাছে ছুটে এসেছে অগণিত লক্ষ মানুষ। উৎস থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার বয়ে চলা আসলে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার কাহিনী। নানা সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস, নগরের উত্থান পতন, নানা মনীষীর চিন্তা, জীবনের পাওয়া, না-পাওয়া মানুষের জন্ম-মৃত্যু সবই জড়িয়ে আছে এই নদীর প্রবাহের সঙ্গে।

গঙ্গা-সমভূমি ভারতের ভৌগলিক আয়তনের মাত্র বারো শতাংশ এলাকা, কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিরিশ শতাংশ অধিবাসী এই জঙ্গা-সমভূমির বাসিন্দা। তাই গঙ্গার ভজনা করে পদ্ম-পুরাণে লেখা হয়েছে ঃ

গঙ্গা-মাকে পূজা করো
সুখ-সমৃদ্ধি বাড়বে আরো
শান্তি ও স্বর্গের নিশানা
গঙ্গা-ভজনায় যাবে জানা ॥
(পদ্ম-পুরাণ, পঞ্চম ৬০.৩৯)

গঙ্গা নামটি নদীর নামের সঙ্গে এমনই অচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে, যে অন্য অনেক দেশের নদীও গঙ্গা নামেই পরিচিত। যেমন শ্রীলংকার সবচেয়ে বড় নদীর নাম 'মহাবলী গঙ্গা।' ইন্দো-চীনের এক নদীর নাম 'মহা-গঙ্গা' নামের কাছাকাছি।

অবশ্য উৎস কিংবা মোহনার কাছাকাছি কোথাও গঙ্গা নদীর নাম গঙ্গা নয়। দেব প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ভাগীরথীর মিলিত হবার পর থেকে এর নাম গঙ্গা। অলকানন্দার পাড়ে পবিত্র বদ্রীনাথ ও ভাগীরথীর তীরে উত্তর কাশী। গঙ্গার জন্ম উত্তর কাশী জেলার গঙ্গোত্রীতে, ৭০১০ মিটার উঁচুতে। প্রায় ২৫০ কিলোমিটার প্রবাহিত হবার পর ঋষিকেশের কাছে অবতরণ করে সমতল ভূমিতে। আরো ৩০ কিলোমিটার নিচে হরিদ্বার। এখানকার হর-কী-পৌরিতে পুণ্যার্থী মানুষ অবগাহন করে পবিত্র গঙ্গার জলে। হরিদ্বার থেকে একটু দূরে একটি বাঁধের কাছে গঙ্গার প্রথম (উঁচু) গঙ্গা-খালটি বেরিয়েছে। ২৪০ কিলোমিটার নিচে নারোরা বাঁধ থেকে বেরিয়েছে দ্বিতীয় (নিচু) গঙ্গা-খালটি। আরো ৫৩০ কিলোমিটার দূরে এলাহাবাদের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে যমুনা নদী। এর আগে মিরজাপুরের বিখ্যাত ঘাট। ২৪৫ কিলোমিটার নিচে বারাণসী।

গঙ্গার উজানের দিকে উত্তর থেকে মিলিত হয়েছে রামগঙ্গা, গোমতী ও টনস আর দক্ষিণ থেকে চম্বল (যমুনার উপনদী), বেতোয়া, সিনদা ও কেন।

বারাণসী থেকে ১৫৫ কিলোমিটার নিচে বিহারে প্রবেশ করেছে গঙ্গা। গঙ্গার এই মাঝের অংশে মিলিত হয়েছে ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ি শোন, বাগমতী ও কোশীর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপনদী। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গার একমাত্র উপনদী মহানন্দা।

রাজমহল থেকে ১০০ কিলোমিটার নিচে গঙ্গা দু'টি শাখায় বিভক্ত। একটি ভাগীরথী, নিচের দিকে কালনার পরে এর নাম হুগলী। আর একটি শাখা পদ্মা, যা বেশ কিছুটা অংশে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের ভেতরে ২২০ কিলোমিটার নিচে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র (বা যমুনা)। আরো ১০০ কিলোমিটার নিচে মেঘনার সঙ্গে মিলনের পরে গঙ্গা মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

উৎস থেকে শুরু করে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য (হুগলী বরাবর মাপলে) ২৫২৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৪৫০ কিলোমিটার উত্তরপ্রদেশে, ৪৪৫ কিলোমিটার বিহারে ও ৫২০ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গে (চিত্র ৪)।

গাঙ্গেয় অববাহিকার যে অংশ ভারতে পড়েছে, তার মোট আয়তন ৮৬১,৪০৪ বর্গ কিলোমিটার। এর বিস্তৃতি ভারতের আটটি প্রদেশে। কোন প্রদেশে কতটা পড়েছে, তার হিসেব দেওয়া হলো নিচে।

১. উত্তরপ্রদেশ ৩৪·২%
২. হিমাচল প্রদেশ ০·৫%
৩. পানজাব ও হরিয়ানা ৪·০%
৪. রাজস্থান ১৩·০
৫. মধ্যপ্রদেশ ২৩·১%
৬. বিহার ১৬·৭%
৭. পশ্চিমবঙ্গ ৮·৩%
৮. দিল্লীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ০·২%

গঙ্গার অববাহিকার আয়তন ভারতের মোট আয়তনের চার ভাগের এক ভাগ (২৬·৩%) এবং এটিই ভারতের সবচেয়ে বড় নদী-অববাহিকা। নেপালে গঙ্গার কয়েকটি উপনদী—যেমন ঘর্ঘরা, গণ্ডক আর কোশির

অববাহিকার আয়তন ১,৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশে মহানন্দার অববাহিকার আয়তন ৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে গঙ্গার মোট অববাহিকার পরিমাণ ১০·৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

গঙ্গার সঙ্গে উত্তর থেকে মিলিত হয়েছে সাতটি উপনদী, দক্ষিণ থেকে ছ'টি উপনদী। তাছাড়া শেষ পর্যায়ে ভাগীরথী হুগলির সঙ্গে মিশেছে পাঁচটি উপনদী।

প্রধান উপনদীগুলির বর্ণনা

রামগঙ্গা নদীর জন্ম গাড়োয়াল জেলার পাহাড়ে, ৩১১০ মিটার উচ্চতায়। পাহাড় থেকে নেমে সমভূমিতে মেশে কালাগড়ের কাছে। এখানেই রামগঙ্গা বাঁধ তৈরি হয়েছে। গাড়োয়াল ছাড়া আরো কয়েকটি জেলা পেরিয়ে রামগঙ্গা উত্তর প্রদেশের কানৌজে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রামগঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য ৫৯৬ বিলোমিটার। রামগঙ্গার অববাহিকার আয়তন ৩২,৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার। রামগঙ্গার কয়েকটি উপনদী রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খো, গনগন, আরিল, কোশী, দেওহা (গোরা) ইত্যাদি।

পিলভিট নগরের ৩ কিলোমিটার পূর্বে ২০০ মিটার উঁচু পাহাড়ে গোমতীর জন্ম। এর অববাহিকা রামগঙ্গা ও ঘর্ঘরার মাঝখানে। গোমতীর উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাছাই, সাই, জোমকাই, বর্ণা, চুহা, সরায়ু। লখনৌ শহরের অবস্থান গোমতী নদীর তীরে। ৯৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ গোমতীর অববাহিকার আয়তন ৩০,৪৩৭ বর্গ কিলোমিটার। গোমতীর সবচেয়ে বড় উপনদী সাই, এর অবরাহিকার আয়তন গোমতীর অববাহিকার আয়তনের তিনভাগের এক ভাগ।

ঘর্ঘরা নদীর জন্ম মানস সরোবর হ্রদের কাছে। নেপালে এর নাম মানছু আর কারনালি। গোমতীর অববাহিকার মোট আয়তনের (১,২৭,৯৫০ বর্গ কিলোমিটার) মধ্যে কেবল শতকরা ৪৫ ভাগ ভারতে পড়েছে। এর একটি উপনদী শারদা বা চৌকা নেপাল ও ভারতের মধ্যে সীমারেখার অনেকটা ধরে প্রবাহিত। ভারতের ভেতরে ঘর্ঘরার আর একটি উপনদী সরযূ, যার তীরে ছিল রামায়ণের অযোধ্যা শহর। সরযূ নদীতে প্রায়ই বন্যার ফলে ডুবে যায় আজমগড় ও বালিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বন্যার সময় মাঝে মাঝে সরযূ নদীর বিস্তার দাঁড়ায় ১৬ কিলোমিটারের কাছাকাছি। অন্যান্য উপনদনদীদের মধ্যে রয়েছে রাপ্তী ও ছোট গণ্ডক। রাপ্তীর জন্ম নেপালের পাহাড়ে ৩৬০০ মিটার উচ্চতায়। ভারত ও নেপা-

লের সীমারেখায় রাপ্তী নেমে আসে পাহাড় থেকে সমভূমিতে। নদীখাতের গভীরতা খুব কম। ফলে প্রায়ই বন্যায় ভেসে যায় পূর্ব উত্তরপ্রদেশের অনেক জেলা। গণ্ডক নদীর পুরনো খাতে ৩০০ মিটার উচ্চতায় ছোট গণ্ডকের জন্ম। এটি ঘর্ঘরার সঙ্গে মিলিত হয় শাহজাহানপুরে। তবে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে নদীতে জল খুব কম থাকে। বিহারের ছাপরা শহর ছাড়িয়ে কিছু দূরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় ঘর্ঘরা। ১০৮০ কিলো-মিটার দীর্ঘ ঘর্ঘরা নদীতে প্রচুর জল।

গণ্ডক নদী নেপালে কালী নামে পরিচিত। নেপাল সীমান্তের কাছে তিব্বতে ৭৬২০ মিটার উচ্চতায় গণ্ডকের জন্ম। সামনে স্তব্ধ সুন্দর ধৌলগিরি পর্বতশৃঙ্গ। গণ্ডক নদীর অববাহিকার আয়তন ৪৬,৩০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৭৬২০ বর্গ কিলোমিটার ভারতের সীমারেখার ভেতরে। নেপালে এর কয়েকটি উপনদী রয়েছে। এদের মধ্যে মায়ানগড়ি, বাঁড় ও ত্রিশূলী উল্লেখযোগ্য। বিহারের ত্রিবেণীতে গণ্ডক নদী পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সমতলভূমিতে। এখানে নদীর বুকে নির্মিত বাঁধ থেকে দু'টি খাল কাটা হয়েছে। খালের জলে ১৫ লক্ষ হেকটর জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। বাঁধ থেকে ৩০০ কিলোমিটার নিচে পাটনার কাছে মিলিত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে।

উৎসের কাছে বুড়ি গণ্ডকের নাম শিকরাহানা। জন্ম বিহারের চমপারন জেলায় ৩০০ মিটার উচ্চতায়। অববাহিকার দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলো-মিটার, আয়তন ১০,১৫০ বর্গ কিলোমিটার। মুঙ্গের শহরের বিপরীত দিকে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বাগমতী নদীর জন্ম নেপালের শিবপুরী পাহাড়ে, ১৫০০ মিটার উচ্চতায়। মহাভারত পর্বশ্রেণীকে ভেদ করে ভারতের মজঃফরপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। অববাহিকার আয়তন ১০,১৫০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৬৩২০ বর্গ কিলোমিটার ভারতের ভেতরে। নেপালের বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দিরের অবস্থান এই নদীর পারে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান থাকায় বাগমতী নদীর জল মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। বাগমতী পরে কোশী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়।

কামলা নদীর জন্ম নেপালে, ১২০০ মিটার উচ্চতায়। নেপালে এর অনেকগুলি উপনদী আছে। দ্বারভাঙ্গা জেলার জয়নগরে ভারতে প্রবেশ করে কোশী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে কামলা নদী বালান নদীখাত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তাই এর আরেক নাম কামলা বালান।

নেপালে কোশী নদীর জন্ম সান কোশী, অরুণ কোশী ও তাম্বুর কোশী—এই তিনটি নদীর মিলনের ফলে। মোট অববাহিকার আয়তন ৭৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সীমারেখার মধ্যে রয়েছে ১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার। কোশী নদীতে মোট জলপ্রবাহের মধ্যে সান কোশীর অবদান ৪৪%, অরুণ কোশীর অবদান ৩৭% ও তাম্বুর কোশীর ১৯%। তাম্বুর কোশী নদীখাতের দু'পাশে খাড়া দেয়াল। অরুণ কোশী নদীর অববাহিকার মধ্যে পড়েছে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজংঘা পর্বতশৃঙ্গ।

তিনটি উপনদীর মিলনের পরে কোশী নদী সংকীর্ণ গিরিখাত ধরে ১০ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে ছাতরার কাছে সমতলভূমিতে নেমে এসেছে। আরো ২৫ কিলোমিটার ধরে প্রবাহিত হয়ে হনুমাননগরের কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারত ও নেপালের ২০ কিলোমিটার সীমান্ত বরাবর কোশী নদী বয়ে গেছে। হনুমান নগরের কাছে বানানো বড় বাঁধ থেকে দু'টি খাল কাটা হয়েছে। এই বাঁধের জলে নেপাল ও ভারতের প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

হনুমান নগরে এই বাঁধের উদ্দেশ্য, যাতে কোশী নদী ধারের দিকে প্রবাহিত হতে না পারে। শুধু কোশী নয়, গঙ্গানদীর মধ্যেও খাত পরিবর্তন করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (চিত্র ৫)। চীনের পীত নদীর (yellow river) মতো কোশী নদীও নদীখাতের দু'পাশ প্লাবিত করে বহু ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এই নদীতে পলির পরিমাণ প্রচুর, তাছাড়া নদীখাতের ঢালও বেশি। তাই পাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। বিগত ২০০ বছরে কোশী নদী পূর্ণিয়া থেকে ১১২ কিলোমিটার সরে এসেছে। নদীখাত থেকে সরে যাবার এই প্রবণতা বন্ধ করবার জন্য ১৯৫৪ সালে তৈরি হয় কোশী প্রকল্প। হনুমান নগরে বাঁধ তৈরি করে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে দু'পাশের দেয়ালের ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে পারে নদী। এই অঞ্চলে পাঁচ থেকে ষোল কিলোমিটার পরপর নদীপার বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তা' পলি মাটি থিতোবার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ছাতরা থেকে ৩২০ কিলোমিটার নিচে কুরসেলার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কোশী।

দারজিলিং শহরের নিচে ডাও-হিল (Dow Hill)-এর পাহাড়ী জায়গায় ২১০০ মিটার উচ্চতায় মহানন্দা নদীর জন্ম। জন্মের পরই পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে নয়ন-মনোরম জলপ্রপাতের। জলপ্রপাতের নাম পাগলাঝোরা। এর চারটি উপনদী—বালসান, মেছি,
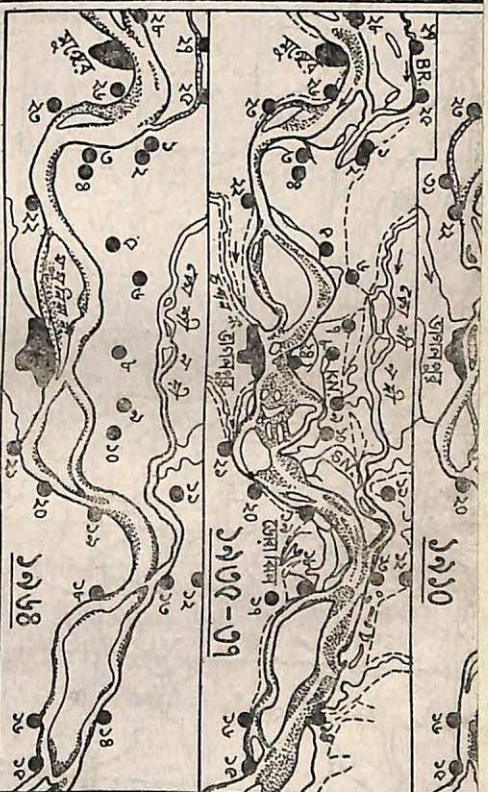
১ গোগ্‌রি	১১ কুরশেলা	২১ ঘোগা
২ জামালপুর	১২ কারাগোলা রোড	২২ সুলতানগঞ্জ
৩ মুরাদপুর	১৩ কারাগোলা	২৩ বড়িয়ারপুর
৪ মায়াগাঁও	১৪ মনিহারী	২৪ মহাদেওপুর ঘাট
৫ মথুরাপুর	১৫ সকরিগলি	২৫ মান্‌সী
৬ নারায়নপুর	১৬ সাহেবগঞ্জ	২৬ সীতাকুন্ড
৭ বীনপুর	১৭ পীরপেন্টি স্টেশন	২৭ খাগারীয়া
৮ খারিক	১৮ পীরপেন্টি	২৮ মুঙ্গের ঘাট

গঙ্গা নদীর খাতের পরিবর্তন
(মুঙ্গের থেকে সকরিগলি)
মুঙ্গের
ভাগলপুর
সকরিগলি
১৭৮১
১৮০১
১৯৩৮
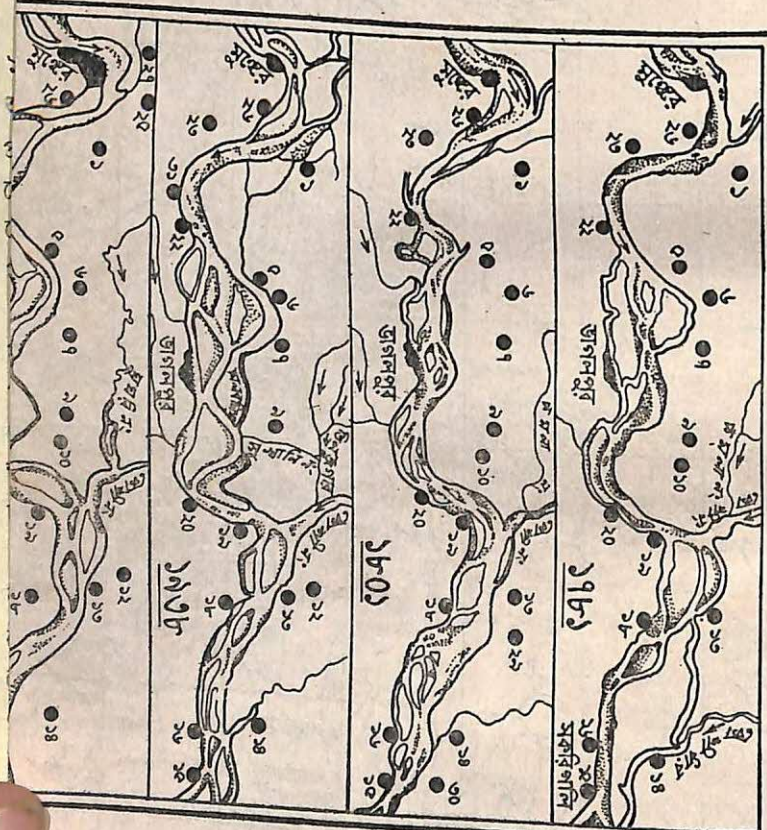
রত্না ও কংকাই। কংকাই খুবই খেয়ালী নদী। নেপালের পাহাড়ে জন্ম। নদীর জলের সঙ্গে প্রচুর পলি মিশে থাকে। মহানন্দার অববাহিকার আয়তন ২০,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের অংশে পড়েছে ১১,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীটি অনেকটা জায়গায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছে। আরো দু'টি নদী—তঙ্গন ও পুনর্ভবা বাংলাদেশের ভেতরে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে বাংলাদেশের গোড়াগিরিতে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয় মহানন্দা।

গঙ্গার ডান দিকের প্রধান উপনদী যমুনা। আবার যমুনা নদীর ডানদিকে পাঁচটি প্রধান উপনদী। চম্বল, হিনদন, শারদা, বেতোয়া ও কেন। যমুনা নদীর জন্ম উত্তর প্রদেশের টেহরি গাড়োয়াল জেলার যমুনোত্রী হিমবাহে, ৬৩৩০ মিটার উচ্চতায়। হিমালয় অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট নদী—যেমন, ঋষিগঙ্গা, উমা, হনুমান গঙ্গা ইত্যাদি যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যমুনার সবচেয়ে দীর্ঘ উপনদী টনস্ নদীর জন্ম ৩৯০০ মিটার উচ্চতায়। যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে কালসিতে। আরেকটি উপনদী গিরির জন্ম সিমলাতে। যমুনা নদীর সঙ্গে এর মিলন ঘটেছে পায়োনতায়।

তাজেওয়ালার কাছে যমুনা নদী পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। এখানে অনেকগুলি পশ্চিম ও পূর্বমুখী খাল যমুনা নদী থেকে বেরিয়েছে। আরো ২৪০ কিলোমিটার নিচে দিল্লীর ওখলায় কাটা হয়েছে আগরা খাল। ২৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ হিনদন নদীর জন্ম শাহারানপুরে। এটি যমুনার বা'তীরে মিলিত হয়েছে ওখলা থেকে ৪০ কিলোমিটার নিচে। যমুনা নদীর তীরে চারটি বড় শহর। দিল্লী, মথুরা, আগরা ও ও এলাহাবাদ। দিল্লী থেকে মথুরার দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার এবং আরো ৫০ কিলোমিটার নিচে আগরা শহর, যেখানে যমুনার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য অতুলনীয় স্মৃতিসৌধ তাজমহল। এলাহাবাদের কাছে যমুনার সঙ্গে সঙ্গম ঘটেছে গঙ্গার। কয়েকটি ছোট আকারের উপনদী—করন, সাগর ও রিন্দ যমুনার বা'তীরে মিশেছে আর বিন্ধ্য পর্বত থেকে নেমে আসা চামবা, সিন্ধু (Sindh), বেতোয়া ও কেন মিলিত হয়েছে যমুনার ডানতীরে।

উৎস মুখ থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যমুনার মোট দৈর্ঘ্য ১৩৭৬ কিলোমিটার। অববাহিকার মোট আয়তন ৩,৬৬,২২৩ বর্গ কিলোমিটার।

এর মধ্যে কেবলমাত্র চম্বল এলাকায় অববাহিকার আয়তন ১,৩৯,৪৬৮ বর্গ কিলোমিটার।

চম্বল নদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের মৌ শহরের কাছে ৬০৫ মিটার উঁচু জনপাও পর্বতে। যমুনার এই প্রধান উপনদীর জলপ্রবাহ দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এটি মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র ও দতিয়া জেলার ভেতর দিয়ে প্রায় ৩১২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে রাজস্থানে। রাজস্থানের কোটা শহরের আগে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি গিরিখাত পেরোতে হয়েছে। কোটা শহরের পর দক্ষিণ থেকে কালীসিন্ধ ও পার্বতী এবং পশ্চিম থেকে বনাস এসে মিশেছে চম্বলের সঙ্গে। তারপর সুউচ্চ শিলাপ্রাচীর ভেদ করে ঢোলপুর শহরের দক্ষিণে সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য কন্দর বা 'বেহড়' দ্বারা নদীতীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। উত্তর প্রদেশের এটাওয়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ১০৪০ কিলোমিটার। চম্বলের প্রধান উপনদী চম্বলা ও শিপ্রা (বা ক্ষিপ্রা)। বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে, কিন্তু অন্য সময় ক্ষীণকায়া। চম্বলের উপত্যকা একটি বিভীষিকাময় অঞ্চল। নদীতীরে রয়েছে হাজার হাজার দুর্গম গিরিসংকট ও গিরিপথ বা কন্দর—যার স্থানীয় নাম 'বেহড়'। বেহড় অঞ্চলে ডাকাতি লেগেই আছে। এখানকার ডাকাতি সমস্যা দীর্ঘদিনের। ডোঙ্গর বটরি, সুলতানা, দুল্লা, বলবতা, ঘুরগোলা, পঞ্চম সিং, চরজামল্লাহ, সুলতান সিং, মান সিং, রূপা সিং, পুতলী বাঈ—এইসব দস্যু সরদারদের নামে আতংক সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে অনেক লোকগাথাও রচিত হয়েছে। ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র ও দতিয়া জেলার ১৫৫৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৪২১৪ কিলোমিটার শুধু বেহড়। আমেরিকার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের সঙ্গে অনেকে এর তুলনা করেছেন। এই বেহড়গুলি প্রায় ২ থেকে ১৫০ মিটার উঁচু এবং দুর্ভেদ্য, নিচে খরস্রোতা চম্বল। প্রতি বছরই চম্বলের ভাঙ্গনে নতুন নতুন 'বেহড়' সৃষ্টি হয়, চাষের জমি কমে যায়, স্থানীয় মানুষদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়। ফলে ডাকাতি বাড়ে। একটা হিসেব থেকে জানা যায়, চম্বলের 'বেহড়' প্রায় চার লক্ষ একর জমি গ্রাস করেছে, এর মধ্যে অন্তত আড়াই লক্ষ একর জমি চাষের যোগ্য। চম্বল নদীতে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত রয়েছে। চম্বল নদীতে তিনটি বাঁধ (গান্ধী সাগর, রাণাপ্রতাপ সাগর ও জওহর

সাগর) থেকে প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এখান থেকে রাজস্থানের অনেক শহরেও বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। সিন্ধ (Sindh) নদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলায়, ৫৪৩ মিটার উচ্চতায়। ৪১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির অববাহিকার আয়তন ২৫,০৮৫ বর্গ কিলোমিটার। চম্বল-যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে কিছুটা নিচে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর উপনদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্বতী, কুঁয়াবী ও পাহুজ।

মধ্যপ্রদেশের ভূপাল জেলায় ৪৭০ মিটার উচ্চতায় বেতোয়া নদীর জন্ম। ৫৯০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে হামিরপুরের কাছে যমুনার সঙ্গে মিলন ঘটেছে এর। অববাহিকার মোট আয়তন ৪৫,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার। উল্লেখযোগ্য উপনদীর নাম ধাসান।

কেন নদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার কাইমুর পাহাড়ে। ৩৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর সঙ্গে যমুনার সঙ্গম ঘটেছে চিল্লার কাছে। অববাহিকার আয়তন ২৮,২২৪ বর্গ কিলোমিটার।

২৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টনস নদীর অববাহিকার আয়তন ১৬,৮৪০ বর্গ কিলোমিটার। কাইমুর পাহাড়ে ৬১০ মিটার উচ্চতায় তামাকুণ্ড সরোবরে জন্মের পর উর্বর রেওয়া ও সাতনা জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পুরয়া মালভূমির প্রান্তে এই নদী থেকে কয়েকটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। বিহার উপনদী থেকে সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাতের সৃষ্টি। উচ্চতা প্রায় ১১৩ মিটার। উত্তরপ্রদেশে বেলান উপনদী টনসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের ৩১১ কিলোমিটার নিচে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে টনস।

কর্মনাশা নদীর জন্ম মিরজাপুর জেলার কাইমুর পাহাড়ে, ৩৫০ মিটার উচ্চতায়। এর উপনদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাবতী, চন্দ্রপ্রভা, কারু-নুটি, নাদি, খাজুরি ইত্যাদি। কর্মনাশা ও অন্য কয়েকটি নদীর অববাহিকার পরিমাণ ১১,৭০৯ বর্গ কিলোমিটার।

শোন নদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের শোনভদ্রে ৬০০ মিটার উচ্চতায়। জন্মের পর পাহাড়ী ঢালের ওপর ঝরনার মতো অনেকটা পথ বয়ে গেছে। শোনের একটি উপনদী রিহন্দ। এই উপনদীর ওপর রিহন্দ বাঁধ তৈরি হয়েছে ১৯৬৩ সালে। বিহারের পালামৌ জেলায় শোন নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে উত্তর কোয়েল। পাটনা জেলার দানাপুর শহরের ১৬ কিলোমিটার উজানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৭৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির

অববাহিকার আয়তন প্রায় ৭১,২৫৯ বর্গ কিলোমিটার। দেহেরির কাছে ১৮৬৯-৭৯ সালে একটি ছোট বাঁধ (weir) দেওয়া হয় জলসেচের সুবিধের জন্য। এর ফলে প্রায় ৩·৫ লক্ষ হেকটর জমিতে চাষের জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই ছোট বাঁধটি পুরনো অকেজো হয়ে গেছে। তাই প্রায় ১০ কিলোমিটার উজানে সম্প্রতি আর একটি নতুন বাঁধ তৈরি হয়েছে। শোন নদীর উল্লেখযোগ্য উপনদী হলো মহানদী (অববাহিকার আয়তন, ৪,৮৪৩ বর্গ কিলোমিটার); বানাস (৩,৫০৭ বর্গ কিলোমিটার), গোপাত (৫,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার), রিহন্দ (১৭,১১০ বর্গ কিলোমিটার), কংকর (৫,৯০৩ বর্গ কিলোমিটার) ও উত্তর কোয়েল (১০,৩৬০ বর্গ কিলোমিটার)। শোন নদীর নিচে গঙ্গার ডানদিকে অনেকগুলি উপনদী রয়েছে। এদের মধ্যে পুনপুন ও কিউল উল্লেখযোগ্য।

ছোট নাগপুরের মালভূমিতে জন্ম নিয়ে পুণপুণ নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে পাটনার ২৫ কিলোমিটার পূর্বে। এর উপনদীদের মধ্যে রয়েছে বুটেন, মাদার ও মোরহার। পুণপুণের দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটার এবং অববাহিকার আয়তন ৮,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। পুণপুণ ছাপিয়ে প্রায়ই বন্যা হয় পাটনা শহরে।

দামোদর নদের জন্ম বিহারের পালামৌ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিলোমিটার এবং অববাহিকার আয়তন ২৫,৮২০ বর্গ কিলোমিটার। প্রথমে বিহার, পরে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফলতার কাছে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে। উল্লেখযোগ্য উপনদী বরাকর। যেহেতু দামোদর নদ শিল্পপ্রধান ও খনি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ও দামোদরে বন্যার জল (যেমন, ১৯৪৩) প্রায়ই ফুলে ফেঁপে ওঠে, তাই সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের অর্থে চারটি বাঁধ ও একটি ব্যারেজ (দুর্গাপুরে) নির্মিত হয়েছে দামোদরের বুকে। এসব বাঁধ নির্মিত হবার ফলে প্রায় ৪ লক্ষ হেকটর জমিতে চাষের সুবিধে হয়েছে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, দামোদর নদের গতিপথ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৫৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দামোদরের গতিপথে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার মূল কারণ দামোদরের নদীখাতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ ও বন্যা। তবে ১৮৫০ সালের পর নদীপথে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার জন্য দায়ী মানুষ। ১৫৫০ সালে প্রকাশিত দ্য বারোসের মানচিত্রে দেখা

গেছে, দামোদর নদের মূল প্রবাহ কানা দামোদরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। অথচ পরে ১৬৪০ সালে দামোদরের অধিকাংশ জলই প্রবাহিত হচ্ছে গাঙ্গুর ও বেহুলা নদীর খাত দিয়ে। পরে কালনার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু দামোদরের এই প্রবাহ-পথ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৬৬০ সালে বন্যায় দামোদরের জল আমতার খাত দিয়ে বইতে শুরু করেছে এবং হুগলির সঙ্গে মিলিত হয়েছে ফলতার কাছে। তখন এই খাতটির নাম ছিল মণ্ডলঘাট নদী। আকার ও আয়তন ছিল একটি খালের মতো।

১৬৯০ সালে প্রকাশিত নৌ চলাচলের একটি চার্ট থেকে জানা যায়, ১৫৫০ সালে কানা দামোদর ছিল একটি প্রশস্ত খাল, কিন্তু তার পর থেকে ক্রমশ এটি আকারে ছোট হতে শুরু করে। ফলে ১৭২০ ও ১৭৩০ সালের চার্টে একে একটি সরু নালা হিসেবেই দেখানো হয়েছে। ১৮২৩ ও ১৮৪০ সালের বিরাট বন্যায় দামোদর নদের আমতা খাত দিয়ে সেকেণ্ডে ১২,৬০০ ঘন মিটার জল প্রবাহিত হতো।

১৮৫১ সালে দামোদরের বুকে মুচিহানাতে একটি অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করা হয়, যাতে দামোদরের বন্যার জল হুগলি নদী মারফৎ রূপনারায়ণ নদে পাঠানো যায়। উদ্দেশ্য, কলকাতা বন্দরকে পলিমুক্ত রাখা। ১৮৬৫ সালে জামালপুরের ৬ কিলোমিটার নিচে বেগুয়া খাল তৈরি হলে দামোদরের বন্যা মোকাবিলা করা সহজ হয়ে ওঠে। বেগুয়া খাল, যার আরেক নাম কাকি নদী—সেই নদী মারফৎ দামোদরের বন্যার জল মুণ্ডেশ্বরী নদী হয়ে রূপনারায়ণে পড়ত।

পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে গঙ্গার একটি প্রবল ধারা 'পদ্মা' নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আর গঙ্গার মূল ধারাটি মুরশিদাবাদের ভেতর দিয়ে বর্ধমান, হুগলী আর নদীয়ার সীমানা নির্দেশ করে চব্বিশ পরগণায় প্রবেশ করে কলকাতার ফোর্ট আর কালীঘাটের মন্দিরের পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বৈষ্ণবঘাটা (গড়িয়া), আটিসারা (বারুইপুর), দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, খাড়ি ইত্যাদি গ্রামগুলি পেরিয়ে সাগর দ্বীপের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই ধারার নাম 'আদিগঙ্গা'। অনেকে বলেন, কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গার পবিত্র বারিধারাকে এনেছিলেন সাগর দ্বীপে। ভগীরথের স্মৃতি বহন করছে বলে এর আরেক নাম ভাগীরথী।

ভাগীরথীর তীরে পরতুগিজরা হুগলী বন্দর গড়ে তোলে। নদীয়া

জেলার যেখানে জলঙ্গী নদী এসে ভাগীরথীতে মিশেছে, সেখানে থেকে ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশ এখন হুগলি নদী নামে পরিচিত।

নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে একটি খাল কেটে সরস্বতী নদীর পুরাতন মজা খাতে হুগলি (ভাগীরথী) নদীর জলধারা বইয়ে দেন নবাব আলীবর্দী। পরবর্তী সময়ে এই জলধারা প্রবল হয়ে ওঠে দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদীর জল পেয়ে। মেদিনীপুর আর হাওড়া জেলাকে, চব্বিশ পরগণাকে আলাদা করে বয়ে গেছে হুগলী নদী। ১৭৮৫ সালে করনেল টলি আদিগঙ্গার খাতের খানিকটা খনন করে পূর্বে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। সেই কাটা খালের নাম টালির নালা আর খালের পশ্চিম দিকের পল্লীটির নাম টালিগঞ্জ।

সরস্বতী নদীর খাতে ভাগীরথীর জলধারা প্রবাহের জন্য আর টালার নালা কাটায় আদিগঙ্গা তাড়াতাড়ি মজে যায়। তবে একটা খালের আকারে তা' বর্তমান ছিল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, এই খালের স্রোতে তিনি ডিঙি ভাসিয়ে ভবানীপুর থেকে নিজের পৈতৃক গ্রামে আসতেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' (১৮৭১) গঙ্গার গতিপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় গঙ্গার মূল বা আদি স্রোত কলকাতা, কালীঘাট হয়ে গড়িয়া, বৈষ্ণবঘাটা, বোড়াল হয়ে রাজপুর, কোদালিয়া, মালঞ্চ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। শোনা যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষের গৌড়ের নবাব হুশেন শাহের মন্ত্রী পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) আদিগঙ্গার উজান পথেই গৌড়ে যেতেন। শ্রীচৈতন্যদেব, ১৫১০ সালে জাহ্নবীর কূলে কূলে শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে বৈষ্ণবঘাটা হয়ে আটিসারা (বারুইপুর) এসেছিলেন তার প্রমাণ আছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে।

প্রাচীন লোকসাহিত্যে আদিগঙ্গার গতিপথের বর্ণনা আছে। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলে রয়েছে, কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাণিজ্যপোত ভাসিয়ে চাঁদ সওদাগর বারুইপুরে আসেন, তারপর দক্ষিণ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছত্রভোগে নামেন। বাঙালি বণিকদের সমুদ্র-যাত্রা গুলি যে আদিগঙ্গার মাধ্যমেই হতো, প্রাচীন লোককাব্যগুলিই তার প্রমাণ।

সপ্তদশ শতকের পর থেকেই আদিগঙ্গা মজতে শুরু করে। জাও-দি ব্যারোজ নামে এক পরতুগিজ নাবিকের আঁকা নকশায় (১৫৫০) দেখা যায়, হাওড়ার প্রাচীন 'বেতড়' বন্দরের বিপরীত দিকে আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ স্রোতোধারা দক্ষিণে বয়ে গেছে। কিন্তু রেনেল সাহেবের ১৭৭২ সালের

মানচিত্রে কলকাতা ফোর্টের পূর্ব-দক্ষিণ থেকে কালীঘাট, বাবুপুকুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর দিয়ে সুন্দরবনের নালয়াগাঙ পর্যন্ত একটা খালের রেখা আঁকা আছে।

নালুয়ার দক্ষিণে ছত্রভোগ, খাড়ি, বড়ানী হয়ে পরে কোন পথে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে আদিগঙ্গা বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তা' অনুমান করা কঠিন। তবে সাগর সঙ্গমের আগে গঙ্গা বহুধারায় বিভক্ত হয়েছে বলে লোকে 'শতমুখী গঙ্গা' বলে। মেজর স্মিথের (১৮৫১) গঙ্গাধারা নামটি দেখা যায়। 'রায়মঙ্গল' পুঁথিতেও গঙ্গাধারার উল্লেখ আছে। আদিগঙ্গার একটি ধারা ঘৃতবতী নদীতে মিশেছে। এই ঘৃতবতীর ধারাই কাকদ্বীপের ওপর দিয়ে সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে আরো দক্ষিণে ধবলাট ও মনসাদ্বীপের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

প্রাচীন পুঁথিগুলিতে আদিগঙ্গার তীরে যেসব গ্রাম নগরের উল্লেখ আছে, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আজও কুলপী রোডের (সাম্প্রতিক কালের নেতাজী সুভাষ রোড) পাশে রয়েছে। কুলপী রোডের প্রায় সমান্তরালেই যে আদিগঙ্গা প্রবাহমান ছিল সেকথা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়, বর্ষার জলে মজা গঙ্গার খাত ভরে উঠে খালের আকার ধারণ করলে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য আদিগঙ্গার খাতের সংস্কার হওয়া খুবই প্রয়োজন।

কিউল নদীর দৈর্ঘ্য ১১১ কিলোমিটার, অববাহিকার আয়তন ১৬,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার। নদীর জন্ম ছোট নাগপুরের মালভূমিতে, গঙ্গার সঙ্গে মিলন স্বাগরহাতে। কিউল নদীর উপনদীর মধ্যে রয়েছে হরহর, বারনার, আজান ও উলান।

ভাগীরথী-হুগলির (গঙ্গার পুরনো খাত) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী রয়েছে (চিত্র ৬)। এর মধ্যে দ্বারকার জন্ম বীরভূমের পাহাড়ে এবং ভাগীরথীর সঙ্গে মিলন মুরশিদাবাদ জেলায়।

অজয় নদের জন্ম সাঁওতাল পরগণায় এবং ভাগীরথীর সঙ্গে মিলন কাটোয়ায়। দৈর্ঘ্য ২৭৬ কিলোমিটার এবং অববাহিকার আয়তন ৬,০৫০ বর্গ কিলোমিটার। দামোদর নদের দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিলোমিটার এবং অববাহিকার আয়তন ২৫,৮২০ বর্গ কিলোমিটার। জন্ম পালামৌ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। উল্লেখযোগ্য উপনদীর নাম বরাকর। বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফলতার কাছে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে। যেহেতু দামোদর নদ শিল্পপ্রধান ও খনি অঞ্চল দিয়ে

প্রবাহিত ও প্রায়ই দামোদরে বন্যার জল (যেমন, ১৯৪৩) ফুলে ফেঁপে ওঠে, তাই সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি বাঁধ ও একটি ব্যারেজ (দুর্গাপুরে) নির্মিত হয়েছে দামোদর নদীর বুকে। এসব বাঁধ নির্মিত হবার ফলে প্রায় ৪ লক্ষ হেকটর জমিতে চাষের সুবিধে হয়েছে।

বিহারের তিলাবি পাহাড়ে জন্মের পর রূপনারায়ণ নদ ২৫৪ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে নূরপুরের কাছে হুগলিতে মিশেছে। রূপনারায়ণের অববাহিকার আয়তন প্রায় ৮,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। যে দু'টি নদীর মিলনে রূপনারায়ণের জন্ম তাদের নাম দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী। হলদি নদীর অববাহিকার আয়তন ১০,২১০ বর্গ মাইল। রূপনারায়ণ-হুগলি নদীর মিলনস্থলের কিছুটা নিচে হলদি নদী মিশেছে হুগলি নদীর সঙ্গে (চিত্র ৭)।

হলদি নদীর গুরুত্বপূর্ণ উপনদী কংসাবতী। লোকমুখে কাঁসাই নামে পরিচিত। ছোটনাগপুরের মালভূমিতে (ঝালদায়) জন্ম নিয়ে পুরুলিয়া জেলা ও বাঁকুড়া জেলার খাতরা ও রাণীবাঁধের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত মেদিনীপুর জেলার বিনপুর অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। আর একটি নদী তারাফেণী মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে পূর্বদিকে ভৈরববাঁকী নদীর দিকে বয়ে গেছে। ভৈরববাঁকী নদীটি বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ অঞ্চলে জন্মের পর দক্ষিণ-পূর্ব-মুখী প্রবাহিত হয়ে কংসাবতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এরপর সম্মিলিত প্রবাহের নামও কাঁসাই থেকে গেছে। নদীটির সমগ্র জলপ্রবাহ প্রায় মেদিনীপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ বলে এই জেলার পক্ষে নদীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীর ধারেই জেলা শহর মেদিনীপুর দাঁড়িয়ে। কেশপুরে এসে নদীটি দু'ভাগ হলে উত্তরের শাখাটি দাশপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে পালারপাই নামে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণ নদের দিকে এগিয়ে গেছে। নিচের শাখাটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শেষোক্ত নদী দু'টির যুক্ত প্রবাহ হলদি নামে জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ বরাবর প্রবাহিত হয়ে হুগলি নদীতে পতিত হয়েছে। এই নদীর অববাহিকায় যে বিস্তৃত অরণ্য ছিল, তা কেটে ফেলায় মৃত্তিকাক্ষয় বেড়েছে। ফলে নদীগর্ভ ভাঁত হয়ে নদীটির নাব্যতা যথেষ্ট কমে গেছে। ১৯৭৮ খৃষ্ট (সেপটেম্বর) এই নদীর বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্রাহ্মণী নং
নবদ্বীপ
খাড়ি নং
বণ্ডিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
বাঁকা
দামোদর নং
দারকেশ্বর নং
বিষ্ণুপুর
বেহুলা নং
বেগোর
হানা
হুগলী
শিলাই নং
চাপাডাঙ্গা
হুগলী নং
সরস্বতী নং
ঘাটাল
কলিকাতা
ইচ্ছামতী নং
টাকি
কাঁসাই নং
মেদিনীপুর
বিদ্যাধরী নং
ক্যানিং
মাতলা নং
ডায়মণ্ড
হারবার
কাঁসাই নং
হলদী নং

উত্তর দিক
পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী
0 ২৫ ৫০ ৭৫ কি.মি.
[কপিল ভট্টাচার্যের (১৯৫৫) মানচিত্র অনুসারে]
পাণ্ডুয়া
রাজমহল
মালদহ
গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ
ফরাক্কা
প্রস্তাবিত ব্যারেজ
জঙ্গীপুর
গঙ্গা বা পদ্মা নঃ
রাজসাহী
উইলকক্সের প্রস্তাবিত
নদীয়া ব্যারেজ
মুর্শিদাবাদ
ময়ূরাক্ষী নঃ
সিউড়ি
বক্রেশ্বর নঃ
আসানসোল
কেন্দুলি
অজয় নঃ
পদ্মা নঃ
মাথাভাঙ্গা নঃ
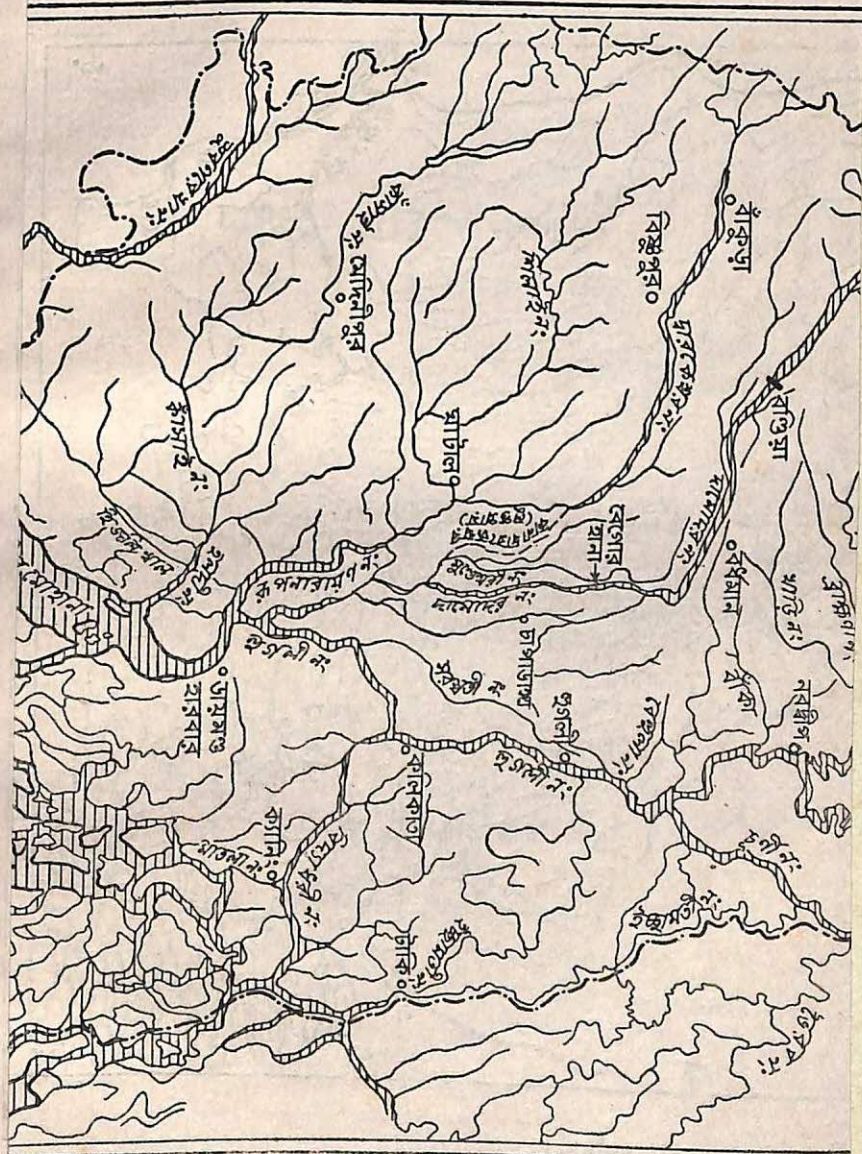
ময়ূরাক্ষী নদীর জন্ম বিহারের সাঁওতাল পরগণার মালভূমিতে। দক্ষিণ-পূর্ব-মুখে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। ২৪১ কিলোমিটার দূরত্ব পরিক্রমার পর দত্তবাটির কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। বর্ষার সময় এই নদীতে জলপ্রবাহের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫৭,০০০ কিউমেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন মিটার) আর খরার মাসগুলিতে জলপ্রবাহের পরিমাণ মাত্র ১৪ কিউমেক। ময়ূরাক্ষীর উপনদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই। ময়ূরাক্ষীর অববাহিকার আয়তন প্রায় ৮৫০০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলা ও বিহারের জলসেচের প্রয়োজনে ময়ূরাক্ষীর ওপর একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে।

গঙ্গা ও তার উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলিতে কতটা পরিমাণ জলপ্রবাহ হয়, তা' সঙ্গের সারণীতে (Table) দেখানো হয়েছে।

গঙ্গা নদীতে সবচেয়ে বেশি জল দিচ্ছে ঘর্ঘরা নদী। শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ। জলপ্রবাহের দিক থেকে এর পরে নাম করতে হয় যমুনা, কোশী ও গণ্ডক।

গঙ্গার উত্তরের উপনদীগুলির অববাহিকার আয়তন ৪,২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, আর দক্ষিণের উপনদীগুলির আয়তন ৫,৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ভাগীরথী-হুগলিতে যেসব উপনদী মিশেছে, তাদের অববাহিকার মোট আয়তন ৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। গঙ্গার উত্তর অববাহিকায় বৃষ্টিপাত বেশি, তাই বার্ষিক জলপ্রাহের পরিমাণ ০·৭৫ মিটার। কিন্তু দক্ষিণ অববাহিকায় এর পরিমাণ ০·৩ মিটার। বলতে গেলে গঙ্গায় জলপ্রবাহের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আসে গঙ্গার উত্তর অববাহিকা অঞ্চল থেকে।

সারণী

ক্রমিক সংখ্যা	উপ-অববাহিকার নাম	গড় বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ (লক্ষ ঘন মিটার)
১.	এলাহাবাদে যমুনা	৯,৩০,২০০
২.	(ক) চম্বল	৩,০০,৫০০
	এলাহাবাদে গঙ্গা	৫,৮৯,৮০০
	(ক) রামগঙ্গা (দেওহাসহ)	১,৫২,৫৮০
৩.	এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার মিলনের পর	১৫,২০,০০০

ক্রমিক সংখ্যা	উপ-অববাহিকার নাম	গড় বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ (লক্ষ ঘন মিটার)
৪.	পাটনায় গঙ্গা	৩৬,৪০,০০০
	(ক) টনস	৫৯,১০০
	(খ) শোন ও টনস এবং শোনের ভেতরকার অববাহিকা	৩,১৮,০০০
	(গ) গোমতী	৭৩,৯০০
	(ঘ) ঘর্ঘরা	৯,৪৪,০০০
	(ঙ) গণ্ডক	৫,২২,০০০
৫.	ফারাক্কায় গঙ্গা	৪৫,৯০,৪০০
	(ক) বুড়ি গন্ডক	৭১,০০০
	(খ) কোশী	৬,১৫,৬০০
৬.	গঙ্গা ও হলদি নদীর সঙ্গমের পর	৪৯,৩৪,০০০
	(ক) দ্বারকা	৪৬,৮৭০
	(খ) অজয়	৩২,০৭০
	(গ) দামোদর	১,২২,১০০
	(ঘ) রূপনারায়ণ	৪৪,০০০
	(ঙ) হলদি	৫৩,০০০

ব্রহ্মপুত্র নদ

সাংপো বা ব্রহ্মপুত্রের জন্ম হিমালয়ের কৈলাস পাহাড়ে, ৫,১৫০ মিটার উচ্চতায়। মানস সরোবর হ্রদ ও ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলের মধ্যে রয়েছে মারিয়াম লা গিরিদ্বার। ব্রহ্মপুত্র নদের মোট দৈর্ঘ্য ২৯০০ কিলোমিটার। হিমালয়ের প্রধান পর্বতশ্রেণীর সমান্তরাল খাতে ১৭০০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নদ। তারপর অরুণাচল প্রদেশ ও আসামের মধ্য দিয়ে ৭২০ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে ধুবড়ি শহরের নিচে প্রবেশ করে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে ২৭৯ কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এই দু'টি মিলিত ধারার নাম পদ্মা। আরো ১০৫ কিলোমিটার পরে মেঘনা নদী মিলিত হয়েছে পদ্মার সঙ্গে। এই মিলিত ধারা মেঘনা নাম নিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার মোট আয়তন ৫,৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের অংশে পড়েছে

১,৮৭,১১০ বর্গ কিলোমিটার।

তিব্বতে কয়েকটি উপনদী মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। যেমন গাংছু। এর পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যানসি, কিইছুর মতো ব্যবসায় কেন্দ্র ও তিব্বতের রাজধানী লাসা। পাহাড়ী নদীখাত ঝরণার মতো পেরিয়ে সাদিয়ার কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে ব্রহ্মপুত্র। অরুণাচল প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম ডিহাং। পরে দু'টি উপনদী—ডিবাং ও লুহিত-এর সঙ্গে মিশবার পর নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। তিব্বতের মালভূমিতে ৩৬০০ মিটার উচ্চতায় প্রবাহিত হয়ে সদিয়ার কাছে ব্রহ্মপুত্র নেমে এসেছে ১৫০ মিটারে। সুতরাং বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, এই পাহাড়ী নদীকে কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। ব্রহ্মপুত্রের জলে পলির পরিমাণ প্রচুর, নদীঢালও বেশী। আসাম উপত্যকায় ওপরের দিকে খুব আঁকাবাঁকা খাতে ব্রহ্মপুত্র বয়ে গেছে (meandering)। ডিবরুগড়ের কাছে ব্রহ্মপুত্র প্রায় ১৬ কিলোমিটার চওড়া এবং এখানে নদীর বুকে বেশ কিছু দ্বীপ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ মাজুলি। এর আয়তন ১২৫০ বর্গ কিলোমিটার।

উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বেশ কয়েকটি উপনদী ব্রহ্মপুত্রে মিলেছে। উত্তর দিক থেকে আসা উপনদীদের মধ্যে রয়েছে সুবনসিরি, কামেং বা জিয়া ভরেলি, মানস ও সংকোশ। দক্ষিণ থেকে এসেছে বুড়ি ডিহিং, ধানসিঁড়ি, কোপিলি এবং কালাং।

আরো কিছু উপনদী আছে যাদের জন্ম ভূটান ও সিকিমের পাহাড়ে। এই উপনদীগুলি পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, কল্যাণী ও রাইদক।

কয়েকটি উপনদী, যাদের উৎপত্তি ব্যারাইল পাহাড়ের দক্ষিণে, তারা বাংলাদেশে মেঘনায় মিশেছে। এদের অববাহিকার মোট আয়তন ৭০,৮৯৫ বর্গ কিলোমিটার। এসব উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাক ও গুমতি নদী। এসব নদীতে জল বেড়ে গেলে প্রায়ই ভারতে ও বাংলাদেশে বন্যা হয়।

প্রধান উপনদীগুলির বর্ণনা

সুবনসিরি নদীর জন্ম তিব্বতের বহিঃ হিমালয় অঞ্চলে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় ৫০০০ মিটার। নদীর দৈর্ঘ্য ৪৪২ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন প্রায় ৩২,৬৪০ বর্গ কিলোমিটার। ওপরের দিকে

সুবনসিরির জলপ্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বে। এই অঞ্চলে নদীর নাম সারি চু এবং উত্তর-দক্ষিণ থেকে বহু ছোট উপনদী হিমবাহের জলে পরিপুষ্ট হয়ে মিশেছে সুবনসিরির সঙ্গে।

বহির্হিমালয় (Outer Himalaya) অঞ্চলের মিরি পাহাড় পেরিয়ে আসামের দুলংমুখের কাছে আসামের প্রায় সমতলে নেমে এসেছে সুবনসিরি নদী। এখানে ভূমির উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার। তাছাড়া এখানে সুবনসিরির আরেক নাম লোহিত।

সমতলে নেমে এসে আরো প্রায় ৭২ কিলোমিটার উত্তর-দক্ষিণ খাতে বয়ে যায় সুবনসিরি, তারপর দক্ষিণ পশ্চিমে বেঁকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মেশে। সুবনসিরির দু'টি প্রধান উপনদী—রঙ্গা ও ডিকরং।

রঙ্গা উপনদী পাহাড় থেকে সমতলে নেমেছে রয়হিংয়ের কাছে। তারপর ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে, ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ৪০ কিলোমিটার প্রায় দক্ষিণ-মুখে বয়ে গিয়ে বদতির উত্তরপূর্বে সুবনসিরিতে মিশেছে। রঙ্গার উপনদীর মধ্যে রয়েছে সিংগ্রা, প্রভা, বোকা ও গরেলা।

আরেক উপনদী ডিকরং দুইমুখের কাছে সমতলে নেমেছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রথমে উত্তর-পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণমুখী প্রায় ৪৬ কিলোমিটার বেয়ে গিয়ে বদতির পশ্চিমে সুবনসিরিতে মিশেছে। গরেলা নদীর একটি শাখা নিজ লালুকের ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ডিকরংয়ের সঙ্গে মিশেছে।

সুবনসিরি, রঙ্গা ও ডিকরং নদী তিনটির সমতলভূমিতে দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭৩ কিলোমিটার, ৮০ কিলোমিটার ও ৪৮ কিলোমিটার।

জিয়া ভরেলি নদীর জন্ম তিব্বত ও অরুণাচলের সীমান্ত অঞ্চলের পাহাড়ে। মোট দৈর্ঘ্য ২৬৪ কিলোমিটার। পাহাড়ে এই নদীটির নাম কামেং। ভালুকপংয়ে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আচমকা দক্ষিণ দিকে বাঁক নেয় জিয়া ভরেলি নদী। তারপর দরং জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে তেজপুর শহরের ১১ কিলোমিটার পূর্বে মেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। জিয়া ভরেলি নদীর বা'দিকের উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিজু, নামিরি, উপর, খাঁড়, বড় দিকরাই ইত্যাদি। আর ডানদিকের উপনদীগুলির, উপর, সোনাই, দারিকাটি, মানসিরি ও পাহাড় থেকে নেমে আসা অজস্র ছোট ছোট উপনদী।

জিয়া ভরেলি নদীর অববাহিকার আয়তন ১১,৮৪০ বর্গ কিলোমিটার। এই অববাহিকায় আরো কয়েকটি নদীর অববাহিকাও মিশে আছে। এদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘিলাধারি, দিকরাই, মানসিরি, টেংগা, দিগেন ইত্যাদি নদী।

ব্রহ্মপুত্রের সবচেয়ে বড় উপনদী মানসের জন্ম তিব্বতের হিমালয় পর্বত শ্রেণীতে। তিব্বত, ভুটান ও অরুণাচল অঞ্চলের জলধারার অধিকাংশই মানস নদী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মেশে। পাহাড় থেকে আসামের সমতলে নেমেছে মোথারগুঁড়িতে। মানস নদীর অববাহিকার আয়তন প্রায় ৩৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে তিব্বতে পড়েছে ১৪,৮৫০ বর্গ কিলোমিটার, ভুটান ও অরুণাচলে ১৭,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার এবং আসামে ৪৫৫০ বর্গ কিলোমিটার। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে মানস নদীর অববাহিকার আয়তন ব্রহ্মপুত্রের মোট অববাহিকার আয়তনের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। ১৮৯৭ এর বিধ্বংসী ভূমিকম্পের আগে মানস নদীর অববাহিকা পূর্বদিকে রঙ্গিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাগলাদিয়া পাহুমারার মতো নদী তখন মানস-অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে পূর্ব থেকে পশ্চিম-দিকে যে সব উপনদী মানসের সঙ্গে মিশেছে, তার ক্রম-পর্যায় হলো : কুরু চু (লোব্রাক), মুরচাংফু চু (বুমাটাং), মাংগদে চু (টংসা) এবং আই (মাও)।

মানস-নদী ও তার উপনদীগুলি জলধারা পায় হিমালয়ের হিম-অঞ্চল থেকে। এই হিমরেখা শীতকালে নেমে আসে ৪৪০০ মিটার উচ্চতায় কিন্তু গ্রীষ্মে আবার উঠে যায় ৫৫০০ মিটার উচ্চতায়। মোথারগুঁড়িতে পাহাড় থেকে সমতলে নামবার সময় মানস নদী তিনটি বড় জলধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে—ক) বেকি খ) হাকুয়া ও গ) মানস। এছাড়াও আরো কত যে ছোট ছোট নির্ঝরিণী তৈরি হয়েছে, তাদের নাম লিখে শেষ করা যাবে না।

যে সব উপনদী মানসের তিনটি ধারার সঙ্গে সমতলে মিলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুলদেনার, গাভার কুণ্ড, গারোয়া, সুখঞ্জন, সৌরাং, ভানদেরশালি, সুখঝোরা, গারা নদী, আগরাং, মাকরা দরংগা, দুলানী, কাকুলং, কুকুলং ও দাইসাং। আরো পশ্চিমে আই নদী পাহাড় থেকে সমতলে নেমেছে গাইলেগফুগের কাছে। দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে অভয়াপুরির কাছে মানসের সঙ্গে মিশেছে। পূর্বদিক থেকে যে সব নদী আই নদীর সঙ্গে মিশেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টেকলাই, লংখার, সুখনটেকলাই ও কানামাকরা।

পাগলাদিয়া নদীর জন্ম ভুটানের হিমালয় পাহাড়ে দু'টি আলাদা জল-ধারা হিসেবে। এই দু'টি জলধারা—দুই রি জা ও দুই রি চৌকির উত্তরে

মিলিত হয়ে জন্ম দিয়েছে পাগলাদিয়া নদীর। ভূটান হিমালয়ে এর অববাহিকার আয়তন ছোট, মাঝে মাঝে বন্যার আকারে এই নদীখাত বেয়ে অনেকটা জল নেমে আসে আসামের সমতলে। সমতলে নেমে আসবার পর পূর্বদিক থেকে বেশ কয়েকটি উপনদী মিশেছে এর সঙ্গে। আসামের কামরূপ জেলায় অনেকটা জুড়ে এর অববাহিকা। কামরূপ জেলায় জনসংখ্যার চাপ বেশি, তাই পাগলাদিয়ায় বন্যা হলে বহু মানুষকে খুবই দুর্দশায় পড়তে হয়। এ জন্যই পাগলাদিয়া নদীর গুরুত্ব, যদিও পাগলাদিয়া নদীর অববাহিকার আয়তন খুবই ছোট।

সংকোশ নদীর জন্ম ভূটানের হিমালয়ে। পাহাড়ে এর নাম মো। দেওরালি গাওয়ের দক্ষিণে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছে সংকোশ এবং মোটামুটিভাবে গোয়ালপাড়া ও কুচবিহার জেলার সীমানা ধরে বয়ে চলেছে। ভূটানের পশ্চিমদিক থেকে নেমে আসা ওয়াং উপনদী কুচবিহার ও গোয়ালপাড়ার সীমানায় মিলিত হয়েছে সংকোশ নদীর সঙ্গে। এই মিলিত ধারা গঙ্গাধর নামে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ধুবড়ির দক্ষিণে। সংকোশ নদীর অববাহিকার আয়তন মোটামুটি বড়।

বুড়ি ডিহাং নদীর জন্ম অরুণাচলের হিমালয়ে। নদীর দৈর্ঘ্য ৩৬২ কিলোমিটার, অববাহিকার আয়তন ৮৪৭০ বর্গ কিলোমিটার। উল্লেখযোগ্য উপনদী চারটি। নামফুঁক, নামচিক, মগনটন ও তিরাপ। ডিব্রুগড়ের ৩২ কিলোমিটার নিচে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশছে বুড়ি ডিহাং। এই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় শিল্পনগরী নাহারকাটিয়া।

দিসাং নদীর জন্ম অরুণাচলের (তিরাপ) হিমালয়ে। দিসাংমুখ শহরের কাছে দিসাং নদী মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের কাছে।

দিখু নদীর জন্ম নাগা পাহাড়ে। নাজিরা ও শিবসাগর পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে দিখোমুখের কাছে।

ধানসিঁড়ি নদীরও জন্ম নাগা পাহাড়ে; দৈর্ঘ্য ৩৫৪ কিলোমিটার, অববাহিকার আয়তন ১২,২৫০ বর্গ কিলোমিটার। প্রধান উপনদীদের মধ্যে রয়েছে দিয়ুং, দিফু, নামবার ও কল্যাণ। ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে ধানসিঁড়ি মুখের কাছে। এই মিলনস্থলের উলটো দিকেই ব্রহ্মপুত্রের বুকে মাজুলি দ্বীপ।

কোপিলি নদীর জন্ম মিকির উত্তর কাছাড়ের মিকির পাহাড়ে। দৈর্ঘ্য ২৫৬ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ১৫,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। এর তিনটি উপনদী। যমুনা, বরপানি ও উমিয়াম। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে

রায়া মায়াং-এ। নিচের দিকে এই নদীটি কলং নামেও পরিচিত।

খিং নদীর জন্ম মেঘালয়ে। চামারিয়া শাস্ত্র পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। গারো পাহাড়েও অনেক উপনদীর জন্ম। এই সব উপনদী গোয়ালপাড়া জেলায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে।

এছাড়া আরো বেশ কয়েকটি উপনদী রয়েছে, যা বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর জন্ম সিকিমের হিমালয়ে, পয়োহুনরি হিমবাহে, ৭,২০০ মিটার উচ্চতায়। তিস্তা কথাটি এসেছে ত্রি-স্রোতা (অর্থাৎ যার তিনটি স্রোত)—এই সংস্কৃত শব্দ থেকে। তিস্তা খুব শক্তিশালী পাহাড়ী নদী। তাই নদীর দুপাশের দেওয়াল খুবই খাড়া। কোথাও কোথাও পাহাড় থেকে ২/৩ কিলোমিটার নিচে নদী দেখতে পাওয়া যায়। তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য ৩০৯ কিলোমিটার, অববাহিকার আয়তন ১২,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার। পাহাড় থেকে তিস্তা সমতলে নেমে এসেছে দারজিলিং জেলার সেবকে। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় সোজা বয়ে গিয়ে বাংলাদেশের রংপুরে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। অসংখ্য ছোট ছোট উপনদী মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য উপনদীর নাম রঙ্গিত। অন্যান্য উপনদীর মধ্যে রয়েছে রাজনি, লিশ, গিশ ও ঘেল।

তিস্তার আর একটি উপনদী করলা। সিকিমের দক্ষিণে নিম্ন-পার্বত্য অঞ্চলের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে (রাজগঞ্জ থানা) জন্ম। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি শহরের কাছে তিস্তায় (ডানদিকে) পড়েছে। প্রায় ১৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জল করলার মধ্য দিয়ে তিস্তায় পড়ে। করলা নাব্য নদী। শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্র জলপাইগুড়ি শহর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে করলার দু'পাশে অবস্থিত।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী করতোয়া। ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার উপনদী। উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে। করতোয়ার উপনদী—ঘোড়ামারা, সাহু, চাউকি। আগে তিস্তার স্রোত আত্রাই, পুনর্ভবা আর করতোয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। তিস্তার গতির পরিবর্তন হলে করতোয়া-অংশ উত্তর-পশ্চিম জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আত্রাই নদীতে পড়েছে। কিছু দক্ষিণে, কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা ও পাবনা জেলার সীমান্তে যমুনায় মিশেছে। শোনা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী এই নদীর তীরেই ছিল।

জলঢাকা নদীর উৎপত্তি সিকিমের হিমালয়ে। দৈর্ঘ্য ১৮৬ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৩,৯৬০ বর্গ কিলোমিটার। দু'টি উপনদী—মুর্কে ও দিহানা। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে প্রচণ্ড ফুলে ফেঁপে ওঠে জলঢাকা। জলঢাকা নদীতে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের আলিপুরের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তোরসা নদীর জন্ম তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায়। নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫৮ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৪,৮৮৩ বর্গ কিলোমিটার। তিব্বতে তোরসার নাম মাচু। ১১৩ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ পেরিয়ে ভূটানে প্রবেশ করলে এর নাম হয় আমোচু। আরো ১৪৫ কিলোমিটার পেরিয়ে নেমে পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে। দৈর্ঘ্যপথ হিসেব করলে বলতে হয়, এই নদীটির প্রায় ৫০ ভাগই পড়েছে তিব্বত ও ভূটানে। দু'টি প্রধান উপনদী। হলং ও কালজানি।

বরাক নদীর জন্ম মিজোরাম ও মণিপুরের পাহাড়ে। পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিমমুখী কাছাড় জেলার বদরপুর পর্যন্ত এগিয়ে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। এই ধারা দু'টির নাম সুর্মা ও কুসিয়ারা। তারপর বাংলাদেশের ভৈরব বাজারের কাছে মিলিত হয়েছে মেঘনার সঙ্গে। ভারতের সীমানার মধ্যে বরাক নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিলোমিটার। এর প্রধান উপনদী পাঁচটি। জিরি, চিরি, হোরং, কাটাখেল ও লংগাই। বরাকের পূর্ণ দৈর্ঘ্য ৯০২ কিলোমিটার ও অববাহিকার আয়তন ২৫,৯০০ বর্গ কিলোমিটার।

সুমীত নদীর জন্ম মেঘালয়ে। দু'টি উপনদী—সুর্মা ও পরে বাংলাদেশে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

কর্কটক্রান্তি ও ২০° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত সাতটি বড় নদী উপত্যকা, যেমন, সাবরমতী, মাহী, নর্মদা, তাপ্তী, সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী ও মহানদী নিয়ে গঠিত হয়েছে মধ্যাঞ্চলের নদী উপত্যকা।

সাবরমতী নদী

সাবরমতীর জন্ম রাজস্থানে আরাবল্লী পর্বতে। দৈর্ঘ্য ৪১৬ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৫৪,৬১০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ রাজস্থানে, বাকিটা গুজরাটে। এর প্রধান উপনদীর

মধ্যে রয়েছে ডানদিক থেকে শেই ও বা'দিক থেকে ওয়াকাল, হরনভ, হাতমতি মেশোয়া ও ওয়াতরাক।

উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে প্রথম ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীর ঢাল একটু চড়া। ধারোইতে নদীটি একটি গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। এখানে এখন একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। সাবরমতীর পাড়ে তৈরি হয়েছে আমেদাবাদ শহর ও মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম। সাবরমতী মিশেছে কামবে উপসাগরে।

হাতমতি নদীর অববাহিকার আয়তন ১,৫২৩ বর্গ কিলোমিটার, শেই নদী ৯৪৬ বর্গ কিলোমিটার, ওয়াকাল নদী ১,৬২৫ বর্গ কিলোমিটার এবং হরনভ নদীর অববাহিকার আয়তন ৯৭২ বর্গ কিলো মিটার।

সাবরমতীতে জলপ্রবাহ প্রায়ই কম-বেশী হয়। জলপ্রবাহের পরিমাণ ৪০০ কোটি ঘন মিটার থেকে ৫৩ কোটি ঘন মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। তবে জলপ্রবাহের গড় পরিমাণ ১২৭ কোটি ঘন মিটার। আমেদাবাদের কাছে সাবরমতীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ লক্ষ করা গেছে ১১,৫৭০ কিউমেক (ঘন মিটার প্রতি সেকেণ্ডে) আর সবচেয়ে কম ১ কিউমেক। সাম্প্রতিক কালে সাবরমতীতে বেশ কয়েকটি জলসেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

মাহী নদী

মাহী নদীর জন্ম বিন্ধ্য পর্বতে, ৫০০ মিটার উচ্চতায়। দৈর্ঘ্য ৫৩৩ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৩৪,৮৪২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে পড়েছে শতকরা ১৯ ভাগ, রাজস্থানে শতকরা ৪৭ ভাগ এবং গুজরাটে শতকরা ৩৪ ভাগ। প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে রয়েছে ডানদিক থেকে সোম (অববাহিকার আয়তন ৮,৭০৭ বর্গ কিলোমিটার) এবং বা'দিক থেকে আনস (৫,৬০৪ বর্গ কিলোমিটার) ও পানাম (২,৪৭০ বর্গ কিলোমিটার)। মাহী নদী মিশেছে কামবে উপসাগরে। মাহী নদীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমাণ ২৯,৭০৫ কিউমেক ও সবচেয়ে কম পরিমাণ ১·৫ কিউমেক। বার্ষিক গড় জলপ্রবাহের পরিমাণ ১১৮০ কোটি ঘন মিটার।

মাহী নদীর জল সেচের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অতীতে রাজস্থানের উদয়পুর জেলার গোমতী নদীর (সোম নদীর উপনদী) বুকে ধেবর হ্রদ জলসেচের জন্যই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালেও বেশ কিছু জলসেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

নর্মদা নদী

বিন্ধ্য পর্বতের নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পুণ্যভূমি পবিত্রতীর্থ অমরকণ্টক। অতি দুর্গম এই তীর্থক্ষেত্র। এখানে মহাকাল পাহাড়ের এক কুণ্ড থেকে নর্মদার উৎপত্তি। অমরকণ্টকের উচ্চতা ১০৫৭ মিটার।

নর্মদার জন্ম সম্পর্কে এক পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে। বিন্ধ্য পর্বত অঞ্চলে তখন প্রচণ্ড খরা চলছে। বৃষ্টি নেই, সৃষ্টি বুঝি লোপ পায়। একমাত্র দেবাদিদেব শংকরের পক্ষেই এই মহাসংকট থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। দেবতাদের সমবেত প্রার্থনায় শংকরের নর্ম বা ঘাম থেকে জন্ম হলো এক কন্যার। নাম নর্মদা। শংকর ওকে বর দিয়ে বললেন, তুমি হবে এক পবিত্র নদী, এই পবর্তময় প্রদেশ ভেদ করে তুমি প্রবাহিত হবে। যে দেশের মধ্যে দিয়ে তুমি বয়ে যাবে, সেই দেশকে করবে তুমি পবিত্র।

নর্দদা পুরাণে বর্ণিত ভারতের পবিত্র সপ্তসিন্ধুর এক প্রসিদ্ধ নদী। গঙ্গা যেমন স্বর্গের, নর্মদা তেমন নিতান্তই মর্তের।

দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ববাহিনী, ব্যতিক্রম শুধু নর্মদা ও তাপ্তী। এদের প্রবাহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে। নর্মদা নদীর দৈর্ঘ্য ১৩১০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১০৭৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য মধ্যপ্রদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। যে সব জেলা নর্মদার গতিপথে পড়েছে তারা হলো মাণ্ডলা, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, হোসংগাবাদ, পূর্ব নিমার ও পশ্চিম নিমার জেলা। এরপর ৩২ কিলোমিটার মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী ৪০ কিলোমিটার মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে। তারপর ১৬২ কিলোমিটার গুজরাট প্রদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নর্মদা নদী।

নর্মদা নদীর অববাহিকার আয়তন ৯৮,৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৮৭% ভাগ মধ্যপ্রদেশে, ১.৫% ভাগ মহারাষ্ট্রে এবং ১১.৫% গুজরাটে। জন্মের পর প্রথম ৩০০ কিলোমিটার নর্মদা নদ প্রবাহিত হয়েছে মাণ্ডলা পাহাড় কেটে। ফলে এই অঞ্চলে নদীর বুকে তৈরি

হয়েছে বহু জলপ্রপাত। তারপর নর্মদা জব্বলপুর 'মারবেল রকস' পেরিয়ে প্রবেশ করেছে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ব্রোচ জেলায় সমতলে নেমে এসে নর্মদা নদী প্রশস্ত হয়েছে। এখানে নদীর গড় প্রশস্ততা ১ থেকে ১.৫ কিলোমিটার। কিন্তু ব্রোচ শহরের পরে নর্মদা নদের চেহারা খাঁড়ির মত। খাঁড়িটি প্রায় প্রায় ২০ কিলোমিটার চওড়া। তারপর খাঁড়ির জল মিশেছে কামবে উপসাগরে।

১৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ বুরনার উপনদীর জন্ম মহাকাল পর্বতে। এর অববাহিকার আয়তন ৪১১৮ বর্গ কিলোমিটার। ১৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বনজার উপনদীর জন্ম সাতপুরা পাহাড়ে। এর অববাহিকার আয়তন ৩৬২৬ বর্গ কিলোমিটার। ১২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ শর উপনদীর জন্ম সাতপুরা পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ২৯০১ বর্গ কিলোমিটার। ১৬১ কিলোমিটার দীর্ঘ শেক্কর নদীর জন্ম সাতপুরা পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ২২৯২ বর্গ কিলোমিটার। ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ তাওয়া উপনদীর জন্ম মহাদেও পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ৬৩৩৩ বর্গ কিলোমিটার। তাওয়া নদীর একটি উপনদী আছে। নাম দিওয়া। ১৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কুন্দী নদীর জন্ম সাতপুরা পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ৫০৫১ বর্গ কিলোমিটার। পূর্ব-বর্ণিত সব ক'টি উপনদীই নর্মদা নদের সঙ্গে বাঁদিক অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে মিলিত হয়েছে।

নর্মদা নদের সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে মিলিত হয়েছে তিনটি উপনদী। হিরণ, বর্ণা ও ওরসাং। ১৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ হিরণ নদীর জন্ম জব্বলপুরের ভানের পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ৪৭৯২ বর্গ কিলোমিটার। ১০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ণা নদীর জন্ম বিন্ধ্য পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ১৭৮৭ বর্গ কিলোমিটার। ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ওরসাং উপনদীর জন্ম বিন্ধ্য পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ৪০৭৯ বর্গ কিলোমিটার।

অতীতে নর্মদা উপত্যকায় কখনো তেমন ভয়াবহ খরা দেখা দেয় নি। হয়তো তাই নর্মদা নদীর জলে সেচের কোন প্রাচীন প্রমাণ নেই। তবে সাম্প্রতিক কালে জলসেচের প্রয়োজনে তাওয়া, বর্ণা ও চন্দ্রশেখর প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের এই প্রকল্পগুলি শেষ হলে প্রায় দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হবে। নর্মদা নদীর জলবণ্টনে বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে মত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হিসেব করে দেখা গেছে নর্মদা নদী থেকে বণ্টনযোগ্য জল পাওয়া যেতে পারে ৩,৪৫,৩৮০

লক্ষ ঘন মিটার। এর মধ্যে ১,২২০ লক্ষ ঘন মিটার মহারাষ্ট্রের জন্য, ১,৬০০ লক্ষ ঘন মিটার রাজস্থানের জন্য। বাকিটা ভাগ হবে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে।

নাব্যতার দিক বিচার করলে বলা যায় নর্মদা নদী নৌ-চলাচলের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। বর্ষাকালে ব্রোচ শহরের উজানে মাত্র ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নৌ-চলাচল করতে পারে। পুণ্যার্জনের দিক থেকে গঙ্গার পরেই নর্মদার স্থান। তাই নর্মদার তীরে বহু তীর্থের অবস্থান। পুণ্য অর্জনের জন্য অনেক তীর্থযাত্রী সমুদ্রের মোহনা থেকে যাত্রা শুরু করে উৎপত্তিস্থল ঘুরে নদীর অন্য তীর দিয়ে আবার ফিরে আসে। এ ধরনের পর্যটন ভারতের আর কোন বড় নদীতে সম্ভব নয়। উৎপত্তিস্থল থেকে ৯৬০ কিলোমিটার নিচে নর্মদা নদীর একটি বড় তীর্থ ওংকারেশ্বর।

তাপ্তী নদী

'তাপ্তী' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'তাপ' শব্দ থেকে। এর জন্ম মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় মহাদেও পাহাড়ের পশ্চিমে মুলতাইয়ের মালভূমিতে ৭৬০ মিটার উচ্চতায়। নদীটি পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে বুরহানপুরের পর মধ্যপ্রদেশ পেরিয়ে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে। তারপর সমুদ্রে মেশে সুরাটের কাছে। দৈর্ঘ্য ৭২৪ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৬৫,১৪৫ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ অঞ্চল মধ্যপ্রদেশে, ৭৯ ভাগ মহারাষ্ট্র ও ৬ ভাগ গুজরাটে।

উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা'দিক থেকে পূর্ণা (১৮,৯২৯ বর্গ কিলোমিটার অববাহিকা,) ভাগুর (২,৫৯২ বর্গ কিলোমিটার), গিরনা (১০,০৫১ বর্গ কিলোমিটার), বোরি (২,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার), পাঞ্জরা (৩,২৫৭ বর্গ কিলোমিটার) এবং ডানদিক থেকে আনের (১,৭০২ বর্গ কিলোমিটার)।

তাপ্তী নদীর অববাহিকায় যদিও প্রচুর চাষবাস হয়, তবুও বলতে হয়, তাপ্তী নদী থেকে জলসেচের ব্যবস্থা খুবই কম। চাষের ক্ষেতে এখানে যা কিছু জলসেচের ব্যবস্থা, তা' সবই হয় কুঁয়ো থেকে। মহারাষ্ট্রের গিরনা নদীতে ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) দেওয়া হয় ১৯১২ সালে। গুজরাটের কাকরাপড় ও উকাইতেও বাঁধ তৈরির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। উকাইতে যে বাঁধ তৈরি হয়েছে, তার জলাধারের আয়তন ৭০৯ কোটি ঘন মিটার।

তাপ্তী নদীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপনদী পূর্ণার উল্লেখ রয়েছে পদ্ম-পুরাণে। এর জন্ম গাইলগড় পাহাড়ে, তাপ্তীর সঙ্গে এর মিলন ঘটে বুরহানপুরের কাছে। এর দৈর্ঘ্য ৩৩৮ কিলোমিটার। তাপ্তীর ডানদিকে যেসব উপনদী মিশেছে, সেসব নদীগুলি সাতপুরা পাহাড়ে জন্মের পর দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয়ে তাপ্তীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর যেসব নদী তাপ্তীর বাঁদিকে মিলিত হয়েছে, সেসব নদীর উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতে, কেবলমাত্র ভাগুর নদী ছাড়া। এই নদীটির জন্ম অজন্তা পাহাড়ে।

খান্দেশ অঞ্চলে তাপ্তী নদী ও এর উপনদী পূর্ণাতে মাঝেমধ্যে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়।

সুবর্ণরেখা নদী

সুবর্ণরেখা নদীর জন্ম বিহারের মালভূমিতে, ৭৯০ মিটার উচ্চতায়। দীর্ঘপথ বিহার ও ওড়িশার সীমানা ধরে প্রবাহিত। এর দৈর্ঘ্য ৪৭৭ কিলোমিটার ও অববাহিকার আয়তন ১৯,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা বিহারে, ১১ ভাগ ওড়িশায় ও ১৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে।

এর একটি উপনদী কানচী (৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ) পুরুলিয়ার সুইসা গ্রামের কাছে সুবর্ণরেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর অববাহিকার আয়তন ১,০৯৬ বর্গ কিলোমিটার। কারফারি নদীর জন্ম রাঁচি জেলায়। এটিও ১১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চানডিলের কাছে মিলিত হয়েছে সুবর্ণরেখার সঙ্গে। এর অববাহিকার আয়তন ১,৩১৪ বর্গ কিলোমিটার। সবচেয়ে বড় উপনদী খড়কাইয়ের উৎপত্তি ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলায়। সুবর্ণরেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে জামশেদপুরের কাছে। এর অববাহিকার আয়তন ৬,৬১১ বর্গ কিলোমিটার।

সুবর্ণরেখার অন্যান্য উপনদীর মধ্যে রয়েছে ররু, করবরি, সনজাই, গাড়া, শংখ, দুলুং ইত্যাদি।

সুবর্ণরেখা নদীখাতের প্রশস্ততা প্রায়ই কমেছে বা বেড়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারগোড়া থেকে দাঁতন পর্যন্ত সুবর্ণরেখার নদীখাত ক্রমেই চওড়া হয়ে তার পর থেকে নদীখাত ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এরপর নদীটি বারকয়েক আচমকা দিক পরিবর্তন করে বহুমুখী ধারায় সমুদ্রের

দিকে এগিয়েছে। বালেশ্বর ও দীঘার মাঝামাঝি চৌমুখ গ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

সুবর্ণরেখা নদীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমাণ ১৭,০০০ কিউমেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন মিটার), কিন্তু সর্বনিম্ন জলপ্রবাহের পরিমাণ ৩ কিউমেক। বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ ৭৯৪ কোটি ঘনমিটার। হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলায় সুবর্ণরেখা নদী কঠিন আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাময় ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই এসব অঞ্চলে ভূজল সঞ্চিত হয়েছে কঠিন আগ্নেয়শিলার ক্ষয়িত অংশে। এসব অঞ্চলে জলের জন্য বড়-ব্যাসযুক্ত কুঁয়ো খুঁড়তে হবে। মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকায় রয়েছে নরম সছিদ্র ল্যাটেরাইট পাথর।

জলসেচের জন্য সাম্প্রতিককালে যে কয়েকটি প্রকল্প নির্মিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারলো প্রকল্প (২২০০ হেকটর), রোরো প্রকল্প (১১,০০০ হেকটর), কার্নাচ প্রকল্প (১৮,০০০ হেকটর) ও কোবরো প্রকল্প (৪০০০ হেকটর)। বন্ধনীর মধ্যে সেই পরিমাণ জমির উল্লেখ করা হয়েছে, যা জলসেচের সুবিধে পাবে নির্মিত প্রকল্পগুলি থেকে।

রাঁচি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে গেতালসুদে সুবর্ণরেখা নদীর বুকে ৩৫ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এই সুবর্ণরেখা প্রকল্পে প্রায় ১৩০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

ব্রাহ্মণী নদী

ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম বিহারের রাঁচি জেলার নাগরি গ্রামের কাছে, ৬০০ মিটার উচ্চতায়। প্রথমদিকে নদীটির নাম দক্ষিণ কোয়েল। নদীটির দৈর্ঘ্য ৮০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে বিহারে পড়েছে ২৬০ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৩৯,০৩৩ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে বিহারে ৪০% ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৩% ভাগ, বাকিটা ওড়িশায়। ব্রাহ্মণী নদীর প্রধান তিনটি উপনদী। কারো, শংখ ও টিকরা। কারো নদীর জন্ম বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। এর অববাহিকার আয়তন ২,৭৪১ বর্গ কিলোমিটার। শংখ নদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশ-বিহারের সীমানা অঞ্চলে। অববাহিকার আয়তন ৬,৯৩৩ বর্গ কিলোমিটার। টিকরা নদীর জন্ম ওড়িশার ঢেংকানল জেলায়। অববাহিকার আয়তন ২,৫২৮ বর্গ কিলোমিটার।

ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ১৭ লক্ষ হেকটর। এর মধ্যে মাত্র ১৭% ভাগ জমিতে নদীজল থেকে জলসেচের বন্দোবস্ত রয়েছে। রেঙ্গালি, বালাম, টিকরা, রামিয়ালা, দেরজাং ইত্যাদি জায়গায় বাঁধ তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে।

মহানদী

৮৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মহানদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলায়। ফরশিয়া গ্রামের এক হ্রদ থেকে। অববাহিকার আয়তন ১,৪১,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫৩.১% ভাগ মধ্যপ্রদেশে, ৪৬.৫% ভাগ ওড়িশায়। বাকিটা বিহার (০.৫%) ও মহারাষ্ট্রে (০.১%)। জন্মের পর উত্তর-মুখী চলতে চলতে সিউরিনারায়ণের কাছে মিলন ঘটে শেওনাথ উপনদীর সঙ্গে। ৩৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শেওনাথ নদীর উৎপত্তি কোটগালের কাছে। এর অববাহিকার আয়তন ৩০,৭৬১ বর্গ কিলোমিটার। এর একটি উপনদী আছে। নাম খরখান। এরপর মহানদী বাঁক নেয় পূব-দিকে। এই অংশে আপরোরা, কোরবা ও সম্বলপুর অঞ্চলের পাহাড় থেকে নেমে আসা জলধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠে মহানদী। পদমপুরের কাছে মহানদী আবার দক্ষিণদিকে বাঁক নিয়ে পেরোয় সম্বলপুর ও শোনপুর। মহানদীর এই অংশেই তৈরি হয়েছে হীরাকুঁদ বাঁধ।

শোনপুর পেরোলে আসে ওড়িশা পাহাড় যার ভেতর দিয়ে গিরিখাত খনন করে বয়ে যায় মহানদী। এই সংকীর্ণ গিরিখাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ কিলোমিটার। এরপর নারাজের কাছে বদ্বীপ তৈরি করে মহানদী এবং কটক জেলার ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে মেশে বঙ্গোপসাগরে।

শেওনাথ ছাড়া মহানদীর অন্যান্য উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসদো, মান্দ্, ইব, জংক, ওঙ্গ ও তেল। ৩৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ হাসদো নদীর উৎপত্তি সরহাতের উত্তরে। অববাহিকার আয়তন ৯,৮০৩ বর্গ কিলোমিটার। ২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ মান্দ্ নদীর উৎপত্তি কালনাই অঞ্চলে। অববাহিকার আয়তন ৫,২৩১ বর্গ কিলোমিটার। ২৫১ কিলো-মিটার দীর্ঘ ইব নদীর জন্ম রায়গড় অঞ্চলে। অববাহিকার আয়তন ১২,৪৪৭ বর্গ কিলোমিটার। এসব উপনদীগুলি মহানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে মহানদীর বা' তীরে।

১৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জংক নদীর উৎপত্তি খরিয়ার পাহাড়ে।

অববাহিকার আয়তন ৩,৬৭৩ বর্গ কিলোমিটার। ওঙ্গ নদী ২০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। অববাহিকার আয়তন ৫,১৮২ বর্গ কিলোমিটার। ২৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ তেল নদীর উৎপত্তি কোরাপুটের পাহাড়ে। এর অববাহিকার আয়তন বেশ বড়। প্রায় ২২,৮১৮ বর্গকিলোমিটার। শোনপুরের কাছে মহানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

মহানদীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমাণ ৪৪,৭৪০ কিউমেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন মিটার)। বাৎসরিক জলপ্রবাহের পরিমাণ ৬,৬৬,৪০০ লক্ষ ঘন মিটার। উপত্যকার ভূ-সংস্থান ও ভূ-জল সংস্থান খুবই সন্তোষজনক। মহানদী উপত্যকার ওপরের দিকে গ্র্যানিট ও নাইস জাতীয় পাথর রয়েছে। এই পাথরের ক্ষয়িত অংশে সঞ্চিত হয়েছে পর্যাপ্ত ভূ-জল। সংলগ্ন বালিপাথরেও প্রচুর জল রয়েছে। তটরেখার পলিভূমিতে সঞ্চিত রয়েছে প্রচুর ভূ-জল। এই পলিভূমির কোথাও কোথাও ২০০ মিটার গভীরতায় আর্টেজীয় কূপের সন্ধান মিলেছে। তবে তটরেখার কাছাকাছি আরো গভীরতর আর্টেজীয় কূপের খনন প্রয়োজন, না হলে জলের মধ্যে লবণের পরিমাণ বেশি হবে।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার রুদ্রার কাছে প্রথম ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) নির্মিত হয় ১৯২৩ সালে। সঙ্গে বেশ কিছু খাল। এর ফলে ৩৫,০০০ হেকটর জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত হলো। এর পরে মহানদীর একটি উপনদী শিলারিতে তৈরি হলো মুরামদিল্লী জলাধার। হাসদো নদীতে ব্যারেজ হলো জলসেচের জন্য।

১৮৬৯-৭০ সালে তৈরি হলো মহানদীতে জোবরা ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir), উপনদী কাটজুরিতে নারাজ ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ ও বিরূপা উপনদীতে তৃতীয় ক্ষুদ্র সেচ বাঁধটি। এই সব ক্ষুদ্র সেচ বাঁধের জলাধার থেকে জলসেচের জন্য খাল খনন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি খাল যুক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণী নদীর সঙ্গে। এসব খনন করা খালের জলে প্রায় ১,০০,০০০ হেকটর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হচ্ছে। ওড়িশা সেচখালগুলির খনন এমন পরিকল্পনায় করা হয়েছে যাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিকালে মহানদীর বুকে তৈরি হয়েছে হীরাকুঁদ বাঁধ, ও আনুষঙ্গিক খাল। এর ফলে প্রায় ৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধে হয়েছে।

মহানদী উপত্যকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১৩৭ সেনটিমিটার, যদিও আশেপাশের পাহাড়ী মালভূমিতের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

এর চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলের সব জলই নদীনালা বেয়ে এসে পড়ে মহানদীর উপত্যকায়। ফলে বর্ষার সময় ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। সম্বলপুর জেলায় জংক, হাঁসদো, ইব, ওঙ্গ ও তেল নদীর সঙ্গে মিলনের পর মহানদী প্রচণ্ড চওড়া হয়ে যায়। বন্যার সময় তো নদীর প্রস্থ এক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। সম্বলপুরে মহানদীর যে জলপ্রবাহ মাপা হয়েছে তাতে জানা গেছে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড়পড়তা জলপ্রবাহের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৮,৭৯৪ ; ৩০,২৯৪ ; ৬১,৬৭৪ ঘন মিটার।

নিচের দিকে মহানদী নৌ-চলাচলের উপযোগী। পাহাড়ী অঞ্চলে ঢাল বেয়ে নৌকো প্রচণ্ড জোরে ছোটে, কিন্তু উজান বেয়ে ওপরে ওঠবার সময় মাঝিকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। বর্ষার সময় যথেষ্ট জল থাকায় নৌ-চালনায় তেমন সমস্যা হয় না, তবে শুখনো সময়ে নদীর বুকে পাথুরে ভূমি জেগে উঠলে নৌ-চালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে।

দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদীগুলির মধ্যে রয়েছে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও পেন্নার।

গোদাবরী নদী

পুরাণে বর্ণিত আর্য-ভারতের সপ্তসিন্ধুর মধ্যে গোদাবরী খুবই পবিত্র নদী। প্রাচীনকাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে গোদাবরীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আজও গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে দেখতে পাওয়া যায় তৈলঙ্গ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্য এবং পরে বিভিন্ন বিদেশীদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে এই নদীকে কেন্দ্র করে। ইউরোপীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কুঠী নির্মাণ করেছিলেন গোদাবরীর উভয় তীরে।

গোদাবরীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় (যার প্রাচীন নাম সহ্য পর্বতমালা) আরব সাগর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে। বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের পেছনে ব্রহ্মগিরিতে গোদাবরীর উৎস কৃত্রিম কুণ্ডে। পবিত্র জল স্পর্শ করার জন্য ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে ওই জলাধারে।

ভক্তজনের বিশ্বাস, গঙ্গার মতোই গোদাবরীর জল পবিত্র। এর জলে স্নান করলে মানুষের পাপমুক্তি ঘটে। তাই গোদাবরীর আর এক নাম বৃদ্ধ গঙ্গা বা দক্ষিণ গঙ্গা। গোদাবরীর তীরে রাজামহেন্দ্রীর ঘাটে প্রতি

বারো বছর পর পর পুণ্য স্নানোৎসব 'পুষ্করম' অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্রতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে গঙ্গা ও সিন্ধুর পরেই গোদাবরীর স্থান।

দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদী গোদাবরীর দৈর্ঘ্য ১৪৬৫ কিলোমিটার (চিত্র ৮)। উৎসস্থলের কাছেই গোদাবরীর ওপর একটি কৃত্রিম জলাধার আছে। অববাহিকার আয়তন ৩,১২,৮১২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের মধ্যে পড়েছে ৪৮·৬%, মধ্যপ্রদেশে ২০·৭% করনাটকে ১·৪%, ওড়িশায় ৫·৫% ও অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩·৮% ।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে সাপুরার মধ্য দিয়ে ও সাতপুরার পর দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পূর্বঘাট পর্বতমালার উপত্যকা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। সমুদ্রে মেশার সময় মোহনায় কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপগুলিতে খুব ভালো তামাক চায হয়। মোহনার কাছে দোলাইশ্বরম-এ গোদাবরীর জলকে সেচের কাজেও লাগানো হয়েছে। গোদাবরীর মোহনায় একসময় ওলন্দাজ (ডাচ), ইংরেজ ও ফরাসীদের 'ফ্যাক্টরি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র ইয়ানামে ফরাসী বসবাসের নিদর্শন আছে।

গোদাবরীর উল্লেখযোগ্য উপনদী ও শাখানদী হলো ঃ বা'দিকে পূর্ণা, কদম, প্রাণহিতা ও ইন্দ্রাবতী ; ডানদিকে মঞ্জীরা, সিন্ধুফণা, মানের এবং ফিনারশানি। গোদাবরীর সঙ্গে পূর্ণার মিলন ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের নানদেদে, কদম মিশেছে ফোরতালায়, ইন্দ্রাবতী বাস্তার জেলার ভোপালপত্নম-এর নিচে, মাণের মনথানির পূর্বে এবং ফিনারশানি বাস্তার জেলার ভদ্রচলম্-এর বিপরীতে। এছাড়া ইগাতপুরী পাহাড় থেকে উৎসারিত দর্না নদী নাসিক থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে গোদাবরীর সঙ্গে দক্ষিণে ও দিনদোরি পর্বত থেকে উৎসারিত কদ্বা নদী নাসিক থেকে ৫১ কিলোমিটার দূরে গোদাবরীর সঙ্গে বামে মিশেছে। নেবাসার কাছে দক্ষিণ তীরে প্রভারা ও মূলা নদীর মিলিত প্রবাহ এবং শিরোনচারবাদে ওয়ার্ধা ও ওয়েন গঙ্গার মিলিত স্রোত 'প্রাণহিতা' এসে মিশেছে গোদাবরীর সঙ্গে। গোদাবরী জেলার পর দক্ষিণ তীরে একটি বড় শাখা নদী শবরী মিশেছে। রাজামহেন্দ্রীর পর গোদাবরী দু'ভাগ হয়েছে—পূর্বে গৌতমী-গোদাবরী ও পশ্চিমে বশিষ্ঠ গোদাবরী।

গোদাবরীর উপনদীগুলি সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য নিচের তালিকায় দেওয়া হলো।

নদীর নাম	উৎস	সহ-উপনদী	দৈর্ঘ্য কিলোমিটার	অববাহিকার আয়তন বর্গ কিলোমিটার
১. প্রভারা	পশ্চিমঘাট পর্বতমালা	মুলা	২০০	৬,৫৩৭
২. পূর্ণা	অজন্তা পাহাড়	—	৩৭৩	১৫,৫৭৯
৩. মঞ্জীরা	বালাঘাট	টিমা, কনয়া	৭২৪	৩০,৮৪৪
৪. পেনগঙ্গা	বুলদানা পর্বতমালা	পুস, অর্ণা, আয়ন	৬৭৬	২৩,৮৯৫
৫. ওয়েনগঙ্গা	সেওনি	পেঞ্চ, বাঘ অন্ধারী	৬০৯	৬১,০৯৩
৬. ওয়ার্ধা	বেতুল জেলা	উন্না, বেম্বলা, পেনগঙ্গা	৪৮৩	২৪,০৮৭
৭. প্রাণহিতা	—	ওয়েনগঙ্গা ওয়ার্ধা	সঙ্গমের পর ১১৩	১,০৯,০৭৭
৮. ইন্দ্রবতী	কালাহান্দ	নারঙ্গী, কোতরি বার্নাদিয়া, নানদিরা	৫৩১	৪১,৬৬৫
৯. মানের		হলদি		১৩,১০৬
১০. শবরী	সিংকারাম (কোলাব) পাহাড়	সিলেরু	৪১৮	২,৪০,৪২৭

গোদাবরী অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আহমদনগর জেলাকে, চন্দা থেকে বাস্তার জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, বেরার-এর পর গোদবরী জেলার সীমানা চিহ্নিত করেছে। নাসিক শহর, পুরনো শহর পাইথান, বেরার ও রাজা-মহেন্দ্রীর মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে ; গোদাবরী জেলার মধ্যে গোদাবরী নদী ছোট নৌ-চলাচলের উপযোগী, নাব্য।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই গোদাবরীর জল চাষবাসের কাজে লাগানো হচ্ছে। ১৮৪৭ সালে স্যার আরথার কটন 'গোদাবরী বদ্বীপ প্রকল্প' চালু করেন। এর ফলে প্রায় ৫ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ হয়। গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চলে আগে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত, কিন্তু

এখন সেখানে সবুজের সমারোহ। শস্যখেত আর ফলের বাগান সারা অঞ্চল জুড়ে।

মহারাষ্ট্রে গোদাবরীর একটি উপনদীর ওপর বাঁধ নির্মিত হয়েছে ১৯১৫-১৬ সালে। এই বাঁধ ও আনুষঙ্গিক কয়েকটি খাল কেটে ৩০ হাজার হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। ১৯২৬ সালে ভানদানদুরার কাছে প্রভারা নদীতে বাঁধ ও আরো কিছুটা নিচুতে ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) নির্মিত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ২৩ হাজার হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হয়েছে। ওয়েনগঙ্গার উপনদী সুর নদীতে ১৯১০ সালে বাঁধ দিয়ে প্রায় ১৩ হাজার হেকটর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। ১৯২৩ সালে ওয়েনগঙ্গায় ক্যানাল কাটবার ফলে ৩০ হাজার হেকটর জমিতে জলসেচের জল পাওয়া গেছে। ১৯৩৩ সালে নিজাম সাগর বাঁধ তৈরির ফলে জলসেচের সুবিধে মিলেছে ৯৭ হাজার হেকটর জমিতে।

সাম্প্রতিক কালেও আরো বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো শেষ হলে আরো ১৫ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ মিলবে। অবশ্য এই শেষ নয়, গোদাবরী নদীতে জলসেচের পরিমাণ আরো বাড়াবার সুযোগ রয়েছে।

কৃষ্ণা নদী

১৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃষ্ণা নদী দক্ষিণ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী (চিত্র ৯)। উপনদীগুলি সহ সমস্ত অববাহিকার আয়তন ২,৫৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে পড়েছে ২৬·৮%, কর্নাটকে ৪৩·৮% ও অন্ধ্রে ২৯·৪%।

কৃষ্ণা নদীর জন্ম ১৩৬০ মিটার উচ্চতায় মহাবালেশ্বর শৈল শহরের সামান্য উত্তরে। উৎস স্থলটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ। জন্মের পর প্রথম দিকে কৃষ্ণা নদীর প্রবাহ ছিল দক্ষিণ দিকে। পরবর্তী অংশে মহাবালেশ্বর পর্বতের পশ্চিমদিক আগত কয়না ও সাংলি নদী কৃষ্ণার তটে মিলিত হয়েছে। কর্‌ন্দবাদ অবধি একসঙ্গে প্রবাহিত হবার পর নদীর দক্ষিণ তটে পুনরায় পাঁচগঙ্গা নদী মিলিত হয়েছে। এরপর নদীপ্রবাহ পূর্বমুখী হয়ে বেলগাঁও, বিজাপুর-এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে আগত ঘাটপ্রভা এবং মালপ্রভা নদী দু'টির সঙ্গেও কৃষ্ণার মিলন হয়েছে।

চিত্র ৯ (৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ষ্ণা নদী– অববাহিকার বিন্যাস
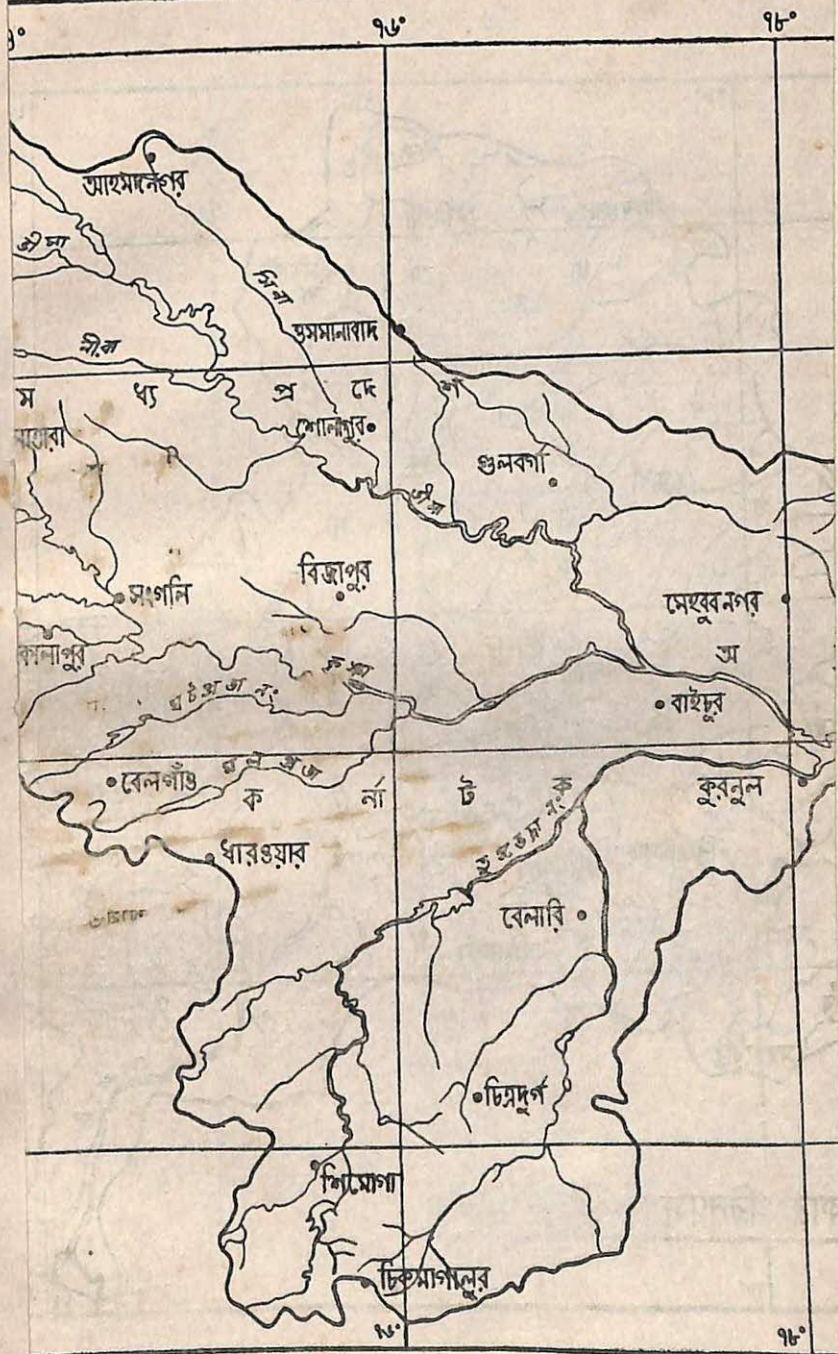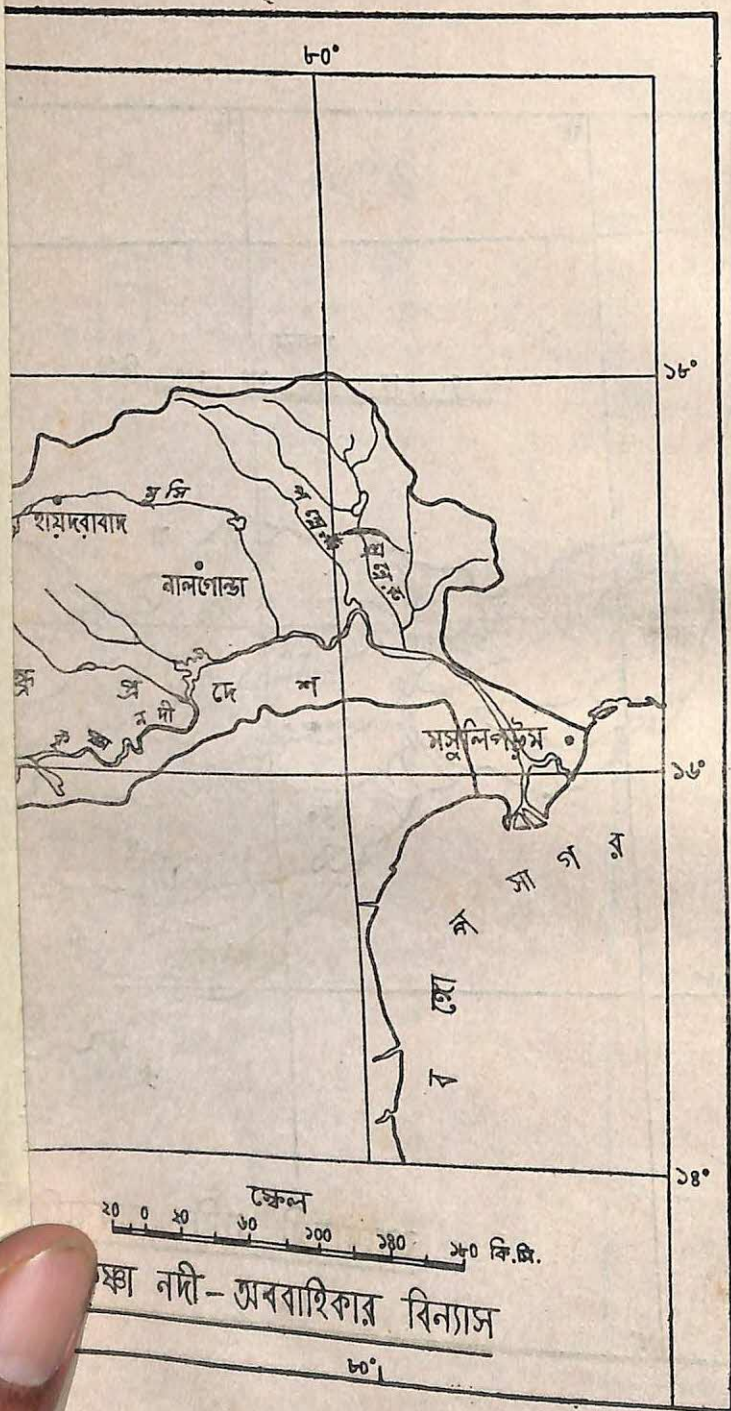
পার্বত্য অংশে নদীটি খুবই পাথুরে এবং খরস্রোতের জন্য অনাব্য। কিন্তু সাতারা জেলার কাছাকাছি আসার পর কৃষ্ণানদীর জল দক্ষিণ-পূর্বের অঞ্চলগুলির কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। বিজাপুর আর বেলগাঁও অঞ্চলে নদীটির দুই তীরে ৬—১৫ মিটার উঁচু কৃষ্ণমৃত্তিকা ও ল্যাটেরাইট আছে। তাছাড়া নদীগর্ভে বেশ কিছু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে।

রায়চুর জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নদীটি পাথুরে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে শোলাপুর আর রায়চুরের কোমল পলি গঠিত দোয়াব অঞ্চলে যাত্রা শুরু করে। এই অঞ্চলে নদীপ্রবাহটি ১২২ মিটার উঁচু থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বন্যার সময়ে জলরাশি প্রবল বেগে গ্র্যানিট ভূমির দিকে ধেয়ে আসে। ভীমা আর কৃষ্ণার সঙ্গমস্থলে গঠিত এই দোয়াব অঞ্চল আহমদনগর, শোলাপুর এবং পুনের জলধারা বহন করছে। দ্বিতীয় একটি দোয়াব সৃষ্টি হয়েছে তুঙ্গভদ্রা-কৃষ্ণার মিলনস্থলে। পরবর্তী অংশে কৃষ্ণা নদী পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়ে কুরনুল আর গুনটুর জেলার সীমান্ত রচনা করেছে। নদীটি এখানে যথেষ্ট গভীর ও পাথুরে। এখানে বহু ছোট ছোট জলপ্রপাত রয়েছে। ওয়াজিরাবাদের কাছে নদীটির সঙ্গে মিশেছে 'মুসী' উপনদী। এর তীরেই দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী ঐতিহ্যময় হায়দ্রাবাদ শহর।

পূর্বঘাট পর্বতের কাছে নদীটি আচমকা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণা আর গুনটুর জেলার ভেতর দিয়ে প্রায় ১৬১ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নদী-প্রবাহের এই শেষ অংশেই নদীর জল সবচেয়ে বেশি নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। বন্যার সময় নদীটি যে পরিমাণ পলি বহন করে আনে তা' দিয়ে বেশ বড় একটি জায়গা পলিতে ভরাট করা' যেতে পারে। নদী-মোহনার বদ্বীপের কাছে বিজয়ওয়াড়ায় নদীটি ১,১৭০ মিটার চওড়া বেলে-পাথরে তৈরি 'গ্যাপের' মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে একটি বাঁধ ও রেলপথ নির্মিত হয়েছে। বাঁধের ওপরদিকে নদীর গতি বেশ তীব্র। তবে বিজয়ওয়াড়া আর মোহনার মধ্যবর্তী অংশে তা মোটামুটিভাবে নৌ-চলাচলযোগ্য। সেচ খালগুলিও বেশ নাব্য। এভাবে কৃষ্ণা জেলা আর গোদাবরী জেলার মধ্যে নৌ-যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

নাগার্জুন সাগরের কাছে কৃষ্ণা নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি জলাধার নির্মিত হয়েছে। এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ নদী বাঁধ। এর ফলে

নদী-অববাহিকায় সেচের অভূতপূর্ব সুযোগ বেড়েছে।

কৃষ্ণা নদীর প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়না, ঘটপ্রভা, মালপ্রভা, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা, মুসী, পালেরু ও মুনেরু।

২৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঘটপ্রভা নদীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ৮,৮২৯ বর্গ কিলোমিটার। এর দু'টি উপনদী—হিরণ্যকাশী ও মার্কণ্ডেয়। কুধিসঙ্গমের কাছে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৩০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মালপ্রভা নদীরও জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ১১,৫৪৯ বর্গ কিলোমিটার। নারায়ণপুর বাঁধের ৩০ কিলোমিটার উজানে কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৮৬১ কিলোমিটার দীর্ঘ ভীমা নদীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ৭৬,৬১৪ বর্গ কিলোমিটার। এর তিনটি উপনদী মুলা, মুথা ঘোড় ও নোরা। রায়চুর শহরের ২৬ কিলোমিটার উত্তরে কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৫৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ তুঙ্গভদ্রা নদীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতের গঙ্গামুলায়। অববাহিকার আয়তন ৭১,৪১৭ বর্গ কিলোমিটার। দু'টি উপনদী—ভরোদা ও হাগারি। শ্রীশৈলম শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উজানে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তুঙ্গভদ্রা। ২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ মুসী নদীর জন্ম মেডক জেলায়। অববাহিকার আয়তন ১১,২১২ বর্গ কিলোমিটার। এর উপনদীর নাম আলেরু। নাগার্জুন সাগরের ৪০ কিলোমিটার নিচে ওয়াজিরাবাদের কাছে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মুনেরু নদীর জন্ম ওয়ারাঙ্গল জেলায়। অববাহিকার আয়তন ১০,৪০৯ বর্গ কিলোমিটার। বেজওয়াড়া ব্যারেজের উজানে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

কাবেরী নদী

কাবেরী ভারতের এক পবিত্র নদী। নানা পৌরাণিক উপাখ্যানে, কবিতা ও সঙ্গীতে কাবেরীর নাম বারবার উচ্চারিত। কবি ত্যাগরাজা কাবেরীর বন্দনা করেছেন তার কাব্যে। কুর্গদেশের মানুষ—যাদের প্রাচীন নাম 'কোদাভ'—মাতৃসমা কাবেরীকে যুগ যুগ ধরে বন্দনা করে আসছেন। ওদের বিশ্বাস, ওদের প্রার্থনায় খুশি হয়ে কাবেরী প্রতি বছর তার জন্ম-তিথিতে ব্রহ্মগিরির কাবেরী কুণ্ডে টালা-কাবেরীতে উপস্থিত হন কাবেরী সংক্রমণ উৎসবে। তাই প্রতি বছর অকটোবর মাসের মাঝামাঝি ওই পুণ্যদিনে মন্দিরের গর্ভগৃহে 'টালা-কাবেরী'র ছোট কুণ্ডে কাবেরীর

উপস্থিতি বোঝা যায়, কুণ্ডের জল ফেঁপে ওঠে। কখনো বা কুণ্ড ছাপিয়ে উপছে পড়ে ভেসে যায়।

পুরাণে বর্ণিত ভারতের সপ্তসিন্ধুর এক পবিত্র নদী কাবেরী। কাবেরীর কূলে কূলে গড়ে উঠেছে প্রসিদ্ধ নগর—ত্রিচিনোপল্লী বা তিরুচিরাপল্লী, তানজোর, সালেম, কুম্ভকোনাম, কোয়েমবাটুর প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও শিল্পোন্নত শহর। সেরেঙ্গাপট্টম, চিত্তুর, লক্ষণতীর্থ, অমরাবতী, ভবানীর মতো প্রত্নতাত্ত্বিক নগরীও রয়েছে এর পাড়ে। তাছাড়া এর পাড়ে কত যে শিবমন্দির গড়ে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করে অনেকে কাবেরীকে 'দক্ষিণা গঙ্গা' বলে ডাকেন।

দক্ষিণ ভারতের করনাটক এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রবাহিত প্রধান নদী কাবেরী। দৈর্ঘ্য ৪০০ কিলোমিটার। এই নদী দক্ষিণের এই রাজ্য দু'টির শিল্প ও কৃষির উন্নতিতে প্রধান সহায়।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরি পর্বতের (উচ্চতা ১৩-৪০ মিটার) তালা কাবেরী থেকে এই নদীর সৃষ্টি। পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে উৎপত্তি হলেও পাহাড় কেটে নদীটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। কুর্গ অঞ্চলে জুন থেকে সেপটেম্বর মাসে প্রবল বর্ষণ হয়, সেই জলের দ্বারা নদীটি পুষ্ট হয়।

উৎপত্তিস্থল থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার পথের মধ্যে উঁচু পাহাড় থেকে ৪৫০ মিটার নিচে নেমে এসে ভগমণ্ডলের কাছে নদীটির প্রবাহ বেশ পরিণত, অসংখ্য বাঁক সৃষ্টি করে মন্থর গতিতে পূর্বদিকে প্রবাহিত। মধ্য প্রবাহে করনাটকের ৭৫০ মিটার উঁচু মালভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় প্রচুর পলি ফেলে রেখে গেছে। ফলে এই অঞ্চলে ধানের ফলন প্রচুর। এই অংশে নদী থেকে অসংখ্য খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খালের পরিমাণ প্রায় ১৯০০ কিলোমিটার।

মহীশূর শহরের মাত্র ১৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কাবেরী নদীতে কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ নির্মিত হয়েছে। ৩৮ মিটার উঁচু বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১,৯৯৬ মিটার এবং জলধারণ ক্ষমতা ৩৩২·৭২ লক্ষ ঘন মিটার। শিবসমুদ্রম জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়মিত জল সরবরাহ এবং করনাটক ও তামিলনাড়ুর বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ এর লক্ষ্য।

এরপর জলপ্রবাহে ও আয়তনে আরো বিশাল হয়ে কাবেরী নদী প্রবাহিত পূর্বদিকে। শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতের কাছে নদীটি প্রায় এক কিলোমিটার চওড়া। পরবর্তী ৮০ কিলোমিটার প্রবাহে নদীটি আরো ৮০০ মিটার

নিচে নেমে এসেছে। এই দূরত্বের মধ্যে করনাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই অংশের দু'টি উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত গগনচুক্কি ও ভারচুক্কি। এ দু'টি জলপ্রপাতের তীব্র জলপ্রবাহ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সমগ্র এশিয়ার একটি অন্যতম প্রাচীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

পরবর্তী প্রবাহে নদী-বৈশিষ্ট্য কিছুটা বদলেছে। বিপুল জলপ্রবাহ সত্ত্বেও নদীটি সংকীর্ণ হয়ে কঠিন শিলাকে ক্ষয় করে প্রবাহিত হয়েছে। এই অংশে নিম্নক্ষয় বেশি হওয়ায় নদীগর্ভের কঠিন শিলাতেও ১২-১৫ মিটার গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। কোন কোন জায়গায় নদীটি এতই সরু যে ছাগলও তা' লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে।

মেতুরের কাছে পালার নদীর সঙ্গমস্থলে আরেকটি জলাধার নির্মিত হয়েছে। শুধু দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই নয়, কাবেরী নদীর এই জলাধারের জল তানজোর জেলার বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে। মেতুরের পরবর্তী অংশে নদীটি দক্ষিণমুখী পশ্চিম থেকে আসা ভবানী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

মধ্যাংশের তীব্র গতি কমে গিয়ে নদীটি এরপর ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় নদীটি অতি প্রশস্ত আয়তনে প্রবাহিত হয়ে উত্তর-দক্ষিণ দু'টি ভাগে (কোলেরুন ও কাবেরী) বিভক্ত হয়ে মাত্র ১৬ কিলোমিটার পরেই আবার তিরুচিরাপল্লীর কাছে মিলিত হয়ে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ গঠন করেছে। এখানে নির্মিত সেচ বাঁধটি প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য কারিগরী বিদ্যার নিদর্শন। কুম্ভকোনম্, ময়ূরম, নন্নীশম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি এর ফলে কৃষি সমৃদ্ধ হয়েছে। সেচের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জলপ্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। নদীটি উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে কাবেরীপত্তনমের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

কাবেরী নদীর অববাহিকার আয়তন ৮৭,৯০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে কেরালায় পড়েছে ৩·৩%, করনাটকে ৪১·২% এবং তামিলনাড়ুতে ৫৫·৫%। কাবেরীর প্রধান উপনদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য করনাটকের হারাঙ্গী, হেমবতী, শিংশা, অর্কবতী, লক্ষণতীর্থ ও সুবর্ণবতী এবং তামিলনাড়ুর ভবানী, নয়িল ও অমরাবতী এবং কেরালার কাবিনি।

৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হারাঙ্গী নদীর জন্ম কুর্গ জেলার পুষ্পগিরি পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ৫৪০ বর্গ কিলোমিটার। কাবেরীর উৎস

থেকে ৭০ কিলোমিটার নিচে কুদিগে কাবেরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ১৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমবতী নদীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতের মুদিগিল তালুকে। অববাহিকার আয়তন ৫২০০ বর্গ কিলোমিটার। এর দু'টি উপনদী। ইয়গোছি ও আলগুর। কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে কাবেরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে হেমবতী নদী। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ কাবিনি নদীর জন্ম ওয়াইনাদ তালুকে। অববাহিকার আয়তন ৬৬৯০ বর্গ কিলোমিটার। তিরুমাকুদল নার্সপুরের কাছে কাবেরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সুবর্ণবতী নদীর জন্ম নসুরাম ঘাট পর্বতে। অববাহিকার আয়তন ১,৬৮৯ বর্গ কিলোমিটার। কলিগাল তালুকের তালাকাদে কাবেরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভবানী নদীর জন্ম নির্জন উপত্যকার অরণ্যে। অববাহিকার আয়তন ৭,১৪৪ বর্গ কিলোমিটার। এর উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিরুভামি, কুনদা, কুন্নুর ও মোয়ার। কাবেরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভবানী শহরের কাছে।

কাবেরী নদীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমাণ ১২,৯১৩ কিউমেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন মিটার)। গড়পড়তা বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ ২,০৯,৫০০ লক্ষ ঘন মিটার।

প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ জলধারা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবহার এবং ১৮ লক্ষ হেকটর জমি সেচ করা হয় বলে এই নদীকে ভারতের সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত নদী বলে গণ্য করা হয়। দক্ষিণ ভারতের আর কোন নদী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এতটা প্রভাব বিস্তার করে নি।

পেন্নার নদী

পেন্নার নদীর জন্ম করনাটকের চেন্নাকেশব পাহাড়ে, যদিও নদীটি মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। ৫৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পেন্নার নদী অনন্তপুর, কাড্ডাপা ও নেল্লোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীটির অববাহিকার আয়তন ৫৫,২১৩ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ পড়েছে করনাটকে, বাদবাকিটা অন্ধ্রপ্রদেশে।

প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়ামঙ্গলী, কুনদেরু, সাগিলেরু, চিত্রবতী, পাপাগ্নি ও চেয়েরু।

পেন্নার নদী-উপত্যকায় লাল, কালো বালি-মিশ্রিত মাটি পাওয়া যায়। এই নদী-উপত্যকায় মোট ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে। এর প্রায় শতকরা ২২ ভাগ জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত রয়েছে।

পেন্নার নদী উপত্যকায় বৃষ্টিপাত বেশ অনিয়মিত। তাই নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ প্রায়ই বাড়ে ও কমে। পেন্নার নদীতে সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের পরিমাণ ৬০০ কোটি ঘন ফুট। সর্বনিম্ন জলপ্রবাহের পরিমাণ ৫৪ কোটি ঘন ফুট। গড় বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ ৩২৩ কোটি ঘনফুট।

অতীতে পেন্নার নদীর অববাহিকা অঞ্চলে জলসেচের জন্য দু'টি খাল-বাঁধ (anicut) দেওয়া হয়েছিল। একটি নেল্লোমের কাছে (১৮২৫-১৮৭৫) আর একটি সঙ্গমে (১৮৮৬)। স্বাধীনতার আগে আরো চারটি খাল-বাঁধ (anicut) তৈরি হয়েছে পেন্নার নদীতে তাদিনিমায়াপল্লীতে, কুনদেরু নদীতে রাজোমে, সাগিলেরু নদীতে টামবাল্লাপল্লীতে ও গলেরু নদীতে (কুনদেরুর উপনদী) শানতাজিথুরে। স্বাধীনতার পর যে তিনটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, তা' হলো উচ্চ পেন্নার প্রকল্প, মধ্য পেন্নার প্রকল্প ও সোমশিলা প্রকল্প।

সরস্বতী নদী

অতীতে সরস্বতী নদী বর্তমান হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। অনেকের ধারণা, এর সঙ্গে সিন্ধু নদের যোগ ছিল। বৈদিক সাহিত্যে অনেকবারই সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকদের ধারণা, পরিবেশ ও আবহাওয়াগত পরিবর্তনের ফলে এই নদীটি শুকিয়ে গেছে। সরস্বতী নদীর ইতিহাস ও গতিপথ খুঁজে বের করার পরিকল্পনা নিয়ে সম্প্রতি একটি চুক্তি হয়েছে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জাতীয় কেন্দ্রের মধ্যে।

মাঝারি ও ছোট নদনদীর বর্ণনা

মাঝারি নদনদী

যেসব নদনদীর অববাহিকার আয়তন ২,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে, তাদের মাঝারি নদীর পর্যায়ে ফেলা হয়। ভারতে এ ধরনের সংখ্যা ৪৪ এবং এদের অববাহিকার মিলিত আয়তন ২.৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। যদিও এসব নদীখাত ধরে ভারতের জলপ্রবাহের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ জল প্রবাহিত হয়, তবু ভারতের তটভাগ অঞ্চলে নৌ-চলাচলের কাজে এসব নদীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এদের মধ্যে ৯টি নদী দু'টি অথবা তিনটি প্রদেশ দিয়ে প্রবাহিত। তাই এসব নদীকে বলা হয় আন্তঃরাজ্য নদী। এসব নদীগুলি হয় পশ্চিমদিকে আরব সাগর, নয়তো পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত। তবে এদের মধ্যে মিজোরাম ও মণিপুরের চারটি নদী অবশ্য বাংলাদেশ অথবা ব্রহ্মদেশের দিকে প্রবাহিত। এই চারটি নদীর নাম কর্ণফুলী, কালাদান, ইমফল ও তিক্ষু ননীতালুক।

যে ৪৪টি নদনদী (চিত্র ১০) এই মাঝারি নদনদীর পর্যায়ে পড়ে, তাদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিচের সারণীতে (table) দেওয়া হলো।

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	অববাহিকার আয়তন (বর্গ কি. মি.)	বার্ষিক জলপ্রবাহ (কোটি ঘন ফুট)
পশ্চিমবাহিনী					
১.	শ্বেতরঞ্জী (Shetrunji)	ডালকানিয়া গ্রাম	১৮২	৫,৫১৪	২৮.০
২.	ভাদর (Bhadar)	রাজকোট জেলা	১৯৮	৭,০৯৪	৩৫.০
৩.	ধাধার (Dhadhar)	পাঁচমহল জেলা	১৩৫	২,৭৭০	৬৯.০

ক্রমিক সংখ্যা	নদ র নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য (কিলো-মিটার)	অববাহি-কার আয়তন (বর্গ কি. মি.)	বার্ষিক জলপ্রবাহ (কোটি ঘন ফুট)
৪.*	বুড়িবালাম (Burhabalang)	ময়ূরভঞ্জ জেলা	১৬৪	৪৮৩৭	২১৭.৭
৫.*	বৈতরণী (Baitarni)	কেওঞ্ঝর জেলা	৩৬৫	১২৭৮৯	৫৭৫.৫
৬.	পূর্ণা (Purna)	ধুলিয়া জেলা	১৪২	২৪৩১	১০৯.৩
৭.	অম্বিকা (Ambika)	দান্স জেলা	১৪২	২৭১৫	১২৪.৭
৮.	বৈতর্ণ (Vaitarna)	নাসিক জেলা	১২৬	২৫৭২	৪১৫.০
৯.	উল্লাস (Ulhas)	পুনে জেলা	১২২	৪৬৩৭	৩০১.৪
১০.	সাবিত্রী (Savitri)	কোলাবা জেলা	৮০	২২৫৭	১৪৬.৭
১১.	মান্ডাবি (Mandavi)	বেলগাঁও জেলা	৮৭	২০৩২	১৩২.০
১২.	কালীনদী (Kalinadi)	বেলগাঁও জেলা	১৫৩	৫১৭৯	৬৫৩.৭
১৩.	গঙ্গাবলী বা বেদতি (Gangavalli or Bedti)	ধারওয়ার জেলা	১৫২	৩৯০২	৪৯২.৫
১৪.	শারাবতী (Sharavati)	শিমোগা	১২২	২২০৯	৪৫৪.৫

* মধ্যভারতে এই দু'টি নদী পূর্ব বাহিনী।

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	অববাহিকার আয়তন (বর্গ কি. মি.)	বার্ষিক জলপ্রবাহ (কোটি ঘন ফুট)
১৫.	নেত্রবতী (Netravati)	কানাড়া	১০৩	৩৬৫৭	৪৬১.৫
১৬.	ঘালিয়ার বা বেপুর (Ghaliar or Beypore)	ইলামতালভি পাহাড়	১৬৯	২৭৮৮	৫২০.০
১৭.	ভারতপুজা (বা পোন্নানী) (Bharatpuzha or Ponnani)	আন্নামালাই পাহাড়	২৫১	৫,৩৯৭	৮৮০.০
১৮.	পেরিয়ার (Periyar)	শিবাজীনী পাহাড়	২২৮	৫,২৪৩	১২৩০.০
১৯.	পামবা (Pamba)	—	১৭৭	১,৯৬১	৬৩০.০
পূর্ববাহিনী					
২০.	রুসিকুল্যা (Rushikulya)	ফুলবানি জেলা	১৪৬	৭,৭৫৩	১৮০.০
২১.	বংশধারা (Vamsa-dhara)	ফুলবানি জেলা	২২১	১০,৮৩০	৩৫০.০
২২.	নাগবলী (Nagavali)	কালাহান্দি জেলা	২১৭	৯,৪১০	২৪০.০
২৩.	শারদা (Sarda)	বিশাখাপত্তনম জেলা	১০৪	২,৭২৫	৭০.০
২৪.	ইলেরু (Yeleru)	ঐ	১২৫	৩,৮০৯	৯০.০

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	অববাহিকার আয়তন (বর্গ কি. মি.)	বার্ষিক জলপ্রবাহ (কোটি ঘন ফুট)
২৫.	গুণ্ডলাকাম্মা (Gundla Kamma)	কুরনুল জেলা	২২০	৮,৪৯৪	১০০˙০
২৬.	মুসি (Musi)	নেল্লোর জেলা	১১২	২,২১৯	২৬˙০
২৭.	পালেরু (Paleru)	নেল্লোর জেলা	১০৪	২,৪৮৩	৩০˙০
২৮.	মুনেরু (Muneru)	ঐ	১২২	৩,৭৩৪	৪৫˙০
২৯.	কুনলেরু (Kunleru)	ভেলিকোন্দা জেলা	৭৩	৩,৫৩৪	৪২˙০
৩০.	স্বর্ণমুখী (Swarnamukhi)	পালকা	১৩০	৩,২২৫	৫০˙০
৩১.	কোরটালাইয়ার (Kortalaipar)	চিংলিপেট	১৩১	৩,৫২১	৩৫˙০
৩২.	পালার (Palar)	কোলার জেলা	৩৪৮	১৭,৮৭১	১৭৮˙০
৩৩.	জিংগি (Gingee)	উত্তর আরকট	৯৪	৩,০৪৪	৩০˙০
৩৪.	পোন্নাইয়ার (Ponnaiyar)	কোলার	৩৯৬	১৬,০১৯	১৬০˙০
৩৫.	ভেল্লার (Vellar)	চিত্রি পাহাড়	১৯৩	৮,৫৫৮	৮৫˙০
৩৬.	ভাইগাই (Vaigai)	মাদুরাই জেলা	২৫৮	৭,৭৪১	৭৭˙০
৩৭.	বর্ষালী (Varshalli)	ঐ	১২৫	৩,১০৪	৩১˙০

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	অববাহিকার আয়তন (বর্গ কি. মি.)	বার্ষিক জলপ্রবাহ (কোটি ঘন ফুট)
৩৮.	কুনদার (Cundar)	মাদুরাই জেলা	১৪৬	৪,৮৩৮	৪৮'০
৩৯.	ভাইপ্পার (Vaippar)	তিরুনেল-ভেলি জেলা	১৩০	৫,২৮৮	৫৩'০
৪০.	তাম্রপর্ণি (Tamraparni)	ঐ	১৩০	৫,৪৮২	১৩৭'০
বিদেশবাহিনী					
৪১.	কর্ণফুলী (Karnaphuli)	মিজোরাম	১৪৪	৩,৯৯৯	২৬০'০
৪২.	কালাদান (Kaledan)	ঐ	২৯০	৭,৯৩৩	৫১৬'০
৪৩.	ইমফল (Imphal)	মণিপুর	—	৭,২৫৫	৪৭১'৬
৪৪.	তিক্ষু ননী-তালুক (Tixu Nanitaluk)	নাগাল্যাণ্ড	১৪৮	৬,৪৪৯	৪২০'০

পশ্চিমবাহিনী নদী

যে ১৭টি মাঝারি আকারের নদী পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের অববাহিকার মোট আয়তন ৬৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো ঃ

শ্বেতরঞ্জী

এই নদীটির জন্ম গুজরাটের অমরেলি জেলার দালকাহোয়ার কাছে। পালিতানার বিখ্যাত জৈন মন্দিরের অবস্থান শতরঞ্জী নদীর অববাহিকায়। এই নদীর বুকে একটি বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হয়েছে। জলাধারের আয়তন ৩১ কোটি ঘন ফুট। তাছাড়া ৩৪,৮০০ হেকটর জমিতে জল-

সেচের জন্য দীর্ঘ খাল কাটার কাজ চলছে।

ভাদর

গুজরাটের রাজকোট জেলার আনিয়ালি গ্রামে ভাদর নদীর জন্ম। এটি আরব সাগরের সঙ্গে মিশেছে নবীবন্দরের কাছে। ১৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির অববাহিকার আয়তন ৭০৯৪ বর্গ কিলোমিটার। নদীতে বার্ষিক জলপ্রবাহের পরিমাণ ৩৫ কোটি ঘন ফুট।

ধাধার

ধাধার নদীর জন্ম গুজরাটের পাঁচমহল জেলার ঘানটের গ্রামের কাছে। এই নদীটির অবস্থান মাহী ও নর্মদা নদী উপত্যকা দু'টির মাঝখানে। ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির অববাহিকার আয়তন ২,৭৭০ বর্গ কিলোমিটার। ধাধার নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বরোদা শহর অবস্থিত। এই নদীর অববাহিকায় কর্ষিত জমির পরিমাণ ১,৮২,০০০ হেকটর। এর মধ্যে শতকরা ৯ ভাগ জমিতে জলসেচের সুযোগ রয়েছে। এই জল-সেচের শতকরা ৪০ ভাগ হয় কুঁয়োর জলে।

বৈতর্ণ

বৈতর্ণ নদীর জন্ম পশ্চিমঘাটের ত্রিমবক পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে, ৬৭০ মিটার উচ্চতায়। ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি ভিসার শহরের কাছে আরব সাগরে মিশেছে।

টংসা নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৈতর্ণ নদী প্রবাহিত হয়েছে। বোম্বাই শহরে জল সরবরাহের জন্য টংসা নদীর ওপর বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বৈতর্ণ নদীতে যে ২৭৪ মিটার জলপতন ঘটেছে, তা' কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে ৬০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

কালীনদী

কালীনদীর জন্ম বেলগাঁও জেলার বিড়ি গ্রামে। ১৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি মিশেছে আরব সাগরের কারোয়ার উপসাগরে। এর অব-বাহিকার আয়তন ৫১৭৯ বর্গ কিলোমিটার। কালীনদীর প্রধান উপনদী পাঁধি। কালীনদীতে একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।

বেদীত

বেদীত নদীর জন্ম ধারোয়ার ও হুবলি অঞ্চলের পাহাড়ে, ৭০১ মিটার উচ্চতায়। ১৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির প্রথম ৭২ কিলোমিটার

গান্ধীনগর
ভূপাল
পশ্চিম বঙ্গ
কলিকাতা
গুজরাট
উড়িষ্যা
ভুবনেশ্বর
মহারাষ্ট্র
বোম্বাই
বঙ্গোপসাগর
অন্ধ্র প্রদেশ
আরব সাগর
হায়দরাবাদ
পানাজী
কর্ণাটক
মাদ্রাজ
কাভারাট্টী দ্বীপ
পোর্ট ব্লেয়ার
২০°
১৬°
১২°
উত্তর-পশ্চিম বাহিনী নদীঃ—
১ ঘর্ঘর
২ লুনি
৩ বানাস
৪ সরস্বতী
৫ রুপেন
৬ মাছুর
৭ উন্ড নদী
৮ কাল্লুভর
পূর্ব বাহিনী নদীঃ—
১৫ কাজভি
১৬ গাদ
১৭ ভাগতান
১৮ চাপেরা
১৯ রাচোল
২০ চক্রনালী
২১ সীতা
২২ স্মরণ
২৩ গুরপুর
২৪ কালাল্লুপডি
২৫ চালাকুড়ি
২৬ মনিমেলা
২৭ আচিনকোয়েল
২৮ কাল্লাড়া
৩৫ চম্পাবতী
৩৬ গোস্থানী
৩৭ মথুরভাদা
৩৮ নর্ত্তগাড্ডা
৩৯ আনকা পল্লী
৪০ বরাহ
৪১ পম্মা
৪২ তান্ডব
৪৩ সুদ্দাগেদ্দা
৪৪ জি. ডি. মজ্জীরা
৪৫ আরানিয়ার
৪৬ কুয়াম
৪৭ আদায়ার
৪৮ ওঙ্গুর
৪৯ গাদিলাম

পর্যন্ত নদীখাতের ঢাল কম। কিন্তু তারপরই ৭২ কিলোমিটার দূরত্বে মাগোদের কাছে এক বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই 'মাগোদ জলপ্রপাতে' জলপতনের গভীরতা ১৮৩ মিটার। জলপ্রপাত সৃষ্টি হবার পর এই গভীর গিরিখাত ধরে প্রবাহিত হয়েছে বেদাতি নদী। উৎস থেকে ৩০ কিলোমিটার নিচে সাতমালা উপনদী মিশেছে বেদাতি নদীর সঙ্গে। আরেকটি উপনদী সৌদা মিলিত হয়েছে জলপ্রপাতের পরে। এই মিলনের পরে বেদাতি নদীর নতুন নামকরণ হয় গঙ্গাবল্লী নদী। এই গঙ্গাবল্লী নদী আরব সাগরে মিশেছে গঙ্গাবল্লী গ্রামের কাছে। এই গঙ্গাবল্লী গ্রামটি উত্তর কানারা জেলার আংকোলা শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে।

শারাবতী

করনাটকের ম্যাঙ্গালোর জেলায় পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে এই নদীটির জন্ম। অববাহিকার আয়তন ২২০৯ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীতেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতের অন্যতম উঁচু (২৫৫ মিটার) গেরসোপ্পা জলপ্রপাত। মাঝারি দৈর্ঘ্যের এই নদীটি মিশেছে আরব সাগরে। এই নদীর বুকে ৮৯০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন এক বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

ভারতপুজা

কেরালার আন্নামালাই পাহাড়ে ভারতপুজা নদীর জন্ম। কেরালার এই দীর্ঘতম নদীটির অববাহিকার আয়তন ৫৩৯৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৫৬৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা তামিলনাড়ুর ভেতরে। এর উপনদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গায়ত্রীপুজা, চিট্টুরপুজা, অমরাবতী, কোরাইয়ার ও টুথাপুজা। মালামপুজা প্রকল্পটি একটি উপনদীর বুকে রূপায়িত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। ২২ কোটি ৬০ লক্ষ ঘন মিটার আয়তনের জলাধার থেকে ৩৮,৫০০ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

পোন্নানী শহরের কাছে আরব সাগরে মিশেছে বলে মোহনার কাছে এই নদীটির নাম পোন্নানী।

পেরিয়ার

২২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি কেরালার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শিবাজীনি পাহাড়ে এই নদীটির জন্ম। অববাহিকার আয়তন ৫২৪৩ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১১৩ বর্গ কিলো-

মিটার এলাকা তামিলনাড়ুর মধ্যে। এর প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুল্লায়া, পেরুমতুরা, চেরুতনি, চেট্টার, পেরিনজাকুট্টি, মুতিরা-পুজা, দাভিয়ার, এদামালিয়ার। উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে আলওয়ের কাছে নদীটি পাঁচটি ধারায় আলাদা হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি ধারা মেশে চালাকুড়ি নদীর সঙ্গে, বাকি চারটি মেশে ভেমবানেদ হ্রদে। এই নদীর জল জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন—এই দু'টি কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। মাদুরাই জেলায় জলসেচের জন্য পেরিয়ার বাঁধ নির্মিত হয়েছে। কৃত্রিম জলাধার থেকে ১০০ কোটি ঘন মিটার জল ভাইগাইয়ের দিকে প্রবাহিত করা হচ্ছে প্রায় ৭৭,০০০ হেকটর জমিতে জলসেচের জন্য। পরে এই জলধারা থেকে ১৪০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

পামবা

১৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর অববাহিকার আয়তন ১৯৬১ বর্গ কিলোমিটার।

পূর্ববাহিনী নদী

পূর্ববাহিনী নদীর সংখ্যা ২৩। সব ক'টি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১,৭২,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির অববাহিকার মোট আয়তনের প্রায় ২.৭ গুণ।

বুড়িবালাম

বুড়িবালাম নদীর জন্ম ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায়। ১৬৪ কিলো-মিটার দীর্ঘ নদীটির অববাহিকার আয়তন ৪৮৩৭ বর্গ কিলোমিটার।

বুড়িবালামের একটি উপনদী চিপট নালায় ১৯১২ সালে একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি হয় ৩৬৪০ হেকটর পরিমাণ জমিতে জলসেচ করার প্রয়োজনে। আরেকটি উপনদী পলপোনডা নালায় আর একটি ছোট বাঁধ (weir) নির্মিত হয়েছে জলসেচের প্রয়োজনে।

বৈতরণী

৩৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির জন্ম ওড়িশার কেওঞ্চর জেলায়। বঙ্গোপসাগরে মেশবার আগে মোহনা অঞ্চলে নদীটির নাম ধামরা। অন্য-তম প্রধান উপনদী সালানদি ১৪০ কিলোমিটার দূরত্ব প্রবাহিত হবার পর বৈতরণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর অববাহিকার আয়তন ১৭৯৩ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৭৪ সালে সালানদি নদীর বুকে ৫২ মিটার দীর্ঘ একটি

বাঁধ নির্মিত হয়েছে। আর একটু নিচে বিদ্যাধরপুরমে একটি ব্যারেজও নির্মিত হয়েছে। এই ব্যারেজের জলে ৬১,৯২০ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাচ্ছে। প্রায় একশো বছর যে ওড়িশা খাল কাটা হয়েছিল, তা' বৈতরণী নদীকে কেটে বেরিয়ে গেছে। ভদ্রক শহরের কাছে সালানদি নদীতে ওড়িশা খাল শেষ হয়েছে।

বৈতরণীর উপনদী মাতাইয়ের জন্ম বালেশ্বর জেলায়। ৬৩ কিলোমিটার প্রবাহিত হবার পর মিলিত হয়েছে বৈতরণীর সঙ্গে। বৈতরণী নদীর বুকে কাজ চলছে ভীমকুণ্ড বহুমুখী প্রকল্পের। উচ্চ বৈতরণী বহুমুখী প্রকল্পে বৈতরণীর বুকে দু'টি বাঁধ এবং ওরদাই ও কানহারি উপনদী দু'টির বুকে একটি করে বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এর ফলে এক লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

রুসিকুল্যা

ওড়িশার আর একটি উপনদী রুসিকুল্যার জন্ম ফুলবানি জেলায়। ১৮৯৮ সালে রুসিকুল্যা খাল কাটা হয় মূলত ৪৯,৩৪০ হেকটর জমিতে জলসেচের প্রয়োজনে। এই নদীর বুকে দু'টি জলাধার তৈরি হয়েছে— একটি ভাঙ্গানগরে, আর একটি শারোদায়। তিনটি খালবাঁধও (anicut) তৈরি হয়েছে। বোরিংগা নালাতে যে জলাধার নির্মিত হয়েছে, তার নাম রুসেলকুণ্ড জলাধার। রুসিকুল্যার উপনদী জে'রার উপনদী পদ্মার বুকে যে জলাধার তৈরি হয়েছে, তার নাম শারোদা জলাধার। রুসেলকুণ্ড জলাধার জল পায় নিজস্ব অববাহিকা ও বাদানদীর খালবাঁধ থেকে।

নাগবলী

২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ নাগবলী নদীর জন্ম ওড়িশার কালাহান্দি জেলায়। অববাহিকার আয়তন ৯৪১০ বর্গ কিলোমিটার। ওড়িশায় উৎপত্তি হলেও একটি বড় অংশ অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শ্রী-কাকুলাম শহরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

জলসেচের প্রয়োজনে নাগবলী নদীতে থোটাপল্লী প্রকল্পটি নির্মিত হয় ১৯১০ সালে। পরে ১৯১৩ সালে যে নাগবলী জলাধারটি নির্মিত হয়, তা' থেকে জলসেচ করা হতো ১৪,৬৫০ হেকটর জমিতে। নাগবলীর উপনদী ভত্তিগেড্ডাতে একটি বাঁধ সম্প্রতি তৈরি হয়েছে ২,৮৫০ হেকটর জমিতে।

ইলেরু, মুনেরু, গুণ্ডলাকাম্মা ও পালেরু

ইলেরু জলাধার প্রকল্প, নীরাদি ব্যারেজ, জোরোহারবাঙ্গি প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। মুনেরু নদী-উপত্যকায় যে মোপাদ জলাধার নির্মিত হয়েছে ১৯২১ সালে, তা' থেকে ৫,০৬০ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে। গুণ্ডলাকাম্মা নদী উপত্যকায় নির্মিত কামবাম জলাধার থেকে কুরনুল জেলার ৪,৮৬০ হেকটর জমিতে ও এই নদী উপত্যকার মোরকাপুর জলাধার থেকে আরো ১৬২০ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে। মুনেরু নদী উপত্যকায় আরো যে কয়েকটি প্রকল্প নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপ্পুটেরু খালবাঁধ, রাল্লাপাডু প্রকল্প ইত্যাদি। এছাড়া পালেরু নদীউপত্যকায় তৈরি হয়েছে পালেরু-বিতরগুনটা খাল।

কোরটালাইয়ার

১৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটির জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশে হলেও তামিলনাড়ুতে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। অববাহিকার আয়তন ৩৫২১ বর্গ কিলোমিটার। জলসেচের কাজে এই নদীটি বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। বেশ কিছু ছোটখাট জলাধারে জল যোগানো ছাড়াও এটি জল যুগিয়েছে চেমবরমক্কাম, পুণ্ডি, রেড হিলস ও শোলাভরম জলাধারে। শেষোক্ত তিনটি জলাধার থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে মাদ্রাজ শহরে।

পালার

করনাটকের কোলার জেলায় জন্ম নিয়ে পালার নদী অন্ধ্রপ্রদেশ পেরিয়ে তামিলনাড়ুতে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ৩৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির অববাহিকার আয়তন ১৭,৮৭১ বর্গ কিলোমিটার। মাঝারি নদীগুলির ভেতরে দ্বিতীয় দীর্ঘতম এই নদীর জল দীর্ঘ দিন ধরে জলসেচের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোইনি ও চেইয়ার। পালার ও অন্য দু'টি উপনদীতে বেশ কিছু খাল বাঁধ (anicut) অতীতে নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ভেল্লোর থেকে ২৫ কিলোমিটার নিচে। এটি থেকে প্রায় ৩৩,৬০০ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে। ভেল্লোর ও কাঞ্চিপুরম শহর দু'টি এরই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পোন্নাইয়ার

এই নদীটিরও উৎস করনাটকের কোলার জেলায়। মাঝারি নদীগুলির মধ্যে দীর্ঘতম (৩৯৬ কিলোমিটার) এই নদীটি তামিলনাড়ুর

কান্ডালোরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এর অববাহিকার আয়তন ১৫,৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার। সালেম জেলার কৃষ্ণগিরিতে জলসেচের জন্য একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আরকট জেলায় জলসেচের জন্য নির্মিত হয়েছে আর একটি বাঁধ। এই নদীটির আর একটি নাম দক্ষিণ পিনাকিনী।

ভেল্লার

১৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভেল্লার নদীর জন্ম তামিলনাড়ুর চিত্রি পাহাড়ে। জলসেচের সুবিধের জন্য নদীটিতে ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া হয়েছে থলুডার, শাতিয়াটোপে ও পালেমে। ভেল্লার নদীর দু'টি উল্লেখযোগ্য উপনদী মণিকুট নদী ও গোমুখী। মণিকুট নদীতে দু'টি খালবাঁধ (anicut) কাটা হয়েছে।

ভাইগাই

২৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভাইগাই নদীর জন্ম তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলায়। পেরিয়ার নদীর জল ভাইগাই নদীর উপনদী সুরুলিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে জলসেচের সুবিধের জন্য। সুরালি নদীর সঙ্গে পেরিয়ার নদীর সঙ্গমস্থলের নিচে একটি বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হয়েছে। এই জলাধার থেকে ৫৬৭০ হেকটর জমিতে জলসেচ করা হচ্ছে। ভাইগাই নদীতে পেরানাইতে একটি জলাধার নির্মিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এই জলাধারের জলে মাদুরাই জেলার ৫২,০৩০ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে ভাইগাই নদীর বুকে আর একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ঘন মিটার আয়তনের জলাধার থেকে আরো ৮৮৩ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাচ্ছে। ভাইগাই নদী মিশেছে পক উপসাগরে।

তাম্রপর্ণি

১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ তাম্রপর্ণি নদীর জন্ম তামিলনাড়ুর তিরুনেল-ভেলি জেলায়, সঙ্গম মান্নার উপসাগরে। অববাহিকার আয়তন ৫,৪৮২ বর্গ কিলোমিটার। বহুদিন ধরেই এই নদীর জল জলসেচের কাজে ব্যবহৃত। প্রধান দু'টি উপনদী চিত্তার ও মণিমুথার। নদী ও উপনদী দু'টিতে বেশ কিছু অ্যানিকাট (anicut) বা ব্যারেজ রয়েছে। মণিমুথার নদীতে একটি বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হয়েছে। জলাধারের আয়তন ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ ঘন ফুট। এই জলাধার থেকে বহু ছোট ছোট হ্রদ ও

খালে জল পাঠানো সহজতর হয়েছে। তাম্রপর্ণি'র আর একটি উপনদী গোট্টানদীর আর একটি বাঁধ তৈরি করে আরো ৩২৯০ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছে।

বিদেশবাহিনী নদী

আগে আলোচিত নদীগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি মাঝারি পর্যায়ের নদী আছে, যাদের উৎস ভারতে হলেও পাশ্ববর্তী দেশগুলির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এ ধরনের নদীর সংখ্যা চার।

কর্ণফুলী

১৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির জন্ম মিজোরামে হলেও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীটির অববাহিকার আয়তন ৩,৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার। চট্টগ্রাম থেকে ৪০ কিলোমিটার উজানে বাংলাদেশের ভেতরে একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এখানে ৮০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে তৈরি এই বাঁধটির জলাধারে কিছু ভারতীয় অংশও জলের তলায় ডুবেছে। কিন্তু এজন্য ভারতের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি, তাই এই ব্যাপার নিয়ে দু'দেশের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। তবে ভারত ও বাংলাদেশ এই দু'দেশের সহযোগিতায় এই নদীটি থেকে অনেকটা জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে।

কালাদান

২৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ কালাদান নদীর জন্ম মিজোরামের লুসাই পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ৭৯৩৩ বর্গ কিলোমিটার। মিজোরাম থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কালাদান নদী ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে আকিয়াব বন্দরের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

ইমফল

ইমফল নদীর জন্ম মণিপুরে। নামকরণও মনিপুরের রাজধানীর নামে। নদীটির অববাহিকার আয়তন ৭,২৫৫ বর্গ কিলোমিটার। উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলির মধ্যে রয়েছে ইরিল, থামবল, খুগে ও চাকপি। নদীটি ইমফল শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লোকটাক হ্রদে মিশেছে। পরিকল্পনায় আছে, লোকটাক হ্রদ থেকে কিছুটা জল পাঠানো হবে বরাক নদীতে, যাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। লোকটাক হ্রদ থেকে আরো কিছু জল পাম্প করে ইমফল উপত্যকায় পাঠানো হবে জসসেচের

প্রয়োজন মেটাতে। খুগে উপনদীর মিলনের পর ইমফল নদীর নতুন নাম মণিপুর নদী। নদীখাতের ঢাল মাঝে মধ্যে উলটোমুখী থাকায় মণিপুর নদীতে বন্যা হয় প্রায়ই। বন্যা নিরোধ পরিকল্পনায় নদীখাতের ঢাল এক মুখী করতে হবে ও নদীখাতের পাথরের অবরোধ সরাতে হবে। চাপাকি নদীর সঙ্গে মিলনের পর মণিপুর নদী আরো ৩২০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মদেশের চিনডুইন নদীর সঙ্গে মিশেছে। চিনডুইন নদী পরে ইরাবতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে এই দূর-দুর্গম অঞ্চলের পক্ষে লোকটাক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প খুবই জরুরি ও প্রয়োজনীয়। প্রকল্পে রয়েছে, একটি খাল ও টানেল নির্মাণ এবং বরাক উপত্যকায় একটি জল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন। লোকটাক হ্রদ থেকে বরাক উপত্যকায় পৌঁছতে ৩১৩ মিটার জল পতন ঘটেছে। ১৮·৪ কিউমেক জল অপসারণ করে ১০৫ মেগাওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

তিক্ষু ননীতালুক

১৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তিক্ষু-ননীতালুক নদীর জন্ম নাগাল্যাণ্ডে। অববাহিকার আয়তন ৬,৪৪৯ বর্গ কিলোমিটার। নাগাল্যাণ্ডের সীমানা থেকে দক্ষিণ পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে চিনডুইন নদীর সঙ্গে।

ছোট নদ-নদী

এ ধরনের ছোট নদ-নদীর অববাহিকার আয়তন ২০00 বর্গ কিলোমিটারের কম। ভারতে এদের সংখ্যা ৫৫ (চিত্র ১১)। এ ধরনের নদী স্বভাবতই আকারে ছোট। আর এদের উৎস প্রধানত পূর্বঘাট অথবা পশ্চিমঘাট পর্বতে। এ ধরনের সমস্ত ছোট নদনদীর অববাহিকার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এসব নদীর খাতের ঢাল খুব বেশি, নদীবাহিত পলি পর্যাপ্ত। তাছাড়া এসব নদীতে জল আসে বন্যার মতো আচমকা। ফলে কয়েক বছর পর পর এসব নদীর বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে সমুদ্রতট অঞ্চলে জলসেচের কাজে এসব নদীর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত কেরালা ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে।

এসব নদীতে মোট যে ১২,000 কোটি ঘন মিটার জল প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ জল প্রবাহিত হয় পূর্ববাহিনী নদীগুলিতে। তুলনায় অনেক বেশি জল প্রবাহিত হয় পশ্চিমবাহিনী

নদীগুলিতে।

ঠিকমতো সমীক্ষা হলে এসব ছোট নদনদীগুলিকেও নানা প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যেতে পারে।

এসব ছোট নদ-নদীর তালিকা দেওয়া হলো নিচে।

উত্তর-পশ্চিম বাহিনী নদী

নদীর নাম	যে প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
১. ঘর্ঘর (Ghaggar)	পানজাব ও হরিয়ানা
২. লুনি (Luni)	রাজস্থান
৩. বানাস (Banas)	গুজরাট
৪. সরস্বতী (Saraswati)	ঐ
৫. রুপেন (Rupen)	ঐ
৬. মাছুর (Machur)	ঐ
৭. উন্ড নদী (Und River)	ঐ
৮. কালুভর (Kalubhar)	ঐ
৯. কেরি (Keri)	ঐ
১০. ভাগব (Bhagav)	ঐ
১১. মানধোলা (Mandhola)	ঐ
১২. পার (Par)	মহারাষ্ট্র
১৩. দামন গঙ্গা (Daman Ganga)	ঐ
১৪. বশিষ্টে (Vashishte)	ঐ
১৫. কাজভি (Kajvi)	ঐ
১৬. গাদ (Gad)	ঐ
১৭. ভাগতান (Vaghatan)	ঐ
১৮. চাপেরা (Chapera)	ঐ
১৯. রাচোল (Rachol)	গোয়া
২০. চক্রনালী (Chakranali)	ঐ
২১. সীতা (Sita)	করনাটক
২২. স্মরণ (Swaran)	ঐ
২৩. গুরপুর (Gurpur)	করনাটক
২৪. কালালুপডি (Kalalupdi)	করনাটক ও কেরালা
	কেরালা

নদীর নাম	যে প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
২৫. চালাকুড়ি (Chalakudi)	কেরালা
২৬. মণিমেলা (Manimela)	ঐ
২৭. অচিন কোয়েল (Achinkoil)	ঐ
২৮. কাল্লাড়া (Kallada)	ঐ
পূর্ব-বাহিনী নদী	
২৯. বহুদা (Bahuda)	ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ
৩০. মহীন্দ্র তনয়া (Mahindra Tanaya)	ঐ
৩১. পুণ্ডি (Pundi)	ঐ
৩২. নৌপাড়া (Naupada)	অন্ধ্রপ্রদেশ
৩৩. পাড্ডাগেড্ডা (Paddagedda)	ঐ
৩৪. কাণ্ডেভালাসা (Kandevalasa)	ঐ
৩৫. চম্পাবতী (Champavati)	ঐ
৩৬. গোস্থানী (Gosthani)	ঐ
৩৭. মথুরভাদা (Mathurvada)	ঐ
৩৮. নর্ভগাড্ডা (Narvagadda)	ঐ
৩৯. আনকাপল্লী (Anaka palli)	ঐ
৪০. বরাহ (Varaha)	ঐ
৪১. পম্পা (Pampa)	ঐ
৪২. তাণ্ডব (Tandava)	ঐ
৪৩. সুদ্দাগেদ্দা (Suddgedda)	ঐ
৪৪. জি. ডি. মঞ্জীরা (G. D. Manjira)	ঐ
৪৫. আরানিয়ার (Araniar)	ঐ
৪৬. কুয়াম (Cooum)	তামিলনাড়ু
৪৭. আদায়ার (Adayar)	ঐ
৪৮. ওঙ্গুর (Ongur)	ঐ
৪৯. গাদিলাম (Gadilam)	ঐ
৫০. পারাভানার (Paravanar)	ঐ

নদীর নাম	যে প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
৫১. অগ্নিয়ার (Agniar)	তামিলনাড়ু
৫২. ভিল্লার (Villar)	ঐ
৫৩. আমবুইয়ার (Ambuiar)	ঐ
৫৪. কলুভানার (Koluvanar)	ঐ
৫৫. উপ্পার (Uppar)	ঐ

জলের ব্যবহার

মানুষের জীবনে জল যে কতটা অপরিহার্য, তা বোধহয় কারোরই অজানা নয়। তাই বোধহয় জলের আরেক নাম জীবন। জল পান না করলে মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু তাই নয়, জীবনধারণের জন্য যে অন্নের প্রয়োজন, সেই ফসলের উৎপাদনও জল ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ফসল-উৎপাদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সভ্যতার অগ্রগতি।

চাষবাসের জন্য সারা বছর ধরে যথেষ্ট জল প্রয়োজন। সব ফসলের জন্য অবশ্য সমান পরিমাণ জল লাগে না। যেমন ধান ও আখ চষের জন্য যতটা জল লাগে, গম ও অন্যান্য দানা শস্যের জন্য ততটা লাগে না। কিন্তু ভারতের সব জায়গায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। তাই মোটামুটি জলের সুষম বণ্টনের জন্য প্রয়োজন সুষম সেচ ব্যবস্থা।

ফসল উৎপাদন ও চাষবাস ছাড়া জলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে। পাহাড়ী জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত জলের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়েই জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ শক্তি গার্হস্থ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতাও এগিয়ে চলেছে।

ফসল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও জলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে জল পরিবহণে। সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের চেয়েও আগে বোধহয় আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। নদীনালা বেয়ে মানুষ ভ্রমণ করেছে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। তাই নদীর তীরে গড়ে বহু তীর্থস্থান, শহর।

নানা ধরনের শিল্পে নানা প্রয়োজনে লাগে জল। কিছু কিছু শিল্পে প্রচুর জল লাগে, আবার কোন কোন শিল্পে অল্প জলেই কাজ চলে যায়।

সারা পৃথিবীতে কোন শিল্পে কতটা জল লাগে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। এই তালিকাটি নেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড নেশনসের জল-সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট (১৯৭৩) থেকে।

শিল্প ও প্রস্তুত উপাদানের নাম	উপাদানের পরিমাণ	জলের পরিমাণ (লিটার) ও দেশের নাম
1. খাদ্যদ্রব্য		
ক) বিসকুট	টন	৬০০ (সাইপ্রাস)
		২,১০০-৪,২০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
খ) টিনের মাছ	টন	৪০০ (বেলজিয়াম)
		৫৮,০০০ (কানাডা)
গ) টিনের ফল ও তরকারী	টন	১৫,০০০-৩০,০০০ (বেলজিয়াম)
		১০,০০০-৫০,০০০ (কানাডা)
ঘ) মাংস	টন	২৩,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঙ) সসেজ	টন	২০,০০০-৩৫,০০০ (ফিনল্যাণ্ড)
চ) মুরগি-পালন	টন	৬,০০০-৪৩,০০০ (কানাডা)
ছ) মাখন	টন	২০,০০০ (নিউজিল্যাণ্ড)
জ) চিজ	টন	২,০০০ (নিউজিল্যাণ্ড)
		২৭,৫০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঝ) দুধ	১,০০০ লিটার	৩,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঞ) পাউডার দুধ	টন	৪৫,০০০ (নিউজিল্যাণ্ড)
ট) চিনি	এক টন বিট চিনি	৩,২০০-৮,৩০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
		১০,৪০০-১৪,০০০ (ফেডারেল জারমানি)
	এক টন আখ	১৫,০০০ (চীন)
ঠ) বিয়ার	কিলোলিটার	১০,০০০-২০,০০০ (কানাডা)
ড) আটা	টন	২,০০০ (সাইপ্রাস)
ঢ) ভুট্টার আটা (তরল)	লিটার	১৫-২৫.৫ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
2. কাগজ শিল্প		
ক) কাগজের মণ্ড	টন	১,৭০,০০০-৫,০০,০০০ (সুইডেন)
খ) সালফাইট কাগজের মণ্ড	টন	৪,৫০,০০০-৫,০০,০০০ (ফিনল্যাণ্ড)
গ) পাতলা উৎকৃষ্ট কাগজ	টন	৯,০০,০০০-১০,০০,০০০ (সুইডেন)

শিল্প ও প্রস্তুত উপাদানের নাম	উপাদানের পরিমাণ	জলের পরিমাণ (লিটার) ও দেশের নাম
ঘ) কাগজ শিল্পের গড় পড়তা হিসেব		৫০,০০০-২,৩৬,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ৯০,০০০ (গ্রেট ব্রিটেন) ১,৫০,০০০ (ফ্রান্স)
3. পেট্রোলিয়াম ও কৃত্রিম জ্বালানি শিল্প		
ক) উড়োজাহাজের গ্যাসোলিন	কিলোলিটার	২৫,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
খ) গ্যাসোলিন	কিলোলিটার	৩৪,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
গ) কেরোসিন	কিলোলিটার	৪০,০০০ (বেলজিয়াম)
ঘ) কৃত্রিম গ্যাসোলিন	কিলোলিটার	৩,৭৭,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঙ) খনিজ তেলক্ষেত্র	এক কিলোলিটার অপরিশোধিত খনিজ তেল	৪,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
চ) তেল শোধনাগার	এক টন অপরিশোধিত খনিজ তেল	১০,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ৩০,৫০০ (চীন)
4. রসায়ন শিল্প		
ক) অ্যাসেটিক অ্যাসিড	লিটার	৪,১৭,০০০-১০,০০,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
খ) অ্যামোনিয়াম সালফেট	টন	৮,৩৫,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
গ) ক্যালসিয়াম কারবাইড	টন	১,২৫,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঘ) কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন	টন	১,২৫,০০০ (কানাডা)
ঙ) গান পাউডার	টন	৪,০১,০০০-৮,৩৫,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)

শিল্প ও প্রস্তুত উপাদানের নাম	উপাদানের পরিমাণ	জলের পরিমাণ (লিটার) ও দেশের নাম
চ) হাইড্রোজেন	টন	২৭,৫০,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ছ) ল্যাকটোজ	টন	৮,৩৫,০০০-৯,১৮,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
জ) সোডা অ্যাশ	টন	৬,২৬,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঝ) সালফিউরিক অ্যাসিড	টন	১,০৪,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
5. **বয়ন শিল্প**		
ক) তুলা	টন	১০,০০০-২,৫০,০০০ (সুইডেন)
	বর্গ গজ	১ (কানাডা)
খ) উল	টন	১,৫০,০০০-৫,৫০,০০০ (ফিনল্যাণ্ড)
		৪,০০,০০০ (কানাডা)
গ) কৃত্রিম রেশম	টন	২০,০০,০০০ (সুইডেন)
ঘ) রেয়ন	টন	২০,০০,০০০ (বেলজিয়াম)
6. **খনি শিল্প**		
ক) সোনা	টন	১,০০০ (দক্ষিণ আমেরিকা)
খ) লোহা আকরিক	টন	৪,২০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
গ) বকসাইট	টন	১২,৩০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঘ) গন্ধক	টন	১২,৫০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
7. **লোহা ও ইস্পাত শিল্প**		
ক) স্বয়ং সম্পূর্ণ লোহার কারখানা	টন	১৪,৭০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
খ) রোলিং ও ড্রয়িং মিল	টন	১,০৩,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
গ) ব্লাস্ট ফারনেস	টন	৭২,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
		৫৮,০০০-৭৩,০০০ (বেলজিয়াম)

শিল্প ও প্রস্তুত উপাদানের নাম	উপাদানের পরিমাণ	জলের পরিমাণ (লিটার) ও দেশের নাম
৪. অন্যান্য শিল্প		
ক) মোটর গাড়ি	একটি গাড়ি	৩৮,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
খ) বাষ্প বয়লার	অশ্ব-শক্তি-ঘণ্টা	১৫ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
গ) কেসিন	টন	৫৫,০০০ (নিউজিল্যাণ্ড)
ঘ) পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট	টন	৯০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঙ) কয়লা	টন	১,০০০ (ফেডারেল জারমানি)
		৫,০০০-৬,০০০ (বেলজিয়াম)
		৮৪০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
চ) বিস্ফোরক	টন	৮,৩৫,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ছ) সার	টন	২,৭০,০০০ (ফিনল্যাণ্ড)
জ) কাঁচ	টন	৬৮,০০০ (বেলজিয়াম)
ঝ) লনড্রি	এক টন কাচা জামাকাপড়	৩০,০০০-৫০,০০০ (সুইডেন)
ঞ) চামড়া	টন	৫০,০০০-১,২৫,০০০ (ফিনল্যাণ্ড)
ট) অলৌহ ধাতু	টন	৮০,০০০ (বেলজিয়াম)
ঠ) অ্যাসবেসটস	টন	১৬,৭০০-২০,৯০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ড) কৃত্রিম রবার	টন	৮৩,৫০০-২৮,০০,০০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
ঢ) স্টার্চ	এক টন কাঁচা মাল	১৩,০০০-১৮,০০০ (বেলজিয়াম)
ণ) বিদ্যুৎ শিল্প	এক টন কয়লা	২,০০,০০০-৪,০০,০০০ (সুইডেন)
	কিলোওয়াট/ঘণ্টা	২০০ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)

জলবিদ্যুৎ শক্তি

জলের গতিশক্তিতে মানুষ বহুদিন ধরে কাজে লাগিয়ে আসছে। জল-শক্তির প্রথম ব্যবহার শুরু আজ থেকে অনেক হাজার বছর আগে যখন কয়েকটি গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে মানুষ তৈরি করে জলচাকি—সেচের জন্য নদী থেকে জল তোলার কাজে ব্যবহৃত হতো। এই জলচাকি ঘুরত নদী-স্রোতের শক্তিতে। এটি প্রথম তৈরি হয় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালে। পরবর্তী সময়ে গম পেষাইয়ের কাজেও জলচাকির ব্যবহার হয়। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে রোম নগরীতে গম পেষাই হতো জলচাকি দিয়ে। পরে (দ্বাদশ শতকে) সমুদ্র মোহনায় জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যেও জলচাকি ঘোরানো হতো। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের শেষ ভাগে আরো অনেক কাজ হতে থাকে জলচাকির সাহায্যে। সতেরো ও আঠেরো শতকে ইংলণ্ডে জলচাকি এত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে, বেকার হওয়ার ভয়ে মানুষ জলচাকি ধ্বংস করতে শুরু করে।

জলশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে। পাহাড়ী জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত জলের এই গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়েই উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ।

পাহাড়ী উঁচু জায়গায় নির্মিত জলাধারে আবদ্ধ জল নলের সাহায্যে নামতে নামতে টারবাইন ঘোরায়। টারবাইনের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরলে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হয়। পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জলাশয়কেও কাজে লাগানো হয়। বহমান জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির একটি সমীকরণ রয়েছে। জলাধারের উচ্চতা H ফিট, জলপ্রবাহের পরিমাণ Q (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন ফুট) হলে উৎপাদিত শক্তির (E) পরিমাণ হবে এই রকম ঃ

ব্রিটিশ ইউনিটে $E = Q \times ৬২^{\cdot}৫ \times H$ ফুট-পাউণ্ড

$$= \frac{Q \times ৬২^{\cdot}৫ \times H}{৫৫০}$$ অশ্বশক্তি

$$= \frac{Q \times ৬২\text{'}৫ \times H \times ৭৪৬}{৫৫০ \times ১০০০} \text{ কিলোওয়াট}$$

(০'৮০ কর্মক্ষমতা ধরে নিয়ে)

$$E = \frac{Q \times H}{১৫} \text{ কিলোওয়াট (১০০\% লোড ফ্যাকটরে)}$$

অথবা $$E = \frac{Q \times H}{৯} \text{ কিলোওয়াট (৬০\% লোড ফ্যাকটরে)}$$

তবে মেটরিক পদ্ধতিতে হিসেবটা একটু অন্যরকম। এখানে Q এর পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ঘন মিটার, H মিটারে হলে ঃ

$$E = \frac{Q \times ৩৫\text{'}৩২\ H \times ৩\text{'}২৮}{৯} = ১৩QH \text{ কিলোওয়াট (৬০\% লোড ফ্যাকটরে)}$$

ওপরে দেওয়া সমীকরণ থেকে এটা স্পষ্ট, উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি, জলাধারের উচ্চতা ও জলপ্রবাহের হারের সঙ্গে সমানুপাতিক। যদি ১৬'৭৬৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত জলাধার থেকে প্রতি ঘণ্টায় ১৬৩৬৫'৯ লিটার জল একটি নল দিয়ে নিচে নামে তবে ঐ জলধারা প্রতি সেকেণ্ডে ৭৪৬ জুল বা ৭৪৬×১০^{7} আর্গ পরিমাণ কাজ করবে। এখন নলের নিচের মুখে টারবাইন জেনারেটর লাগানো থাকলে ৭৪৬ ওয়াট বা ১ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। বিদ্যুৎশক্তির হিসেব 'অশ্বক্ষমতা'য় রাখা হয় না, রাখা হয় কিলোওয়াট ($১০^{৩}$ ওয়াট), মেগাওয়াট ($১০^{৬}$ ওয়াট) বা জিগাওয়াটে ($১০^{৯}$ ওয়াট)। নল এবং যন্ত্রে ঘর্ষণ প্রভৃতি বাধার জন্য গাণিতিক হিসেবের চেয়ে কিছু কম শক্তি পাওয়া যায়। তাই ১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে তাত্ত্বিক প্রয়োজনের কিছু বেশি উচ্চতা বা জলের প্রয়োজন হয়। জলের মোট পরিমাণ, জলাধারের উচ্চতা আর জলপ্রবাহের হার জানা থাকলে কত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে তা' হিসেব করে বলা যায়। যেমন, এভাবে হিসেব করে বলা হয়েছে 'ভাকরা-নাঙ্গাল' এ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৬৪ মেগাওয়াট (১৯৭৭ খৃী)। শক্তিকেন্দ্রে (Power Station) বিদ্যুৎ উৎপাদন উচ্চ চাপেই হয়, সাধারণত ৩৩০০ ভোলটে। দূরে পাঠাবার খরচ কমানোর জন্য ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিদ্যুতের চাপ ৩৩০০০ ভোল্ট বা আরো বেশি ভোলটে করা হয়। ব্যবহারের সময় এই চাপ ২২০ বা ৪৪০ ভোলটে পরিবর্তিত করা হয়।

ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তি

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় দারজিলিংয়ে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষমতা ৩০০ কিলোওয়াট। এরপর ১৯০২ সালে করনাটকের শিবসমুদ্রমে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বোমবাইয়ে ৫০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টাটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয় ১৯১৪ সালে। ১০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম কলকাতায় তৈরি হয় ১৮৯৯ সালে। এভাবেই ধীরে ধীরে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠছিল ভারতে। ১৯৪৭ সালে ভারতে যে মোট ২০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো, তার শতকরা ২৫ ভাগই জলবিদ্যুৎ। ১৯৭৩ সাল নাগাদ মোট ১৮৫ লক্ষ কিলোওয়াট মোট বিদ্যুতের মধ্যে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ৬৮ লক্ষ কিলোওয়াট। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির একটি তালিকা দেওয়া হলো নিচে।

বছর	ঘণ্টায় লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদিত শক্তি
১৯৬০-৬১	৭৮,৩৭০
১৯৬৫-৬৬	১,৫২,২৫০
১৯৭৪-৭৫	২,৮৯,৭২০
১৯৭৮-৭৯	৪,৭১,০৪৪

ছ'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে বহু বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট। ভারতের প্রধান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির তালিকা (চিত্র ১২) দেওয়া হলো নিচে ঃ

প্রকল্প	নদী	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
অন্ধ্রপ্রদেশ		
১. মাচকুণ্ড	গোদাবরী	১১৫
২. উচ্চ সিলেরু	সিলেরু	১২০
৩. নিম্ন সিলেরু	সিলেরু	৪০০
৪. শ্রীশৈলম	কৃষ্ণা	৪৪০

প্রকল্প	নদী	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
আসাম		
১. উমিয়াম-উমত্রু	ব্রহ্মপুত্র	৬৫
কেরালা		
১. ইডিক্কি	পেরিয়ার	৭৮০
২. কুট্টিয়াডি		৭৫
৩. শবরীগিরি	পামবা	৩০০
৪. সেনগুলাম		৮০
উত্তরপ্রদেশ		
১. রিহন্দ	রিহন্দ	৩০০
২. ওবরা		১০০
৩. যমুনা (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)		৪৫০
ওড়িশা		
১. হীরাকুঁদ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)	মহানদী	২৭০
২. বালিমেলা		৩৬০
করনাটক		
১. মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্র		১২০
২. শারাবতী	শারাবতী	৮৯১
৩. তুঙ্গভদ্রা	তুঙ্গভদ্রা	৬০
৪. কালীনদী	কালীনদী	৯১০
গুজরাট		
১. উকাই	তাপ্তী	৩০০
জম্মু-কাশ্মীর		
১. নিম্ন ঝিলম	ঝিলম	১১২
২. সালাল	চেনাব	৩৪৫
তামিলনাডু		
১. মেট্টুর টানেল	কাবেরী	২০০

প্রকল্প	নদী	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
২. পেরিয়ার		১৪০
৩. কুন্দাহ (প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায়)		৫৪৯
৪. কোদাইয়ার		১০০
৫. পরম বিকুলাম আইয়ার		১৮৫
পানজাব-হরিয়ানা		
১. ভাকরা-নাঙ্গাল	শতদ্রু ও বিপাশা	৬০৪
২. ভাকরা দক্ষিণ তীর	ঐ	৫১০
৩. বিপাসা-শতদ্রু কেন্দ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)	ঐ	৯০০
মধ্যপ্রদেশ		
১. গান্ধী সাগর	চম্বল	১১৫
মহারাষ্ট্র		
১. কয়না	কয়না	৮৬০
২. বৈতরণী		৬০
রাজস্থান		
১. রানাপ্রতাপ সাগর		১৭২
২. জহর সাগর		১০০
পশ্চিমবঙ্গ		
১. দামোদর উপত্যকা	দামোদর	২৯৭
২. জলঢাকা	তিস্তা	৩৬
বিহার		
১. মাইথন		৬০
২. সুবর্ণরেখা	সুবর্ণরেখা	১২০
মণিপুর		
১. লোকটাক	লোকটাক হ্রদ	১০৫
হিমাচল প্রদেশ		
১. গিরিবাতা		৬০

সাম্প্রতিক কালে ভারতে ১০,৫০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ তৈরি হচ্ছে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে, ৪৩ ভাগ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে এবং ৩ ভাগ আণবিক শক্তিকেন্দ্রে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ১৯৮৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ২০,২৬২ মেগাওয়াট। এর মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৩,৯৪৮ মেগাওয়াট, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৫,১১৪ মেগাওয়াট এবং আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১,১০৬ মেগাওয়াট। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, এই শতাব্দীর শেষে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ১,২৫,০০০ মেগাওয়াট। সপ্তম যোজনায় সারা ভারতে ৫০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিরাট। এর পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)। অবশ্য এর মধ্যে ছোটখাট বিদ্যুৎপ্রকল্পের হিসেব ধরা হয় নি। ভারতে কোকিং ও নন-কোকিং কয়লার মজুতের পরিমাণ প্রায় ৮,৬০,০০০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু এই কয়লা পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে না, একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবেই। কিন্তু জলশক্তি অফুরন্ত, অনিঃশেষ। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে বেশ কিছু বেগবতী নদী রয়েছে, তাদের কাজে লাগালে যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব। এদের মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ঝিলম, চন্দ্রভাগা, রাবি, নর্মদা, মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা উল্লেখযোগ্য। অন্য পদ্ধতিতে তৈরি বিদ্যুতের চেয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরির খরচও অনেক কম।

একথা ঠিক, প্রথম পর্যায়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির খরচ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বেশি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের খরচ খুব কম হওয়ায়, প্রথম পর্যায়ের বেশি খরচ খুব কম সময়েই উঠে আসে। তাছাড়া জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের খরচ বেশি হলেও, এর ফলে জলসেচ ও অন্যান্য বহুমুখী পরিকল্পনার প্রসার ঘটে ও নদী-উপত্যকার সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। আর এভাবেই জলশক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। আর একটি আশার কথা এই যে, জলবিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির কাছাকাছি এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে জলবিদ্যুৎশক্তির সদ্ব্যবহার সম্ভব।

কিন্তু কয়লা, যা ভারতের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল স্তম্ভবিশেষ, তা' ভারতের মাত্র কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত। তাছাড়া ভারতের কয়লা খুব ভালো জাতের নয়, তাই এই কয়লা উৎপাদনস্থল থেকে বহুদূরে বয়ে

নিয়ে যাওয়া অর্থনীতির দিক থেকে তেমন লাভজনক নয়। ফলে কয়লাখনি অঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থানে জলবিদ্যুৎই একমাত্র ভরসা। অন্যান্য আরো কিছু কারণে (যেমন পরিবেশ দূষণ) এমনও দেখা গেছে, কয়লাখনির কাছাকাছি অঞ্চল যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

তবে বিদ্যুতের চাহিদা যে হারে বাড়ছে, তাতে যেসব জায়গায় কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ও আণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত, সেসব অঞ্চলেও বর্ধিত চাহিদা মেটাতে অদূর ভবিষ্যতেই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেসব অঞ্চলে জল-সরবরাহের পরিমাণ কম, সে সব অঞ্চলে আজকাল 'কৃত্রিম জলাধার' তৈরি করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। বর্ধিত চাহিদার সময় এই কৃত্রিম জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, পরে রাত্রিবেলা বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হলে সেই বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যবহৃত জল আবার পাম্প করে পাঠানো হয় কৃত্রিম জলাধারে। দেশের যে সব জায়গায় জলের সরবরাহের পরিমাণ কম, সেসব অঞ্চলের জন্য এ ধরনের 'কৃত্রিম জলাধার' ভিত্তিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা উচিত। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের যেসব জলবিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে, তাদের ক্ষমতা যথাক্রমে ৩০০ এবং ১৮০০ মেগাওয়াট। ভারতেও এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানে এ ধরনের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করলে তাতে অর্থের সাশ্রয় হবে। যেসব শহর বা শিল্পকেন্দ্র যার কাছাকাছি এমন কোন নদী নেই যেখানে সাধারণ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, সেসব শহর বা শিল্পকেন্দ্রের পক্ষে এ ধরনের 'কৃত্রিম জলাধার' ভিত্তিক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রায় আদর্শস্থানীয়।

অর্থনীতির হিসেব থেকে দেখা গেছে, যে কোন সাধারণ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র যদি ৩০% লোড ফ্যাকটরে চলে, তবু তা' অলাভজনক নয়। একটি অসুবিধে যা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তা' হলো বৃষ্টিজলের ওপর এর নির্ভরতা। যদিও সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির সময় সেই অঞ্চলের গত ১০০ বছরের বৃষ্টিপাতের তথ্য খুঁটিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়, তবু প্রায়ই এমন সময় আসে, যখন অপর্যাপ্ত বৃষ্টির ফলে বাঁধের জলাধার পুরোপুরি ভরে না।

তবে এ ধরনের ঘটনা যদি সারা ভারতে একসঙ্গে ঘটে, তবে তখন বিদ্যুৎ-দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কী ঘটতে পারে। ঠিক এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল ১৯৭২ সালের বর্ষাকালে। সে বছর কম বৃষ্টিপাতের দরুণ

ভারতের প্রায় সব ক'টি জলাধারই মাত্র অর্ধেক ভরেছিল। এর ফলে সে বছর সারা ভারতময় বিদ্যুতের ঘাটতি। শুধু ভারত নয়, ১৯৭২ সালে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই খরা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেছে। এসব দুর্বিপাকে মাঝে মধ্যে পড়তে হলেও মোটামুটিভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অনেকদিক থেকেই সুবিধেজনক।

যদিও ভারতের মোট জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি মেগাওয়াট, তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা চলে এই হিসেবের অনেকটাই পুঁথিগত। তা' ছাড়া এই উৎপাদনে পৌঁছতে বহু বছর লেগে যাবে। কারণ এই হিসেবটা পাওয়া গেছে মোট জলের পরিমাণের সঙ্গে জলপতনের উচ্চতা গুণ করে। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষই জানেন, যে কোন জলপতনের স্থানেই বাঁধ নির্মাণ করা যায় না। তাছাড়া আরেকটি কথা, ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদীগুলি থেকে যে ২০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবার কথা, তার অনেকটাই হয়তো সাম্প্রতিক কালের মধ্যে উৎপন্ন করা যাবে না। তাছাড়া পর্বতময় হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই প্রযুক্তিগত কারণে আপাতত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা সম্ভব হবে না। এসব নানা হিসেব নিকেশ থেকে দেখা যাচ্ছে, মোট ৪৫,০০০ মেগাওয়াট (১০০% লোড ফ্যাক্টরে) পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা। বা ৬০% লোড ফ্যাকটরে ৭৫,০০০ মেগাওয়াট বা ৩০% লোড ফ্যাকটরে ১,৫০,০০০ মেগাওয়াট। এমন কি, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এই সংখ্যাটিও কিছুটা অতিরিক্ত আশাব্যঞ্জক।

হিমালয়ের সুগম অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যেই জলবিদ্যুৎ আহরিত হচ্ছে। এর পরিমাণ প্রায় ৪,০০০ মেগাওয়াট। এছাড়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৬,০০০ মেগাওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ। আরো যে সব প্রকল্পের নির্মাণ চলছে, তারও পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে হিমালয় অঞ্চলে প্রায় ৩,০০০ মেগাওয়াট ও অন্যান্য অঞ্চলে বাদবাকিটা।

সারা ভারতে কতটা জলবিদ্যুৎ আহরণের সম্ভাবনা তার একটি হিসেব দেওয়া হলো।

অঞ্চল	জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা (১৯৭৮ এর হিসেব অনুযায়ী) TWH	যতটা জল-বিদ্যুৎ তৈরি করা গেছে। (১৯৭৯ এর হিসেব অনুযায়ী) TWH	সম্ভাবনার শতকরা কতটা বিকাশ করা গেছে। %	স্থাপিত জল-বিদ্যুতের পরিমাণ MW
উত্তর-অঞ্চল	১৪৭·৩	১৩·৪	৯·১	৩৭১৮
পূর্ব-অঞ্চল	৩৭·৬	৩·০	৮·০	৮৯৫
পশ্চিম-অঞ্চল	৩৭·৭	৬·৬	১৭·৫	১৭৭০
দক্ষিণ-অঞ্চল	৬৮·২	১৬·১	২৩·৬	৪৩০৩
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল	১০৫·৫	০·৪	০·৪	১৪৬

উৎস ঃ প্রসাদ কমিটির রিপোর্ট, প্ল্যানিং কমিশন, ১৯৭৯

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করবার প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার কাঁধে এখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, অনুসন্ধান, গবেষণা, ডিজাইন, প্রজেক্ট-রিপোর্ট তৈরি, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, উৎপাদন, পরিচালন,, জলবিদ্যুৎ-বণ্টন ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব।

নদীর জোয়ার থেকে বিদ্যুৎ

যে সব নদীতে জোরালো জোয়ার আসে, সে সব নদী থেকে অনায়াসে কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে পশ্চিম-বঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় হুগলি নদীর নাম করা যায়। সুন্দরবনে স্থান বিশেষে জোয়ার ভাঁটার উচ্চতার পার্থক্য দেড় থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। জোয়ার ভাঁটার এই উচ্চতার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সমীক্ষা করেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। জানা গেছে, প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও চলতি খরচ কম হবে। যে দু'টি জায়গায় সমীক্ষা চালানো হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই দু'টি জায়গার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।
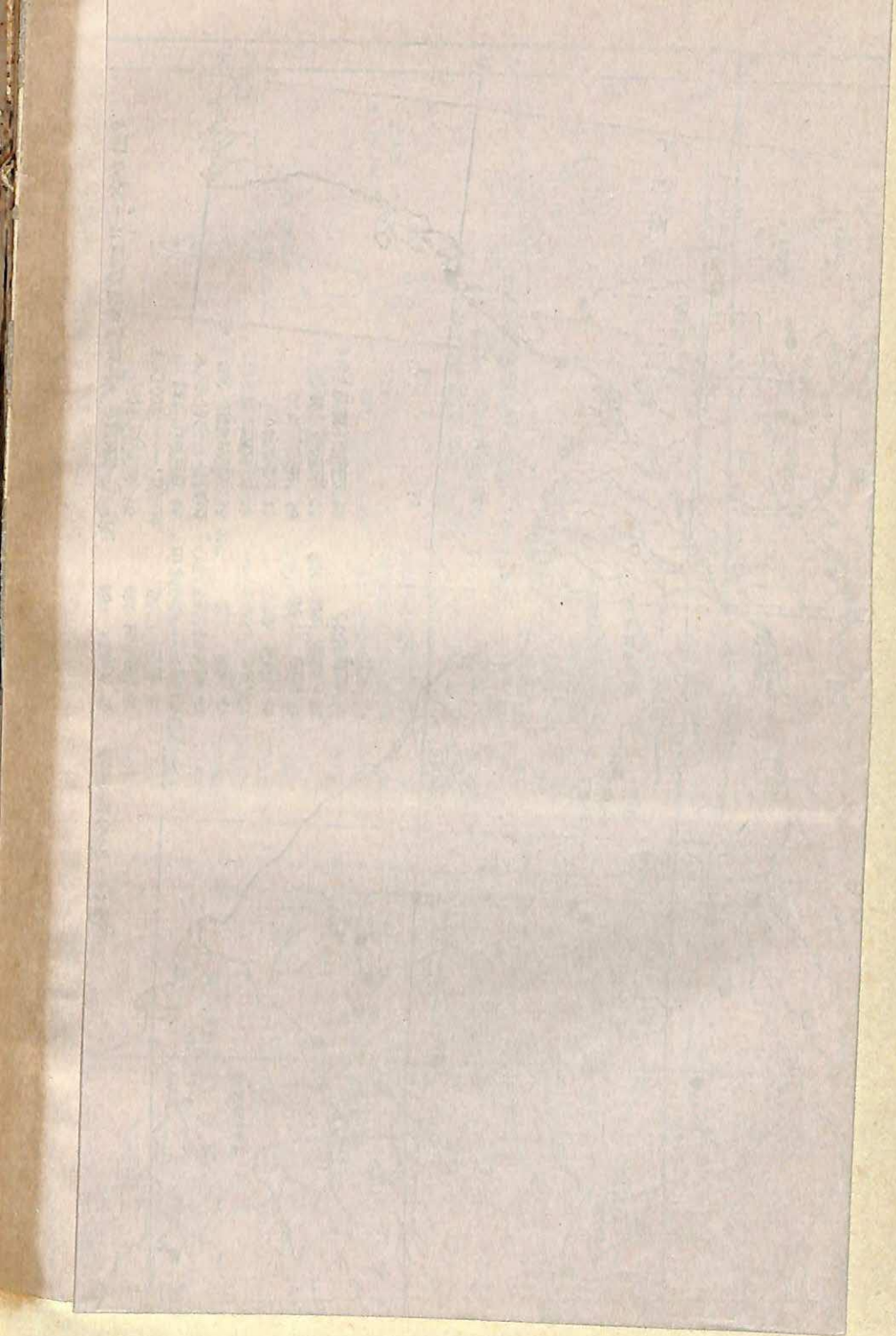
ভারতের অন্যান্য নদীর মোহনা অঞ্চল থেকেও এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

ভারতের কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বর্ণনা

সালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, (জম্মু ও কাশ্মীর)ঃ চন্দ্রভাগা নদীর জলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। জল-পতনের মোট উচ্চতা ৯১ মিটার। ভিত থেকে বাঁধের উচ্চতা ১১২.৫ মিটার, অবস্থান ধ্যানগড় লুপ থেকে একটু উজানের দিকে, স্থানটির উচ্চতা ৪৮৮ মিটার। স্পিলওয়ে (spillway) ও পাওয়ার হাউসের অবস্থান লুপের মাঝামাঝি একটি পাহাড়ের মাথায়। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে তিনটি ইউনিট রয়েছে, প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ১১৫ মেগাওয়াট। জলের যোগান ঠিক থাকলে বার্ষিক ২১২ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। আশা করা যায়, ষষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ প্রকল্পঃ এই প্রকল্প বিপাশার জলপ্রবাহ শতদ্রু নদীতে মিশিয়ে দেবার পরিকল্পনা। মিলনস্থান ভাকরা বাঁধের উজানে। এই মিলনের ফলে যে ৩২৮ মিটার জলপতনের শক্তি পাওয়া গেছে, তা' লাগানো হয়েছে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কাজে। এই প্রকল্পে রয়েছেঃ ১) বিপাশা নদীর বুকে পানদোতে ৭৬ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মাণ; ২) পানদো থেকে বাগগি পর্যন্ত ১৩.১ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ এবং ১২.২ কিলোমিটার দীর্ঘ সুন্দরনগর শতদ্রু টানেল নির্মাণ ৩) শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পারে দেহারে একটি জলবিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্র স্থাপন। এতে চারটি ইউনিট। প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৫ মেগাওয়াট। প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ভাকরার জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ধরে মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বার্ষিক ৩৭৬ কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা।

যমুনা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় (উত্তরপ্রদেশ)ঃ টনস নদীর জল যমুনায় মেশবার সময় যে জলপতনের উচ্চতা (১৮৮ মিটার) পাওয়া যায়, তা' লাগানো হয়েছে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে। প্রথম পর্যায়ে ১২৭ মিটার জলপতনের ওপর ভিত্তি করে ৪৮ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মিত হবে টনস নদীর বুকে ইছারির কাছে। এছাড়া নির্মিত হবে ৬ কিলোমিটার

দীর্ঘ টানেল, যা মাটির নিচের ছিবরো জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে জল নিয়ে যাবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৪ × ৬০ মেগাওয়াট।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিবরো জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৪'৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দু'টি পাওয়ার টানেল দিয়ে জল নিয়ে যাওয়া হবে মাটির ওপরে অবস্থিত খোদারির জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৪ × ৩০ মেগাওয়াট।

হিসেব কষে দেখা গেছে, যমুনা প্রকল্পে (দ্বিতীয় পর্যায়) মোট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বার্ষিক ১১৪ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা। প্রকল্পটি প্রায় শেষ হওয়ার মুখে।

বালিমেলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (ওড়িশা) : সিলেরু নদী থেকে শতকরা যে ৫০ ভাগ জল পাওয়া যাবে, সেই জল লাগানো হবে বালিমেলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। এজন্য সিলেরু নদীর জল বইয়ে দেওয়া হবে কোলাব উপত্যকা দিয়ে। এই প্রকল্পের জন্য যে সব নির্মাণকাজ করতে হবে, তা হলো এই :

(১) সিলেরু নদীর বুকে ৭০ মিটার উঁচু বাঁধ স্থাপন। জলাধারের আয়তন ২৮৩ কোটি ঘন মিটার।

(২) ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল এবং ২ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেল।

(৩) ৬টি ইউনিট-যুক্ত একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রত্যেকটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট।

আশা করা যায় এই প্রকল্প থেকে ১১৮ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

উচ্চ সিলেরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ) : সিলেরু নদীর বুকে ৯১'৫ মিটার জলপতনকে কাজে লাগানো হচ্ছে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। এতে যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, তাতে ৪টি ইউনিট থাকবে। প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ মেগাওয়াট। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রায় ৩৯ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

নিম্ন সিলেরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ) : সিলেরু নদীর বুকে ২৪ কিলোমিটারের ভেতরে ২০১ মিটার জলপতনের শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে এই প্রকল্পে। এই প্রকল্পে যে সব নির্মাণ কাজ রয়েছে তা' হলো :

(১) দোনকারাইতে ৭১ মিটার উঁচু পাথরের (masonry) বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ। জলাধারের আয়তন ৩৮০ কোটি ঘন মিটার।

(২) ১৬ কিলোমিটার লম্বা চ্যানেল ও ২·১২ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ।

(৩) একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র যাতে ৪টি ইউনিট থাকবে। প্রত্যেকটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট। ভবিষ্যতে আরো দু'টি ইউনিট বাড়ানো যাবে।

এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বছরে ১০৭ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

গণ্ডক প্রকল্প (বিহার ও উত্তরপ্রদেশ) ঃ যদিও মূলত জলসেচ ব্যবস্থার প্রতি নজর রেখে এই প্রকল্পটি রচিত, তবু সামান্য পরিমাণ জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এই প্রকল্প থেকে। শুধু বিহার ও উত্তরপ্রদেশ নয়, প্রতিবেশী রাজ্য নেপালও এই প্রকল্প থেকে সেচের জল ও জলবিদ্যুৎ পাচ্ছে। এই প্রকল্পে রয়েছে ঃ

(ক) বিহারের ভাইসালোটানে গণ্ডক নদীর ওপর ৭৪০ মিটার দীর্ঘ ব্যারেজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ১৯৭০ সালে।

(খ) জলসেচের জন্য বেশ কয়েকটি খাল কাটা হয়েছে।

(গ) নেপালের সীমানায় প্রধান পশ্চিম খালের ওপর ১৫ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে এই শক্তিকেন্দ্রটি নেপালকে উপহার দেবার কথা।

এই প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১১১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

উকাই প্রকল্প (গুজরাট) ঃ গুজরাটের এই বহুমুখী প্রকল্পে তাপ্তী নদীর বুকে ৬৮·৬ মিটার উঁচু ও ৪,৯২৮ মিটার দীর্ঘ বাঁধ তৈরি হয়েছে সুরাট জেলার উকাই গ্রামের কাছে। বাঁধের জলাধারের আয়তন ৮৫১ কোটি ১০ লক্ষ ঘন মিটার। বাম তীরের খাল দিয়ে জলাধার থেকে জল নিয়ে ১·৫৩ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের প্রস্তাব রয়েছে। জলাধারের বাদ বাকি জল জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য টারবাইন ঘোরাবে ও নদীখাত ধরে ৮৮ কিলোমিটার বয়ে যাবে নিচের কাকরাপার ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) পর্যন্ত। সেখান থেকে ডান তীরের খাল ধরে সুরাট ও ব্রোচ জেলায় জলসেচের কাজে লাগবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্প থেকে প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ তৈরি হবে।

ইডিক্কি প্রকল্প (কেরালা) ঃ কেরালার পেরিয়ার নদীতে এই জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পের জন্য কানাডা সরকারের সাহায্য পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে তিনটি ১৩০ মেগাওয়াট ইউনিট-যুক্ত শক্তি কেন্দ্র তৈরি হবার কথা। প্রথম পর্যায়ের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৮ কোটি টাকা। পরবর্তী পর্যায়ে শক্তিকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৮০০ মেগাওয়াট।

তাওয়া প্রকল্প (মধ্যপ্রদেশ) ঃ নর্মদার উপনদী তাওয়া। তাওয়া নদীর সঙ্গে এর উপনদী দেনোয়া যেখানে মিলিত হয়েছে, তার এক কিলোমিটারের নিচে একটি বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৩·৩২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হবে। একটি জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রও তৈরি হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা ৪২ মেগাওয়াট। এই প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪৮ কোটি টাকা।

তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ ও করনাটক)ঃ প্রকল্প অনুযায়ী তুঙ্গভদ্রার ওপর একটি পাথরের বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। ২০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বাম তীরের খাল ও ১৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ডান তীরের খাল দু'টি কাটা হচ্ছে। সঙ্গে বাঁদিকে একটি জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৪,০৮,৬৬৯ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ মিলবে। এছাড়া উৎপাদিত হবে ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি। এই প্রকল্পের কাজে আনুমানিক ২০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্প (ওড়িশা) ঃ হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ। বারলার জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রে মোট ছ'টি ইউনিট। এদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৮ মেগাওয়াট। চিপলিমায় আরেকটি যে শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, সেখানে তিনটি ইউনিট। প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ মেগাওয়াট। মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ ২৭০ মেগাওয়াট।

চম্বল বহুমুখী প্রকল্প (মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান) ঃ চম্বল বহুমুখী প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারের যুগ্ম সহযোগিতায়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২০০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)। জলসেচ করা যাবে ৫·৬ লক্ষ হেকটর জমিতে। প্রকল্পের কাজ হয়েছে তিনটি পর্যায়ে।

প্রথম পর্যায়ে যতটা কাজ হয়েছে, তা' হলো গান্ধীসাগর বাঁধ নির্মাণ, বাঁধের পদতলে ২৩-মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন পাঁচ ইউনিটের শক্তিকেন্দ্র স্থাপন,

কোটা ব্যারেজ ও আনুষঙ্গিক খাল নির্মাণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল নদীর ওপর একটি পাথরের বাঁধ (রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধ) ও পদঝাড় উপত্যকায় একটি স্যাডল বাঁধ তৈরি হয়েছে। এ-ছাড়া তৈরি হয়েছে ৪টি ইউনিটযুক্ত (প্রত্যেকটির ক্ষমতা ৪৩ মেগাওয়াট) একটি জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র। ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি ৬০% লোড ফ্যাকটরে উৎপাদিত হচ্ছে।

তৃতীয় পর্যায়ে তৈরি হয়েছে কোটা বাঁধ (যার নতুন নাম জহর সাগর বাঁধ) ও ৪ ইউনিটযুক্ত (প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ৩৩ মেগাওয়াট) একটি শক্তিকেন্দ্র।

সমস্ত কাজ শেষ হলে মোট উৎপাদিত জলবিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হবে ৩৮৬ মেগাওয়াট।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা : জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের (ডি ভি সি) ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এখন (১৯৮২) ডি ভি সি র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০৪ মেগাওয়াট। ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ দামোদর, কোনার ও বরাকর উপত্যকার এলাকায় ব্যাপক ও নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে মোট প্রায় ৩,৭৬০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মোট ১১টি ছোট (mini) এবং অণু (micro) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে যা থেকে ৩,৪৭০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। দামোদর উপত্যকায় ২৫,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে তিনটি প্রধান নদী ও ২,৫০০ কিলোমিটার সেচ-খাল রয়েছে। এসব নদী ও খালের মধ্য দিয়ে যে জল প্রবাহিত হয়, তা থেকে অনেক ছোট ও অণু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

দামোদর উচ্চতর উপত্যকায় অন্তত পক্ষে তিনটি ছোট প্রকল্প স্থাপন করা যায়। গিরিডির কাছে উসরি প্রপাত অণুজলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২৫ কিলোওয়াটের তিনটি ইউনিট এবং কোনার অণু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২৫০ কিলোওয়াটের দু'টি ইউনিট বসানো যেতে পারে। এই তিনটি কেন্দ্র থেকে বছরে মোট ৪,৭৩০ মেগাওয়াট-ঘণ্টা (MWH) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে (অমিতাভ সেন, ধনধান্যে, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩)।

উত্তরবঙ্গের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প : এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন নদী থেকে অন্ততপক্ষে ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। তিস্তার উপনদী জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এই

প্রচেষ্টারই প্রথম সফল রূপায়ণ। জলঢাকা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৩৬ মেগাওয়াট ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। প্রস্তাবিত তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষমতা হবে ৬০০ মেগাওয়াট। এছাড়া রয়েছে প্রস্তাবিত রম্মম প্রকল্প (১০৩ মেগাওয়াট), মংপু প্রকল্প (৫'৬ মেগাওয়াট), রানবাং প্রকল্প (৪ মেগাওয়াট), রিনচিংটন প্রকল্প (২ মেগাওয়াট) ও লিটল রঙ্গিত প্রকল্প (২ মেগাওয়াট)।

বিভিন্ন নদী উপত্যকায় জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা

১. সিন্ধু

সিন্ধু নদ উপত্যকার জলসম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হয়েছে মূলত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশের ভাগে কতটা জল পাওয়া যাবে এই হিসেবের ওপর। তাছাড়া জলসেচের জন্য কতটা জল প্রয়োজনীয় – এই হিসেবটাও সমীক্ষার আওতায় রাখা হয়েছে।

সিন্ধু নদের উৎস অঞ্চল কিছুটা দুর্গম। তাই এই সব দুর্গম ও তুষারে ঢাকা অঞ্চলে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা এই হিসেবের মধ্যে রাখা হয়নি।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনার দিক দিয়ে সিন্ধু নদের যে উপনদীটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো চেনাব (chenab) বা চন্দ্রভাগা নদী। কারণ ৩০০ কিলোমিটার যাত্রাপথে চন্দ্রভাগার জল ২,৫০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। চন্দ্রভাগা দিয়ে সবচেয়ে কম পরিমাণ যে জল প্রবাহিত হয়, সেই জলের ১,৮০০ মিটার পতনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মোট যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে তার পরিমাণ প্রায় ৩,২৫০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)।

শতদ্রু নদীর ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পে ১,২০৪ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা। এই শতদ্রু নদীর সঙ্গে বিপাশাকে জুড়লে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষমতা হবে ২,৫০০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)।

ঝিলম নদী থেকেও ১,০০০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে) পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। রবি নদী থেকে হিমালয় প্রদেশের চামেরা ও থেইন বাঁধ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এর আনুমানিক পরিমাণ ৫০০ মেগাওয়াট।

সুতরাং সব মিলিয়ে সিন্ধু নদের উপত্যকায় অন্ততপক্ষে ৭,০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে।

২. গঙ্গা

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ পারের উপনদীগুলিতে জলবিদ্যুৎ শক্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শোন নদী। এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বিকাশ এককভাবে না করে সমষ্টিগত ভাবে করা উচিত, যাতে গঙ্গার নিচের দিকে কৃষিকাজের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। চম্বল উপত্যকায় ৩৮১ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ও রিহন্দ নদীতে ৪০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎকেন্দ্র—এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প।

হিমালয়-জাত উপনদীগুলির উজানের দিকে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করবার মতো তেমন কোন জায়গা পাওয়া শক্ত, কারণ এই অঞ্চলে গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত। তবু এরই মধ্যে কিছুটা নিচের দিকে নদী উপত্যকায় কিছু কিছু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, হিমালয়ের পাদদেশে হিমালয়-আগত উপনদীগুলির কয়েকটির গর্ভে ১৬০—২০০ মিটার উঁচু বাঁধ ও জলাধার তৈরি করা সম্ভব। তবে এগুলি তৈরি করবার আগে আরো বিশদ সমীক্ষা চালাতে হবে। এই উপনদীগুলির অববাহিকা অঞ্চল মূলত বরফ-গলা জলে পরিপুষ্ট এবং কেবলমাত্র শীতকাল ছাড়া অন্য সময় পর্যাপ্ত জল প্রবাহিত হয় নদীখাতে। ফলে এসব ছোটখাট বাঁধ থেকেও পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

হিমালয়-জাত কয়েকটি উপনদী নেপালের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি নদী যেমন সারদা (যা নেপাল ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করছে), কারনালি, কোশি সম্পর্কে বিশদ সমীক্ষা চালিয়েছে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন।

গঙ্গা নদী উপত্যকায় পরিকল্পিত ৬০টি প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে মোট জলবিদ্যুতের পরিমাণ হিসেব করা হয়েছে ১৩,০০০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)। এর মধ্যে ভারতের ভাগে পড়েছে ৬,০০০ মেগাওয়াট, বাদবাকিটা নেপালে।

৩. ব্রহ্মপুত্র

ব্রহ্মপুত্রের হিমালয়-আগত উপনদীর উজানে জলাধার তৈরির তেমন কোন জায়গা নেই, তাই এসব নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মূলত নির্ভর করতে হবে নদীর জলস্রোতের ওপর। তিস্তা, কামেং, ডিহাং, লোহিত ও ডিবাং নদীতে যথেষ্ট জল রয়েছে এবং হিমালয় পাহাড় থেকে ধাপে ধাপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে এসেছে। ফলে এসব নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা অঢেল। বিশেষত এদের মধ্যে দু' একটি নদী থেকে যে কী বিরাট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে তার আর কোন শেষ নেই। ডিহাং, লোহিত ও ডিবাং—এই তিনটি নদী থেকে অন্ততপক্ষে ৮,০০০ মেগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এতটা পরিমাণ জলবিদ্যুৎ সত্যিই উৎপাদন করা হবে কিনা সন্দেহ।

যেখানে ব্রহ্মপুত্র (ডিহাং) ইংরেজি ইউ (U) অক্ষরের মতো বাঁক নিয়ে তিব্বত থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানে তিব্বতীয় মালভূমির ৩,৩৫০ মিটার উচ্চতা থেকে ঝট করে নেমে এসেছে ৮০০ মিটার উচ্চতায়। ফলে জলপতনের উচ্চতা এখানে ২,২০০ থেকে ২,৫০০ মিটার। আর জল-নির্গমনের পরিমাণ প্রায় ১,০০০ কিউমেকের মতো। তিব্বতীয় মালভূমি থেকে ব্রহ্মপুত্রের জল ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলের মাধ্যমে পরে নদীর ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে প্রায় ৩০,০০০ মেগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। আরো উঁচুতে বাড়তি দু'য়েকটি জলাধার তৈরি করে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তবে এ অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে কোন প্রকল্পই ভারত ও চীন—এই দু'দেশের যৌথ প্রচেষ্টায় হওয়া উচিত।

যে সব নদী শিলং মালভূমি হয়ে নিচের সমভূমিতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেসব নদীরও যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যেসব নদী শিলং মালভূমি থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয়ে বাংলা-দেশের সুর্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেসব নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে আরো বেশি।

শিলং মালভূমিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। জলাধার তৈরি করে জল ধরে রাখার সুযোগও যথেষ্ট। মালভূমি থেকে সমতলে পেঁছতে নদীগুলিকে ১,২০০ মিটার নামতে হয়েছে। সুতরাং

বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, এই অঞ্চলের নদীগুলিতেও যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

মণিপুরের বরাক ও মণিপুর নদীর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও প্রচুর। মণিপুর নদী যে লোকটাক হ্রদের ভেতর দিয়ে পেরিয়েছে, সেই হ্রদের জল একটি টানেলের ভেতর দিয়ে ৩১৩ মিটার নিচে পড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে প্রায় ১০৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎশক্তি।

পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে প্রায় ১৪,০০০ মেগাওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎশক্তি (৬০% লোড ফ্যাকটরে) উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে ১২,০০০ মেগাওয়াট ভারতেই পাওয়া যাবে। এই অঞ্চলে জলসেচ করার প্রয়োজন বা সুযোগ কোনটাই নেই, তাই এই নদীগুলি থেকে কেবল জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে ওপরের জলাধারগুলির জল ধারণের ক্ষমতা বাড়িয়ে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৪. সাবরমতী

সাবরমতী নদীতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৫. মাহী

মাহী নদীর বাঁসোয়ারা ও কাদানা বাঁধের মোট জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০০ মেগাওয়াট।

৬. নর্মদা

বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদা নদীতে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। নর্মদার বুকে কত বড় জলাধার নির্মাণ করা যাবে, তার ওপর নির্ভর করবে এই অঞ্চলে কতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। নর্মদা নদীর মাঝামাঝি পুনাসা ও আরো কয়েকটি জলপ্রপাতের কাছে বাঁধ তৈরি করে প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎশক্তি (৬০% লোড ফ্যাকটরে) উৎপাদন করা সম্ভব।

৭. তাপ্তী

এই নদী থেকে ৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। তবে মূলত উকাই বাঁধ থেকেই প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

৮. সুবর্ণরেখা

এই নদীর জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মোট ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াটের চেয়েও কম।

৯. ব্রাহ্মণী

ব্রাহ্মণী নদীর উজানের দিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট; এই নদীর জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ১,০০০ মেগাওয়াট। নদীবাঁধের জলাধার একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগলেও অন্যদিকে জলসেচের কাজেও সহায়ক হতে পারে।

১০. মহানদী

জন্মের পর থেকেই মহানদী মোটামুটিভাবে সমতলভূমিতে প্রবাহিত। তাই নদীর উজানের দিকে বাঁধ তৈরি করবার মতো তেমন কোন জায়গা নেই। তাই এই অংশে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলবার কোন সুযোগ নেই। তবে মাঝামাঝি অংশে মহানদী প্রবাহিত হয়েছে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে। ফলে এই অংশে বাঁধের জলাধার ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার সুযোগ আছে যথেষ্ট। তা'ছাড়া বাঁধের জলে জলসেচও সম্ভব। ২৭০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন হীরাকুঁদ প্রকল্প এই অঞ্চলের প্রথম প্রয়াস। এই বহুমুখী প্রকল্প থেকে একই সঙ্গে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। হীরাকুঁদ বাঁধের নিচের অংশে আরো কোথায় বাঁধ তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে সমীক্ষা চলছে। এখনো পর্যন্ত যতটুকু জানা আছে, তা থেকে অনুমান করা যায়, এই নদীর জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ১,০০০ মেগাওয়াট।

১১. গোদাবরী

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে গোদাবরী নদীর চেয়েও সম্ভাবনা বেশি ওর তিনটি উপনদীর (প্রাণহিতা, ইন্দ্রবতী ও শবরী)। এই তিনটি নদীর সঙ্গে মিলিত হবার পরে গোদাবরী নদী প্রবেশ করেছে পূর্বঘাট পর্বতের গিরিখাতে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক থেকে এই তিনটি উপনদীর উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব। এসব উপনদীতে জলাধার তৈরি করে তা' থেকে একই সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচ করা সম্ভব। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই নদী-উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট সম্ভাব্য পরিমাণ ৬,০০০

মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে)। তবে এটা ঠিক, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধান করে এতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নিঃসন্দেহে নতুন নজির স্থাপন করবে। এর মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, সেগুলো হলো শবরী নদী উপত্যকায় ৩৬০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বালিমেলা বিদ্যুৎ-প্রকল্প ও সিলেরু নদীতে ৮৪০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

১২. কৃষ্ণা

কৃষ্ণা নদীর উৎসমুখের কাছে পশ্চিমঘাট পর্বতের পূব দিকের ঢাল খুবই কম। ফলে এখানে জলাধার তৈরি করা সহজ। তবে পশ্চিম ঢালে প্রায় ৬০০ ফিট জলপতনের সুবিধে থাকায় ওদিকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

টাটা কোমপানির প্রয়াসে ভীরা (১৩২ মেগাওয়াট), ভীভপুরি (৭০ মেগাওয়াট) ও খোপলী (৭০ মেগাওয়াট)—এই তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে বর্তমান শতকের প্রথমদিকে। এই জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প-গুলি তৈরি করতে পূর্বগামী নদীর জলধারাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমদিকে। সাম্প্রতিক কালে ৮৬০ মেগাওয়াট কয়না জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করতেও পূর্বমুখী জলধারার দিক পরিবর্তন করে পশ্চিমমুখী করতে হয়েছে।

এক উষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণা নদী প্রবাহিত। এই অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীর জল মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে জলসেচের কাজে। সুতরাং জল-সেচের প্রয়োজনে যে সব বাঁধ তৈরি হবে, তা' থেকেই কিছু কিছু জলবিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া এখানে পূর্বমুখী জলধারার দিক পরিবর্তন করেও জলবিদ্যুৎ তৈরির তেমন সুযোগ নেই। তুঙ্গভদ্রা নদীতে ১৩০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, কৃষ্ণা ও ভীমা নদীতে ৪০০-মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। কৃষ্ণা নদীর বুকে ৭৭০ মেগাওয়াট শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

কৃষ্ণা নদীর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট সম্ভাব্য পরিমাণ প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট।

১৩. পেন্নার

এই নদীর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই।

১৪. কাবেরী

কাবেরী উপত্যকার ভেতরে নীলগিরি পাহাড়েই জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ১,৮০০ মিটার উঁচু নীলগিরি পাহাড় থেকে যে অজস্র জলধারা নেমে এসেছে, তার জল জলাধারে সঞ্চিত করে ১,৬০০ মিটার জলপতনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর জলবিদ্যুৎশক্তি তৈরি হচ্ছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৫৫০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন কুন্দা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

সব মিলিয়ে চোদ্দটি প্রধান নদীর জলবিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনা ৩৬,০০০ মেগাওয়াট (৬০% লোড ফ্যাকটরে) অথবা বার্ষিক ১৯,০০০ কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা।

মাঝারি ও ছোট নদী উপত্যকা

পশ্চিমঘাট পর্বতের চড়া ঢালে বহু নদীর সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-বাহিত বৃষ্টিপাতের ফলে। আরব সাগরগামী এইসব খরস্রোতা নদীতে খুব কম খরচায় জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে। তবে গোয়ার উত্তরে যেসব নদী আরব সাগরে মিশেছে, সেসব নদীতে উজানের দিকে পাহাড়ে জলাধার তৈরির তেমন কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তাই এই অঞ্চলে বড় আকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ। গোয়ার দক্ষিণে আরব সাগরে মিশেছে যেসব নদী, উজানের দিকে এসব নদী মোটামুটিভাবে ৪৫০-৬০০ মিটার উঁচু মালভূমিতে প্রবাহিত। সমীক্ষকদের মতে, এখানে তৈরি করা সম্ভব বেশ কিছু জলাধার, যার ওপর ভিত্তি করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাহাড়ী অঞ্চলের নদীগুলি থেকে সস্তায় বহু পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এ ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৮৯১ মেগাওয়াট শারাবতী প্রকল্প, ৩০০ মেগাওয়াট শবরীগিরি (পাম্বা) প্রকল্প, ৭৮০ মেগাওয়াট ইডিক্কি প্রকল্প এবং ১০০০ মেগাওয়াট কালিনদী প্রকল্প (৬০% লোড ফ্যাকটরে)। এ ধরনের তিরিশটি প্রকল্প থেকে মোট ৪,৫০০ মেগাওয়াট পরিমাণ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন নদী উপত্যকাগুলিতে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রকৃত ক্ষমতা ও উৎপাদনের হিসেব দেওয়া হলো নিচে।

নদীর নাম	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা (মেগাওয়াট)	যতটা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংস্থান রাখা হয়েছে (মেগাওয়াট)	যতটা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে (মেগাওয়াট)	আরো যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে (মেগাওয়াট)
সিন্ধু	৭,০০০	৩,০৩৯	২,৩৭০	৪,৬৩০
গঙ্গা	৫,০০০	১,৮৯৯	১,১২৭	৩,৮৭৩
ব্রহ্মপুত্র	১২,০০০	২৭৬	১৫২	১১,৮৪৮
সাবরমতী	০	০	—	—
মাহী	১০০	০	—	১০০
নর্মদা	১,০০০	০	—	১,০০০
তাপ্তী	৩০০	৩০০	১১৫	১৮৫
সুবর্ণরেখা	১০০	১৩০	২৬	৭৪
ব্রাহ্মণী	১,০০০	০	০	১,০০০
মহানদী	১,০০০	২৭০	২০০	৮০০
গোদাবরী	৬,০০০	১,৩৫৫	৬৬২	৫,৩৩৮
কৃষ্ণা	১,৫০০	১,৮৯৩	১,০৯৬	৪০৪
পেন্নার	০	০	—	—
কাবেরী	১,০০০	৯৪০	৫৮৬	৪১৪
মাঝারি ও ছোট নদী উপত্যকা	৫,০০০	৩,৮৮১	২,৯৮৭	২,০১৩
মোট	৪১,০০০	১৩,৯১৩	৯,৩২১	৩১,৬৭৯

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জলবিদ্যুৎ শক্তি

পৃথিবীর সমস্ত দেশের জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মোট ক্ষমতা প্রায় ৪২,০০,০০০ মেগাওয়াট বা বার্ষিক ২৩,০০০ $\times$ ১০^{৯} কিলোওয়াট ঘণ্টা। ভারতের মোট ক্ষমতার শতকরা মাত্র এক ভাগ।

কিন্তু সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত জলশক্তির পরিমাণ বার্ষিক ১,১৭৮ × ১০৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা যা মোট ক্ষমতার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। ভারতে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ১২২ × ১০৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৭০ এবং ১৯৭৭ সালে কতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো তার হিসেব নিচের তালিকায় দেওয়া হলো। সারা পৃথিবীতে (১৯৭০) বার্ষিক যে মোট ৪৯১০ × ১০৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়, তার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগই হলো জলবিদ্যুৎশক্তি। এর মধ্যে লক্ষ করার মতো ব্যাপার এই, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির শতকরা ৭০ ভাগই জলবিদ্যুৎশক্তি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের হিসেব

দেশ	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)
	১৯৭০		১৯৭৭	
১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৫,৮৩৬	২,৫১,১০৭	৬৮,৯৩৩	২,২৩,৯৩৪
২. কানাডা	২৮,২৯৯	১,৫৬,২৮৫	৪০,০৮৭	২,২০,১৫০
৩. সোভিয়েট রাশিয়া	৩১,৩৬৮	১,২৪,৩৭৭	৪৫,২১৯	১,৪৭,০১৪
৪. জাপান	২০,০৭৫	৭৯,৮৭৯	২৬,০৯৯	৭৬,৩৭৩
৫. নরওয়ে	১২,৭৮৩	৫৭,২৬১	১৭,৪০৮	৭২,২৯২
৬. ফ্রান্স	১৫,২১৯	৫৬,৬১২	১৮,৪১৬	৭৭,২৯৭
৭. ইতালি	১৫,৩৬৪	৪৪,০২৫	১৫,২৭৮	৫২,৭২৬
৮. সুইডেন	১০,৮৬২	৪১,৫৩৮	১২,৯৬৫	৫৩,৫২৪
৯. ব্রাজিল	৮,৮২৯	৩৯,৮৬৩	১৯,০৩৮	৯২,৯৪৩
১০. চীন	জানা নেই	৩২,৮৪৬	—	—
১১. সুইজারল্যান্ড	৯,৬২০	২৯,৩৩০	১০,৫৯৪	৩৬,২৯০

দেশ	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)
	১৯৭০		১৯৭৭	
১২. স্পেন	১০,৮৮৩	২৭,৯৫৯	১৩,০৯৬	৪০,৭৪১
১৩. ভারত	৬,৪৫৮	২৩,২১৫	৯,৩৫৩	৩৬,১৭৬
১৪. অসট্রিয়া	৫,৪৬৭	২১,২৪০	৭,৬৩০	২৪,৮৭১
১৫. পশ্চিম জারমানি	৪,৭৭৯	১৭,৭৫৮	৬,০১৩	১৭,৫৮৮
১৬. মেকসিকো	৩,৩৭০	১৪,৯৯২	৪,৭৯৪	১৯,০৭৬
১৭. যুগোশ্লাভিয়া	৩,৩২৭	১৪,৭৪১	৫,২২৬	২৪,৩৫৪
১৮. উত্তর কোরিয়া	জানা নেই	১৪,৫০০	—	—
১৯. নিউজিল্যাণ্ড	৩,১৬৩	১২,৪৫১	৩,৬১৭	১৪,৫৮৯
২০. অসট্রেলিয়া	৩,৫৯২	১০,১৭৩	৫,৫৩৯	১৩,৭১৪
২১. ফিনল্যাণ্ড	২,১২৫	৯,৪৩৪	২,৩৯০	১১,৯৬৭
২২. কলামবিয়া	১,৪৮০	৬,৫৫০	২,৩৭০	১০,৩৫০
২৩. পরতুগাল	১,৫৫৬	৫,৭৯৪	২,৫৮০	৯,৬৮৩
২৪. ইংলণ্ড	২,১৫৮	৫,৬৬৬	২,৪৫১	৫,২৩২
২৫. দক্ষিণ রোডেশিয়া	৭০৫	৫,২৪৭	৭০৫	৩,৪৫২
২৬. চিলি	১,০৬৭	৪,৩০৭	১,৪৭৪	৬,৫০২
২৭. মিশর	১,৯২০	৪,০০০	২,৪৪৫	৮,৮০০
২৮. চেকোস্লোভাকিয়া	১,৫৪২	৩,৬৭০	১,৮০৩	৪,৩৭৫
২৯. পাকিস্তান	৭৭৪	৩,৫০০	৮৬৭	৪,৯২০
৩০. পেরু	১,০১৫	৩,৩৫০	১,৪১৫	৬,০৯৮
৩১. ভেনেজুয়েলা	৫০০	৩,২২৫	২,৩৫০	১১,৯৩৪
৩২. তুর্কী	৭২৩	৩,০২৮	১,৮৭৩	৮,৫৯২
৩৩. জাইরে	৮১০	২,৯২০	১,১৫৯	৪,০১৫
৩৪. ঘানা	৫১২	২,৮৮২	৭৯২	৪,২৪৮

দেশ	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)	জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রকৃত উৎপাদন (হাজার কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)
	১৯৭০		১৯৭৭	
৩৫. রুমানিয়া	১,২০০	২,৭৭৩	২,৯৮৪	৯,২৫৮
৩৬. গ্রীস	১,০৪১	২,৬৩০	১,৪১৫	১,৯২৩
৩৭. বুলগেরিয়া	৮১৬	২,১৫২	১,৮৬৮	৩,৫২৯
৩৮. ফিলিপাইন	৬১২	১,৯০০	১,১৬০	৪,৮৫০
৩৯. পোলান্ড	৭৭১	১,৮৮৭	৭৯৭	২,৩৯৪
৪০. ইরান	৬৫০	৯,৬২৫	৮৫০	৪,০০০
৪১. আরজেনটিনা	৬০৯	১,৫৬০	১,৯৪৫	৫,৭৭১
৪২. উরুগুয়ে	২৫০	১,৫০০	২৪৫	১,৫৬৭
৪৩. থাইল্যান্ড	৪৫১	১,৫০০	৯৩০	৪,২৭০
৪৪. আয়ারল্যান্ড	২১৯	১,৪২০	৫১১	১,০১৯
৪৫. নাইজেরিয়া	৩২০	১,০৬৫	৪২০	২,৫৭৫
৪৬. মরক্কো	৩০০	১,০৩৩	৩৯৬	১,৩৪২
৪৭. পূর্ব জারমানি	৭১০	১,২৫১	৭৪৮	১,২৪৯
৪৮. দক্ষিণ কোরিয়া	৩২৯	১,২১৭	৭১১	১,৩৯৩
৪৯. মালয়েশিয়া	২৯৩	১,২০২	৩৫০	১,০১১
৫০. ইনদোনেশিয়া	৩১০	১,২০০	৫৫০	২,২০০
৫১. ক্যামেরুন	১৫২	১,১৪৫	—	—
৫২. সুরিনম	১৮০	১,০০০	—	১,২১৫
৫৩. বাংলাদেশ	—	—	১১০	৫৩০

সারা পৃথিবীর জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পর্যালোচনা করে দেখা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় সবটাই ব্যবহার করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হলো।

সোভিয়েট রাশিয়া

১৯২০ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ৫,০০,০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উল্লেখ করার মতো ঘটনা এই যে সে সময় সোভিয়েট রাশিয়াতেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের মতোই ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাশিয়া ভারতকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ ১,৭০,০০০ মেগাওয়াট এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১০০০,০০,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা। এর মধ্যে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ১২৫,০০,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এখন সাইবেরিয়ায় বহু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে।

ইউরাল পর্বত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাইবেরিয়ার আয়তন প্রায় এক কোটি বর্গ কিলোমিটার। সাইবেরিয়ার নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওব, ইনেসি, লেনা, আমুর, আঙ্গারা ইত্যাদি। ইনেসি ও আঙ্গারা নদীতে বেশ কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সোভিয়েট রাশিয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে। ইরকুটস্ক, ব্রাটস্ক ও ক্রাসনায়ারস্কে বেশ কিছু বড় বাঁধ তৈরি হয়েছে। কেবলমাত্র আঙ্গারা নদীর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষমতা ১৩,০০০ মেগাওয়াট।

বৈকাল হ্রদে তৈরি হয়েছে ইরকুটস্ক বাঁধ (উচ্চতা ৪৪ মিটার) ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। এতে ৮ টি ইউনিট আছে। প্রত্যেকটির বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষমতা ৮২·৫ মেগাওয়াট। এখানে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

বৈকাল হ্রদের ৪৩৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত আঙ্গারা নদীতে তৈরি হয়েছে ব্রাটস্ক বাঁধ। বাঁধটি ১২৫ মিটার উঁচু ও জলাধারের আয়তন ১৭,৯০০ কোটি ঘন মিটার। বাঁধের সঙ্গে যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রয়েছে তাতে ২০ টি ইউনিট। এদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৫০০ মেগাওয়াট। বার্ষিক ২,২৬০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

ইনেসি নদীর বুকে তৈরি হয়েছে ক্রাসনায়ারস্কায়া বাঁধ। জলাধারের আয়তন ৭,৩০০ কোটি ঘন মিটার। এখানে যে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হয়েছে তার মোট ক্ষমতা ৫,০০০ মেগাওয়াট। এখানে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট ১০টি ইউনিট রয়েছে। এত বিরাট আকারের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র

পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

তবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এতটা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এখানে বার্ষিক মাত্র ১,৬০০ থেকে ১,৮০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। কারণ সারা বছরে এখানে মাত্র ৪,৫০০ ঘণ্টা কাজ হচ্ছে, অথচ ব্রাটস্ক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৬,০০০ ঘণ্টা মেশিন চালু রয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার জলবিদ্যুৎ ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছে। সারা পৃথিবীতে এখন যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়, তার শতকরা ২৫ ভাগই উৎপাদিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৭১ সালে আমেরিকায় মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১,৬৪০X১০৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ ২৫১X১০৯ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

আমেরিকার মধ্যে কলামবিয়া নদীতেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। ১৯৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ কলামবিয়া নদীর অববাহিকার আয়তন ৬,৭১,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কানাডায়, বাকিটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। প্রশান্ত মহাসাগরগামী এই নদীতে শীতকালে জলপ্রবাহের পরিমাণ ১৪০০ কিউমেক (সেকেণ্ডে ঘন মিটার) ও বসন্তকালে ১৮,৪০০ কিউমেক। এই নদীতে ১৬৭ মিটার উঁচু গ্র্যাণ্ড কুলি বাঁধ তৈরি হয়েছে ১৯৪১ সালে। এর জলাধারের আয়তন ১,১৭২ কোটি ঘন মিটার। তারপর আরো ৮টি বাঁধ তৈরি হয়েছে মূল কলামবিয়া নদীতে ও আরো অনেক বাঁধ এর উপনদীগুলিতে। মূল নদীর বুকে কানাডার অংশে আরো ৩টি (১৯৭১) বাঁধ তৈরি হচ্ছে। গ্র্যাণ্ড কুলি বাঁধের মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬,০০০ মেগাওয়াট। এই নদী উপত্যকার মোট সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ৪১,০০০ মেগাওয়াট। অবশ্য এর মধ্যে ৬,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদিত হবে কানাডার অংশে।

অসট্রেলিয়া

অসট্রেলিয়াতে প্রচুর কয়লা থাকা সত্ত্বেও জলবিদ্যুৎশক্তির বিকাশের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন, স্নোয়ি নদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পে ৯টি বাঁধ, ১০টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি

হয়েছে। স্লোয়ি নদীর বুকে ইউকামবেনে জলাধারের আয়তন ৪৩২ কোটি ঘন মিটার। এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৫০০ মেগাওয়াট। আরো কয়েকটি জলাধার তৈরি করে জলবিদ্যুৎ ক্ষমতা বাড়াবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নাইজিরিয়া, আফরিকা

নাইজার নদীর মোহনা থেকে ১,০০০ কিলোমিটার উজানে কেনজি দ্বীপে বাঁধ তৈরি হয়েছে ১৯৬৮ সালে। জলাধারের আয়তন ১৫০ কোটি ঘন মিটার। ১২টি ইউনিট নিয়ে তৈরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৯৬০ মেগাওয়াট। এই প্রকল্প থেকে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌ-চলাচলের বন্দোবস্তও রাখা হয়েছে।

এ ছাড়াও আরো দু'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। জেবাতে যে বাঁধ তৈরি হচ্ছে, তার জলাধারের আয়তন ৯০০ কোটি ঘন মিটার। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ মেগাওয়াট।

কাডুনা ও নাইজার নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ১৬০ কিলোমিটার উজানে শিরোরো গিরিখাতে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে। এখানে জলাধারের আয়তন ২৫০ কোটি ঘন মিটার এবং জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮০ মেগাওয়াট।

এই অঞ্চলে নাইজার নদীতে তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,৯৪০ মেগাওয়াট হলেও প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন করা যাবে কেবলমাত্র ১,৭৩০ মেগাওয়াট (৫৫% লোড ফ্যাকটরে)।

ঘানা, আফরিকা

ঘানার রাজধানী আকরা থেকে ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভোলটা নদীর বুকে আকোসোমবোতে ১৪১ মিটার উঁচু একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে ১৯৬৫ সালে। জলাধারের আয়তন ১৪,৮০২ কোটি ঘন মিটার। এটি সারা বিশ্বে মানুষ নির্মিত বাঁধের মধ্যে চতুর্থতম। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ৬টি ইউনিট আছে। প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২৮ মেগাওয়াট। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬৮ মেগাওয়াট। বার্ষিক ৫৪০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

জামবিয়া

জামবিয়া ও দক্ষিণ জিনবাবের সীমানায় জামবেসি নদীতে কারিবা

গিরিখাতের ৩ কিলোমিটার নিচে কারিবা বাঁধ তৈরি হয়েছে। বাঁধটি প্রায় ১২৮ মিটার উঁচু। জলাধারের আয়তন ১৬,০৩৫ কোটি ঘন মিটার হবে বন্যার সময় আরো ২,৩৪৪ কোটি ঘন মিটার জল ধরে রাখতে পারে। আয়তনে জলাধারটি পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম।

জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে মাটির নিচে। এতে ৬টি ইউনিট, প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট। প্রায় ৬০০ কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

জামবেসির উপনদী কাফনে নদীতে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট।

ইথিয়োপিয়া

১৯৭১ সালের হিসেব অনুযায়ী ইথিয়োপিয়ার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ১৯০ মেগা-ওয়াট।

এদেশের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায় আওয়াশ উপত্যকা থেকে। এই অঞ্চলের প্রথম বাঁধটি তৈরি হয়েছে আদ্দিশ আবাবার ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কোকা নামে একটি জায়গায়। জলাধারের আয়তন ১৮৪ কোটি ঘন মিটার। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট।

কোকা থেকে ২৫ কিলোমিটার নিচে আওয়াশ-২ প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছে এবং ২·৩ কিলোমিটার নিচে নির্মিত আওয়াশ-৩ প্রকল্পটি। দু'টি কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬ মেগাওয়াট। বার্ষিক ৩৬ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

নীল নদীর উপত্যকায় ফিনচাতে যে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, তাতে তিনটি ইউনিট। এখানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫ মেগা-ওয়াট।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকায় কয়লা পাওয়া যায় না। তাই স্বাভাবিক কারণেই জল-বিদ্যুৎই প্রধান ভরসা। মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ কোটি মেগাওয়াট। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শ্রীলংকায় প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

কেলানি গঙ্গা ও তার দু'টি উপনদী—মাসকেলিয়া ওয়া ও কেহেলগামু ওয়া এই দুটি নদীতে জলপতনের শক্তিকে (প্রায় ৯৮০ মিটার) কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

মহাবলী গঙ্গাতে ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে জলবায়ুর বৈচিত্র্য থাকবেই। এখানে কোথাও অতিবৃষ্টি, আবার কোথাও বা অনাবৃষ্টি। স্বভাবতই অতিবৃষ্টির জায়গায় দেখা যায় প্রায়ই বন্যা, আর অনাবৃষ্টির জায়গায় খরা। জলের প্রধানতম ব্যবহার কৃষিতে, যে কৃষি জোগাচ্ছে আমাদের জীবন ধারণের ফসল। ভারতের মোট ৩২·৮ কোটি হেকটর জমির মধ্যে ১৯·২ কোটি হেকটর পরিমাণ জমিতে চাষ হচ্ছে। তবে এর মধ্যে কেবল ৬·১৬ কোটি হেকটর পরিমাণ জমিতে জলসেচের সুবিধে রয়েছে (১৯৮২)।

ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নানা কারণে প্রায়ই কম বেশি হয়। তাই চাষের জমিতে জলসেচের প্রয়োজনে ভারতের নদীগুলিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের নদীগুলিকে জলপ্রবাহের দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত উত্তর ভারতের নদী—যাদের জন্ম তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতে। এ সব নদীতে সারা বছরই জল থাকে, যদিও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলপ্রবাহের পরিমাণ কমে বাড়ে। দ্বিতীয় ধরনের নদীর অবস্থান মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। এসব নদীর জলপ্রবাহ মূলত বর্ষার বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তাই উত্তর ভারতের নদীর ওপর জলসেচের জন্য কিছুটা নির্ভর করা চলে কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের নদী থেকে জলসেচের জন্য জলাধার তৈরি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বর্তমান ভারতের জলসেচের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবার আগে অতীতের দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। কারণ বর্তমানের চাবিকাঠি রয়েছে অতীতের সিন্দুকে।

প্রাচীন ভারতে জলসেচ

প্রাচীন ভারতে যে জলসেচের ব্যাপক আয়োজন ছিল, তার অজস্র প্রমাণ চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার মতো বড় শহর যে শুষ্ক অঞ্চলে গড়ে উঠতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ, সে যুগে জল-সেচের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, জলবাহী খাল-উদ্বোধনের

সময় কী কী আচারবিধি পালন করতে হবে সে সম্বন্ধেও বিশেষ নির্দেশ রয়েছে হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদে।

বেদের কৌশিক সূত্রে লেখা আছে, 'নতুন খালের মুখে সোনার থালায় বসানো হতো একটি ব্যাঙ। ব্যাঙের গলায় লাল ও নীল সুতো। তারপর ব্যাঙের গায়ে শ্যাওলা ও জল মাখিয়ে খালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হতো।'

কিংবদন্তী আছে, ঋষি নারদ সম্রাট যুধিষ্ঠিরের (খৃষ্টপূর্ব ৩১৫০ সাল) কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রাজ্যের কৃষকরা স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী কিনা। রাজ্যের সমস্ত ক্ষেতে জলসেচ করবার মতো জলাধার আছে কিনা।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারের বিখ্যাত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সালে লক্ষ করেছিলেন, জেলাশাসকরা প্রত্যেকটি জমির মাপজোক করে জলসেচের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।

প্রাচীন জলসেচ ব্যবস্থার কিছু ভগ্নাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্র্যান্ড অ্যানিকাট (grand anicut)। এটি চোল রাজারা কাবেরী নদীর ওপর প্রথম শতাব্দীতে তৈরি করেছিলেন। এখানে নদীটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। ডানদিকে কাবেরী ও বাঁদিকে কোলেরুন। এখানে গ্র্যান্ড অ্যানিকাট এজন্যই তৈরি করা হয়েছিল, যাতে বেশির ভাগ নদীর জল কোলেরুন নদী দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে কাবেরী নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এভাবেই তানজোরের উর্বর বদ্বীপ ভূমিতে জলসেচ করা হতো।

এছাড়াও আরো কিছু প্রাচীন মাটি-বাঁধ (earth dam) রয়েছে, যা আজো জল-সেচের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছে। যেমন তামিলনাড়ুর তিরুনেল ভেলী থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে গঙ্গাইকোণ্ডা জলাধার। এটি একাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজেন্দ্র চোল তৈরি করেছিলেন। একে ঘিরে ২৬ কিলোমিটার লম্বা উঁচু পাড় (embankment)। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত অনন্তরাজ সাগর জলাধার থেকে কাড্ডাপা জেলার ৪২ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ জায়গায় এখনো জলসেচ করা যাচ্ছে। এটির অবস্থান পুরুমামিল্লা গ্রামের ৩ কিলোমিটার পূর্বে।

কাছাকাছি একটি মন্দির থেকে দু'টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। ১৩৬৯ সালে উৎকীর্ণ এই দু'টি শিলালিপি থেকে জানা যায়, এ জলাধারটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল দু'বছর। কেবল পাথর বয়ে আনবার জন্যই ১০০টি পশুচালিত গাড়ি ও ১০০০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন

হয়েছিল এই প্রকল্পে। জলাধারের স্থান নির্বাচন ও সুষ্ঠু নির্মাণ-কাজের জন্য কয়েকটি নির্দেশও লিখিত ছিল ঐ শিলা-ফলকে। নির্দেশগুলি এইরকম ঃ

ক) দেশের রাজা হবেন সৎ, ধনী, সুখী ও যশপ্রার্থী।
খ) দেশে জল-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা দরকার।
গ) জলাধারের ভূমি হবে শক্ত মাটির।
ঘ) অন্ততপক্ষে ২৪ মাইল (৩৮-৪ কিলোমিটার) দূরত্ব থেকে বয়ে আসা মিষ্টি জলবাহী নদী থাকবে।
ঙ) বাঁধের দু'পাশে সংযোগকারী পাহাড় প্রয়োজন।
চ) বাঁধ হবে শক্ত পাথরের অনতিদীর্ঘ, কিন্তু শক্তিশালী।
ছ) বাঁধের দু'পাশে ফলের বাগান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।
জ) জলাধার হবে গভীর ও প্রশস্ত।
ঝ) শক্ত পাথরের খনি কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন।
ঞ) বাঁধের কাছাকাছি নিচু উর্বর সেচযোগ্য জমি থাকা প্রয়োজন।
ট) ঘূর্ণিযুক্ত পাহাড়ী নদী থাকা দরকার।
ঠ) জলাধার নির্মাণের কাজে অভিজ্ঞ একদল কারিগর প্রয়োজন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) হিসার জেলায় তাঁর নিজের শিকারভূমিতে যমুনা নদীর জল নিয়ে যাবার জন্য পশ্চিম যমুনা খাল খনন করেছিলেন ১৩৫৫ সালে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই খাল বুজে গিয়ে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তীকালে ১৫৬৮ সালে সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) এই খালটির সংস্কার করিয়ে হিসার জেলায় আবার জলসেচের বন্দোবস্ত করেন। পরে আকবরের পৌত্র সম্রাট শাজাহান খালটির আরো উন্নতি করেন। তখন মূল খাল থেকে একটি শাখা দিল্লী পর্যন্ত টেনে নেওয়া হয়, যাতে দিল্লী ও রেড ফোর্টের ফুলের বাগানে জল দেওয়া সম্ভব হয়। আরো পরে ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিম যমুনা খালের আরো সংস্কার করা হয়।

একইভাবে সম্রাট মহম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮) আমলে পূর্ব যমুনা খাল কাটা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ রাজত্বে এটির আরো উন্নতি ঘটে। সম্রাট শাজাহান রবি নদী থেকে একটি খাল কেটে লাহোরের শালিমার গারডেনে সেচের জল নিয়ে আসেন। এই খালটি লম্বায় প্রায় ১৮০ কিলোমিটার ও এই খালের একটি শাখা বেয়ে জল পেঁছেছে অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে। বৃটিশ রাজত্বে এই খালটির জায়গায় তৈরি হয়

বাড়ি দোয়াব খাল সমূহ। এছাড়া এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বহু খাল ও কূপ খনন করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ রাজত্বে খরা ও দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করবার প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে জলসেচ পরিকল্পনা গৃহীত হতো। যে দু'জন ইংরেজ ইনজিনিয়ার সুচারু পরিকল্পনা মাফিক বেশ কিছু খাল খনন করিয়েছিলেন, তাদের নাম টি কটলে ও স্যার আরথার কটন।

স্যার আরথার কটন কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের জলবণ্টন ব্যবস্থাগুলি তৈরি করান। ১৮৩৪ সালে তিনি শ্রীরঙ্গম দ্বীপের মুখে একটি ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) তৈরি করেন। এখান থেকে কাবেরী নদী—কাবেরী ও কোলেরুন—এই দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এই প্রকল্পের নাম আপার অ্যানিকাট (upper anicut)। পরবর্তীকালে এই দু'টি অ্যানিকাটের কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনে দরজা লাগানো হয়েছে।

স্যার আরথার কটনের তত্ত্বাবধানে গোদাবরী অ্যানিকাট ও আনুষঙ্গিক খালগুলি খনন করা হয় ১৮৪৬ সালে। এর ফলে গোদাবরী জেলার ৪ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা গেছে। এই প্রকল্পটি গোদাবরী জেলায় আশীর্বাদের মতো, কারণ এর আগে এখানে খরা ও দুর্ভিক্ষ প্রায়ই লেগে থাকত।

কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলেও খরা আর দুর্ভিক্ষ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য উনি কৃষ্ণা নদীর বুকে একটি অ্যানিকাট ও খাল খননের পরিকল্পনা পেশ করেন। ক্যাপটেন ওরের তত্ত্বাবধানে এগুলি নির্মিত হয় ১৮৫২-৫৩ সালে। তবে ক্ষুদ্র সেচ বাঁধটি (weir) ভেঙ্গে যায় ১৯৫২ সালে। তাই ১৯৫৭ সাল নাগাদ এর বদলে তৈরি হয় একটি ব্যারেজ (barrage)। এই ব্যারেজ থেকে ৫ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাচ্ছে।

কটলের তত্ত্বাবধানে উঁচু গঙ্গা খালের (Upper Ganga Canal) নির্মাণ শুরু হয় ১৮৩৬ সালে ও শেষ হয় ১৮৫৪ সালে। সেসময় এটিই ছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম জলসেচ খাল। এই খালটির জলবহনের ক্ষমতা আগে ছিল ১৯১ কিউমেক (cumec), এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৮ কিউমেক (cumec)। এই খালটি গঙ্গা থেকে বেরিয়েছে হরিদ্বারের কাছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জলসেচের প্রয়োজনে যে সব নির্মাণকাজ হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পানজাবের সিরহিন্দ ক্যানাল, নিচু সোহাঙ্গ

ও পারা ক্যানাল ও নিচু চেনাব ক্যানাল ; উত্তর প্রদেশের নিচু গঙ্গা ক্যানাল, আগ্রা ক্যানাল ও বেতোয়া ক্যানাল ; তামিলনাড়ুর পেরিয়ার ক্যানাল ও মহারাষ্ট্রের মুথা ক্যানাল। ১৮৬৯-৭৯ সালে খড়গভাসলা জলাধার (storage dam) তৈরি হয় ও এই জলাধার থেকেই মুথা ক্যানালে জল সরবরাহ হয়। ১৮৮৭ সালে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে পেরিয়ার বাঁধ তৈরি হয়। এই বাঁধের মারফৎ আরব সাগরমুখী পেরিয়ার নদীর জলধারাকে পূর্বমুখী করা হয়েছে। ১৮৭২-৭৭ সালে নির্মিত নিচু সোহাঙ্গ ও পারা খাল খনন করবার ফলে পশ্চিম পানজাবে (এখনকার পাকিস্তানে) বেশ কিছু বসতি অঞ্চল গড়ে তোলা গেছে। সিরহিন্দ ক্যানাল (১৮৭৩-১৮৮২) থেকে জলসেচের সুবিধে হওয়ায় এই অঞ্চলের চেহারাই বদলে গেছে। এই খাল থেকে প্রায় ১০ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাচ্ছে।

ঝাঁসি শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে পারিছার কাছে বেতোয়া নদীতে বেতোয়া খাল খনন করা হয়েছে ১৮৯৩ সালে। এই খাল থেকে প্রায় এক লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাচ্ছে। ফলে এই অঞ্চল থেকে খরা আর দুর্ভিক্ষ প্রায় নির্বাসিত। এ ধরনের আরো কয়েকটি খালের নাম ওড়িশার রিসিকুল্যা প্রজেক্ট (১৮৮৪) ; মহারাষ্ট্রের নীরা খাল (১৮৮১) ও গোকক খাল (১৮৮২)।

বিশ শতকের জলসেচ ব্যবস্থা

বিশ শতকের গোড়ায় দেশের জলসেচ ব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য ভারতে প্রথম জলসেচ কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের সভ্যরা সারা ভারত ঘুরে জলসেচের ব্যবস্থা সরেজমিন তদন্ত করেন ও একটি রিপোর্ট দেন ১৯০৩ সালে। এরপর আরেকটি জলসেচ কমিশন নিযুক্ত হয় সত্তরের দশকে। এই কমিশনও একটি রিপোর্ট জমা দেন ১৯৭২ সালে। এই রিপোর্টে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, কীভাবে এদেশে জলসেচ প্রকল্প আরো বাড়ানো যেতে পারে।

এই শতকের প্রথমদিকে যে সব জলসেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিহারের ত্রিবেণী খাল প্রকল্প ; মহারাষ্ট্রের প্রভরা খাল, গোদাবরী খাল ও নীরা নদীর ডান তীরের খাল ; উত্তরপ্রদেশের সারদা খাল প্রকল্প ও মধ্যপ্রদেশের ওয়েনগঙ্গা ও মহানদী খাল।

১৯২১ ও ১৯৩৫ সালের মধ্যে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য সেচ-প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্নাটকের কৃষ্ণরাজ সাগর, অন্ধ্রপ্রদেশের নিজাম সাগর ও তামিলনাড়ুর মেট্টুর প্রকল্প। কৃষ্ণরাজ সাগর প্রকল্পে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে কাবেরী, হেমবতী ও লক্ষণতীর্থ নদীর সঙ্গমস্থলে। জলাধারের আয়তন ১২,৩৩০ লক্ষ ঘন মিটার ও জলসেচ হচ্ছে ৫০,০০০ হেকটর জমিতে। এই প্রকল্পের রচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত পূর্তবিদ ডঃ এম বিশ্বেশ্বরায়া। নিজামসাগর প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে গোদাবরীর উপনদী মঞ্জীরার বুকে। এর নির্মাণ কাজ ১৯২৪ সালে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৯৩১ সালে। এর জলাধার থেকে জলসেচ হচ্ছে ১,১০,০০০ হেকটর পরিমাণ জমিতে।

কাবেরী নদীর বুকে মেট্টুর বাঁধ তৈরি শুরু হয় ১৯২৫ সালে, শেষ ১৯৩৪ এ। এর জলাধারের আয়তন ২৬,৬০০ লক্ষ ঘন মিটার। এর জলে অনেকটা জায়গায় জলসেচ হচ্ছে।

শতদ্রু নদী থেকে ফিরোজপুর ব্যারেজের কাছে যে বিকানির খাল (অথবা গাং খাল) বেরিয়েছে, তার জলে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য বিকানিরের অনেকটা জায়গায় জলসেচ হতো। ১৯২২ সালে শুরু হয়ে ১৯২৭ সালে এই খাল কাটার কাজ শেষ হয়েছে। এই খাল থেকে ২,২০,০০০ হেকটর পরিমাণ জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে জলসেচ

স্বাধীনতার আগে ভারতে যেসব জলসেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। ১৯৫০ সালে যেখানে ভারতে ২ কোটি হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত ছিল, সেখানে ১৯৭৮-৭৯ সালের শেষে জলসেচ বন্দোবস্ত হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ হেকটর জমিতে। ১৯৮০-৮১ সালে আরো প্রায় ২৭ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। এত অল্প সময়ে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির মূলে ছিল ডঃ এ এন খোসলার উল্লেখযোগ্য অবদান।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে জলসেচের ব্যবস্থা-সম্পন্ন জায়গাগুলোর বেশির ভাগই গেছে পাকিস্তানে। যেখানে পাকিস্তান পেয়েছে ৮,১৪,০০০ লক্ষ ঘন মিটার জলসেচের জল, সেখানে ভারতের ভাগে মাত্র ১,১১,০০০ লক্ষ ঘন মিটার জল। এই হিসেব সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলের। জলসেচ-ব্যবস্থা সম্পন্ন জমির হিসেবে ৮০ লক্ষ হেকটর জমি গেছে পাকি-

স্থানে, আর ভারত পেয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ হেকটর জমি। তাই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য ভারতের জলসেচ ব্যবস্থাকে দ্রুত জোরদার করতে হয়েছে।

ভারতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৩,৭০,০৪৪ কোটি ঘন মিটার। এর মধ্যে অনেকটাই চুঁইয়ে চলে যায় মাটির নিচে, কিছুটা নষ্ট হয় বাষ্পীভবনের ফলে। তাছাড়া ভূসংস্থানগত (topography) কারণে অনেক জায়গায় বৃষ্টির জল সেচের কাজে লাগানো যাচ্ছে না। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৫৫,৫১৭ কোটি ঘন মিটার বৃষ্টির জল ভারতে জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ভারতে জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বার্ষিক ৯,৩৭৩ কোটি ঘন মিটার পরিমাণ জল। সেই বছরই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১), জলসেচের প্রয়োজনে জল ব্যবহারের পরিমাণ বার্ষিক ১৪,৮০২ কোটি ঘন মিটার। আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬) এই পরিমাণ বেড়ে হয় ১৮,৫০২ কোটি ঘন মিটার।

ভারতের জলসেচ প্রকল্পগুলি দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(১) বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্প, (২) ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প।

এই শ্রেণীবিভাগ প্রধানত প্রকল্পের ব্যয়ের অনুসারে। সত্তর দশকের হিসেব অনুযায়ী, ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প, ১৫ লাখ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত মাঝারি জলসেচ প্রকল্প এবং ব্যয় ৫ কোটি টাকার বেশি হলে তা' বৃহৎ জলসেচ প্রকল্প (major irrigation schemes)। বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্পগুলি সেচ মন্ত্রালয়ের অধীনে, আর ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পগুলি কৃষি মন্ত্রালয়ের আওতায় পড়ে। বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্প-ব্যবস্থায় রয়েছে নদীর বুকে জলাধার ও ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) নির্মাণ। ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প ব্যবস্থায় রয়েছে ছোট আয়তনের জলাধার নির্মাণ এবং নলকূপ ও পাতকুঁয়ার মাধ্যমে ভূ-জল (Groundwater) উত্তোলনের বন্দোবস্ত ও বিকাশ ঘটানো।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের আওতায় ছিল ২·২৬ কোটি হেকটর জমি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) ৩৭৬ কোটি টাকায় ২৩৭টি জলসেচ প্রকল্প হাতে

নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) ৩৮০ কোটি টাকায় আরো ১৮৮টি নতুন জলসেচ প্রকল্প গৃহীত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) ৫৭২ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দে আরো ১০৩টি নতুন জলসেচ প্রকল্পের কাজ চলে। পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে (১৯৬৬-৬৯) বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৫ কোটি টাকা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৯) বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্পের জন্য ১২৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে সারা দেশে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়েছে। আর ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে মোট সেচক্ষমতা দাঁড়াবে ৭·০৩ কোটি হেকটর। ২০০০ সালের মধ্যে ১১·৩ কোটি হেকটর জমিতে সেচব্যবস্থা পেঁাছে দেবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রক জলসম্পদ উন্নয়নের যে সার্বিক জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেছেন তাতে দেশের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সর্বমোট ১৪·৮ কোটি হেকটর জমিতে সেচের সুবিধে পেঁাছে দেওয়া যাবে বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যেতে পারে, ইংরেজিতে dam, barrage, anicut, weir ইত্যাদি কথা চালু থাকলেও, বাংলায় কেবলমাত্র বাঁধ শব্দটি চালু আছে। ব্যারেজ আসলে নিচু ড্যাম, যার ভেতরে জলপ্রবাহের জন্য প্রচুর ছিদ্র (sluice) থাকে। দক্ষিণ ভারতে ব্যারেজের নামই অ্যানিকাট। weir হলো ছোট ব্যারেজ বা ক্ষুদ্র সেচ-বাঁধ।

১৮০০ সাল থেকে সুরু করে ১৯৫০ সালের মধ্যে জলসেচ প্রকল্পের জন্য খরচ হয়েছে ১৫৬ কোটি টাকা। অথচ ভারতে প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেবল জলসেচ প্রকল্পের জন্যই খরচ হয়েছে ১৮৫০ কোটি টাকা। যদিও এই সময়ের মধ্যে টাকার দাম অনেক কমে গেছে, তবুও অতীত ও বর্তমান কালে জলসেচ প্রকল্পের জন্য অর্থব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র বিচার করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ভারত তার জলসেচ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হতে চেষ্টা করছে।

জলের যে সব বিভিন্ন উৎস থেকে দেশে জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার তুলনামূলক হিসেব (১৯৭০-৭১) দেওয়া হলো ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	জলসেচের মাধ্যম	জলসেচযুক্ত এলাকা (×১০০০ হেকটর)	শতকরা হিসেব
১.	খাল	১২,১৭২	৪১·৮
২.	দীঘি	৩,৫১০	১২·১
৩.	পাতকুঁয়া	৬,৬৬৯	২২·৯
৪.	নলকূপ	৪,৮৪২	১৬·৬
৫.	অন্যান্য উৎস	১,৯১৪	৬·৬
	মোট	২৯,১০৭	১০০·০

[কৃষিসংক্রান্ত সেনসাস রিপোর্ট থেকে]

ভারতের ১৪টি প্রধান নদীতে বর্তমান জলসেচ ব্যবস্থাগুলো সম্পন্ন হলে কতটা জমি জলসেচের আওতায় আসবে, তা দেখানো হলো নিচের সারণীতে। এই হিসেব মোটামুটিভাবে ১৯৭৩-৭৪ সালের।

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	জলসেচযুক্ত জমির পরিমাণ (×১০০০ হেকটর)
১.	সিন্ধু	৫,০৯০
২.	গঙ্গা	১৩,০৬৫
৩.	ব্রহ্মপুত্র	১০৫
৪.	সাবরমতী	১৭০
৫.	মাহী	৩৪০
৬.	নর্মদা	৪১৫
৭.	তাপ্তী	৬০০
৮.	সুবর্ণরেখা	৫৫
৯.	ব্রাহ্মণী	৪১০
১০.	মহানদী	১,৬৭০
১১.	গোদাবরী	১,৮০০
১২.	কৃষ্ণা	৩,৮৬০
১৩.	পেন্নার	১৮০
১৪.	কাবেরী	১,১১৫

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ভারতে ৯৩৪ টি বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২৬ টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, বাকিগুলোর কাজ চলছে। এর ফলে আরো ১ কোটি ৫১ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৃহৎ জলসেচ ও বহুমুখী পরিকল্পনার কথা সংক্ষেপে দেওয়া হলো ঃ

নাগার্জুন সাগর প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ)ঃ এই প্রকল্পে কৃষ্ণা নদীর ওপর একটি বাঁধ ও দু'টি খাল (canal) কাটা হয়েছে। ডান তীরের খালটি ২০৪ কিলোমিটার লম্বা আর বা'তীরের খালটি ১৭৩ কিলোমিটার। বাঁধটি পাথরের (masonry) তৈরি। ভিত থেকে উচ্চতা ৯০'৬ মিটার। এই বাঁধ থেকে জলসেচ হচ্ছে প্রায় ৮'৬৭ লক্ষ হেকটর জমিতে। এই প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৯১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। পরে কিছুটা বেড়েছে।

তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ ও করনাটক) ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ ও করনাটক এই দু'টি প্রদেশের সহযোগিতায় তুঙ্গভদ্রা নদীর ওপর ২,৪৪১ মিটার লম্বা ৪৯'৩৩ মিটার উঁচু একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে ১৯৫৬ সালে। খাল কাটার কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ৩'৯২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে।

পোচামপাদ প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ) ঃ এই প্রকল্পে গোদাবরী নদীর বুকে ৮১২ মিটার লম্বা ও ৪৩ মিটার উচু একটি বাঁধ। সঙ্গে সঙ্গে নদীটির ডান তীর থেকে একটি ১১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল কাটা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ২'৬৭ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ মিলবে।

গণ্ডক প্রকল্প (বিহার ও উত্তরপ্রদেশ) ঃ এই প্রকল্পটির কথা 'জলবিদ্যুৎ শক্তি'র অধ্যায়ে লেখা হয়েছে। প্রকল্পটি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শেষ হবে বলে আশা করা যায়। কাজ শেষ হলে ১৪'৮৩ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হবে।

কোশী প্রকল্প (বিহার) ঃ বহুমুখী কোশী প্রকল্প থেকে জলসেচ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি সুবিধে পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি নির্মাণের ব্যাপারে ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, ১৯৫৪ সালে, পরে চুক্তি সংশোধিত হয় ১৯৬৬ সালে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৪'৩৪ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে। নেপালের হনুমান নগরের ব্যারেজ নির্মাণের কাজ ১৯৬৫ সালে শেষ হয়েছে। কোশী নদীর পূর্ব দিকের খাল খননের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য আরো চারটি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র নির্মাণ, পশ্চিম কোশী খাল, রাজপুর খাল, বন্যা-রোধী নদী-পাড় উঁচু করা। পশ্চিম কোশী খাল প্রকল্পে হনুমান নগরের কোশী ব্যারেজ থেকে ১১২·৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ৩৫·২ কিলোমিটার পড়েছে নেপালে। এই খাল খননের কাজ শেষ হলে ৩·১৪ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে। রাজপুর খাল —যা পূর্বদিকের প্রধান খাল থেকে বেরোবে, তার কাজ শেষ হলে আরো ১·২৫ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে।

এই সব ক'টি কাজ শেষ হলে প্রায় ৮·৭৩ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

কাকরাপাড়া প্রকল্প (গুজরাট) : গুজরাটের কাকরাপাড়া প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তাপ্তী উপত্যকার উন্নয়নের জন্য। সুরাট জেলার কাকরাপাড়ার কাছে ৬২১ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ মিটার উঁচু ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) নির্মিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে। এই প্রকল্প থেকে ২·২৮ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে।

উকাই প্রকল্প (গুজরাট) : এই প্রকল্পটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচের প্রয়োজন মেটাতে রূপায়িত হচ্ছে। উকাই প্রকল্প নিয়ে 'জল-বিদ্যুৎশক্তি'র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মাহী প্রকল্প (গুজরাট) : মাহী প্রকল্পের দু'টি ভাগ। প্রথম পর্বে রয়েছে মাহী নদীর বুকে ওয়ানকবড়ির কাছে ৭১৬ মিটার দীর্ঘ ও ২০·৬ মিটার উঁচু একটি ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) নির্মাণ। ডান পাড় থেকে একটি ৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করা হয়েছে। এতে জলসেচ করা যাচ্ছে ১·৮৬ লক্ষ হেকটর জমিতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মাহী নদীর বুকে কাদানায় নির্মিত হচ্ছে ১,৪৩০ মিটার দীর্ঘ ও ৫৮ মিটার উঁচু একটি বাঁধ। এর ফলে আরো ৮৯,০০০ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

ভদ্রা প্রকল্প (করনাটক) : ভদ্রা নদীর বুকে যে বহুমুখী প্রকল্পের কাজ চলছে, তার কাজ শেষ হলে ১·০৬ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে, জলবিদ্যুৎ তৈরি হবে ৩৩ মেগাওয়াট।

উচ্চ কৃষ্ণা প্রকল্প (করনাটক) : এই প্রকল্পে দু'টি বাঁধ তৈরি হচ্ছে। একটি নারায়ণপুরে, আরেকটি আলমাট্টিতে। কৃষ্ণা নদীর বাম তীর

থেকে একটি খাল খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ৪·০৮ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

ঘটপ্রভা প্রকল্প (করনাটক) : বেলগাঁও ও বিজাপুর জেলার ঘটপ্রভা নদীতে এই সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে। তিনটি পর্যায়ে এর কাজ শেষ হবে। প্রথম পর্যায়ে ধুপডালের কাছে ২,০৮৫ মিটার লম্বা ও ৯ মিটার উঁচু একটি পাথরের ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ (weir) তৈরি ও বাম তীর থেকে ৭১ কিলোমিটার-দীর্ঘ একটি খাল কাটা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫,২৭৫ মিটার লম্বা ও ৫০-মিটার উঁচু বাঁধ তৈরি হচ্ছে হিদকালের কাছে। এছাড়া প্রথম পর্যায়ের খালটির দৈর্ঘ্য ৭১ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১৪ কিলোমিটার। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ। তৃতীয় পর্যায় হিদকাল বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে ও আরেকটি ২০২ কিলোমিটার লম্বা খাল কাটা হচ্ছে হিদকাল বাঁধের ডান তীর থেকে। এই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ৫·০২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে।

মালপ্রভা প্রকল্প (করনাটক) : এই প্রকল্পে মালপ্রভা নদীর বুকে তৈরি হচ্ছে ১৬৩ মিটার লম্বা ও ৪৩·৪ মিটার উঁচু পাথরের বাঁধ। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি খালও খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে জলসেচের সুবিধে হবে ২·০৬ লক্ষ হেকটর জমিতে।

তাওয়া প্রকল্প (মধ্যপ্রদেশ) : হোসাঙ্গাবাদ জেলার তাওয়া প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য রয়েছে 'জলবিদ্যুৎশক্তি' অধ্যায়ে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৩·৩২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হবে।

চম্বল বহুমুখী প্রকল্প (মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান) : চম্বল বহুমুখী প্রকল্প নিয়ে লেখা হয়েছে 'জলবিদ্যুৎশক্তি' অধ্যায়ে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে জলসেচের সুবিধে হবে ৪·৯২ লক্ষ হেকটর জমিতে।

ভীমা প্রকল্প (মহারাষ্ট্র) : ভীমা প্রকল্পে দু'টি বাঁধ তৈরি হচ্ছে। একটি পুণে জেলার ফাগনের কাছে পাওয়ানা নদীর বুকে। আরেকটি শোলাপুর জেলার উজ্জয়িনীর কাছে কৃষ্ণা নদীর বুকে। পাওয়ানা নদীর বাঁধ ১৭০০ মিটার লম্বা ও ৪৩-মিটার উঁচু। উজ্জয়িনীর বাঁধ লম্বায় ২৪৬৭ মিটার লম্বা ও ৫৬·৪ মিটার উঁচু। এই বাঁধের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই বাঁধের বা' তীর থেকে একটি ১৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ১·৬৪ লক্ষ

হেকটর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হবে।

জয়াকোদি প্রকল্প (মহারাষ্ট্র) : এই প্রকল্পে গোদাবরী নদীর বুকে তৈরি হয়েছে ৩৭ মিটার উঁচু একটি মাটির (earthen) বাঁধ, সঙ্গে পাথরের স্পিলওয়ে। বাঁধের বা'দিকে খনন করা হচ্ছে ১৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল। দ্বিতীয় পর্যায়ে মাজালগাঁওয়ের কাছে সিন্দফানা নদীর বুকে ৬,০৯০ মিটার লম্বা ও ৩০·৫ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। বাঁধের ডানদিকে তৈরি হচ্ছে একটি ১৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল।

প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ২·৭৮ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধা হবে।

হীরাকুঁদ প্রকল্প (ওড়িশা) : মহনদীর বুকে ৪,৮০১ মিটার লম্বা হীরাকুঁদ বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। এই প্রকল্প থেকে ২·৫১ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

মহানদী বদ্বীপ প্রকল্প (ওড়িশা) : হীরাকুঁদ বাঁধ থেকে যে জল ছাড়া হচ্ছে, সেই জলকে কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্প তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৫·৬২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প (পানজাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান) : পানজাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প ভারতের সবচেয়ে বড় বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে ২৩৬ কোটি টাকা। এতে শতদ্রু নদীর ওপর দু'টি বাঁধ তৈরি হয়েছে। একটি ভাকরার কাছে, ৫১৮ মিটার লম্বা ও ২২৬ মিটার উঁচু। আরেকটি ২৯-মিটার উঁচু নাঙ্গাল বাঁধ, সঙ্গে ৬৪ কিলোমিটার লম্বা হাইডেল চ্যানেল। ভাকরা বাঁধে রয়েছে দু'টি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। আর দু'টি জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের অবস্থান হাইডেল চ্যানেলে—একটি গাঙ্গুওয়ালে, অন্যটি কোটলায়। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ১,২০৪ মেগাওয়াট। প্রধান খালের মোট দৈর্ঘ্য ১,১০০ কিলোমিটার, অন্যান্য খালের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৪০০ কিলোমিটার। ভাকরা বাঁধের জলাধারের আয়তন ৯৩৫·৫ কোটি ঘন মিটার। এই প্রকল্প থেকে এখন ১৪·৮ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ হচ্ছে।

বিপাশা প্রকল্প (পানজাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান) : পানজাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে রয়েছে—(১) বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ ব্যবস্থা (২) পঙ্গ-এর কাছে বিপাশা বাঁধ, (৩) বিপাশা বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে আনুমানিক ৭১৫ কোটি টাকা।

বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ ব্যবস্থা মূলত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। ১৬৫-মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ৪ টি ইউনিট তৈরি হয়েছে। এতে আরো দু'টি ইউনিট বাড়ানো যাবে।

পঙ্গ-এর কাছে ১৩৩ মিটার লম্বা মাটি ও পাথরের সমন্বয়ে যে বাঁধটি তৈরি হয়েছে, তা' মূলত জলসেচের প্রয়োজনে। ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন ৪ টি ইউনিট আছে। আরো ৪ টি বাড়ানো যাবে।

থেইন বাঁধ প্রকল্প (পানজাব) : এই প্রকল্পে রাবি নদীর ওপর একটি ১৪৭ মিটার উঁচু বাঁধ তৈরি হচ্ছে। মোট খরচ হবে ২৬৩ কোটি টাকা। বাঁ তীরে যে শক্তিকেন্দ্রটি তৈরি হচ্ছে, তার উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮০ মেগাওয়াট। বাঁধের জলাধার থেকে ৩'৪৮ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ মিলবে।

রাজস্থান খাল প্রকল্প (রাজস্থান) : এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে উত্তর পশ্চিম রাজস্থান অঞ্চলে জলসেচের সুবিধে হবে। এর মধ্যে থর মরু-ভূমির খানিকটা অংশও পড়বে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে তৈরি হয়েছে ২০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শাখা খাল (feeder canal), ১৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল খাল। ৩,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগকারী খালও তৈরি হচ্ছে

দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈরি হচ্ছে মূল খালের বাকি ২৫৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ৩,৫০০ কিলোমিটার সংযোগকারী খাল। এই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ১২'৫৪ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে।

পারামবিকুলাম আলিয়ার প্রকল্প (তামিলনাড়ু ও কেরালা) : তামিল-নাড়ু ও কেরালা সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্প রচিত হয়েছে আটটি নদীকে নিয়ে। এদের মধ্যে ছ'টি নদীর উৎপত্তি আন্নামালাই পাহাড়ে, দু'টির সমতলভূমিতে। প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ। এই প্রকল্পের জল থেকে ৯৫,০০০ হেকটর জমিতে জলসেচ করা যাবে। ১৮৫ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রও তৈরি হচ্ছে।

শারদা সহায়ক প্রকল্প (উত্তরপ্রদেশ) : শারদা ঘর্ঘরার উপনদী। এই প্রকল্পে যে কাজ হচ্ছে ও হবে তা' হলো—(১) ঘর্ঘরা নদীর ওপর ১,০০৩ মিটার দীর্ঘ ব্যারেজ নির্মাণ ; (২) ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ চ্যানেল নির্মাণ ; (৩) শারদা নদীর বুকে ৮১১ মিটার দীর্ঘ ব্যারেজ নির্মাণ ; (৪) ২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফিডার চ্যানেল নির্মাণ ; এতে দু'টি জলনালী (aqueduct) তৈরি করতে হবে গোমতী ও সাই নদীর ওপর ; (৫) ৬,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগকারী খালের সংস্কার-সাধন ও ২,৫৭০

কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন খাল খনন। এই প্রকল্পের কাজ পাঁচটি পর্যায়ে শেষ হবে। এর মধ্যে প্রথম দু'টি পর্যায়ের কাজ শেষ। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মোট ১৫·৮২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হবে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে হয়েছে।

রামগঙ্গা প্রকল্প (উত্তর প্রদেশ) : গঙ্গার একটি প্রধান উপনদী রামগঙ্গা। এর বুকে তৈরি হয়েছে ৬২৫ মিটার লম্বা ও ১২৫·৬ মিটার উঁচু মাটি ও পাথরের বাঁধ। সঙ্গে ৭২ মিটার উঁচু আরেকটি স্যাডল বাঁধ (saddle dam) তৈরি হয়েছে গাড়োয়াল জেলায়। এই প্রকল্পের জলে খুব শিগগিরই ৫·৯১ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুযোগ মিলবে। তাছাড়া তৈরি হচ্ছে ১৯৮ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই প্রকল্প থেকে দিল্লীর জল-সরবরাহ প্রকল্পে ২০০ কিউসেক জল সরবরাহ হবে। এই প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে।

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প (পশ্চিমবঙ্গ) : এই প্রকল্পে ময়ূরাক্ষী নদীর বুকে ৬৪০ মিটার লম্বা ও ৪৭·২৪ মিটার উঁচু কানাডা বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বাঁধের জলসেচ হচ্ছে ২·৫১ লক্ষ হেকটর জমিতে। জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের ক্ষমতা ৪ মেগাওয়াট। প্রকল্পের কাজ এখনো সামান্য বাকি আছে।

কংসাবতী প্রকল্প (পশ্চিমবঙ্গ) : এই প্রকল্পে দু'টি বাঁধ তৈরি হচ্ছে। একটি কংসাবতীতে, আরেকটি কুমারী নদীর বুকে। দু'টি বাঁধের মাঝখানে সংযোগকারী দীর্ঘ দেয়াল (dyke) নির্মিত হয়েছে। শিলাবতী, ভৈরববাঁকী ও তারাফেনি নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করে বেশ কিছু খাল খনন করা হচ্ছে। তাছাড়া এই তিনটি নদীতে তিনটি ব্যারেজও তৈরি হচ্ছে। এই প্রকল্প থেকে ৪·০২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে পাওয়া যাবে।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার) : পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে নজর রেখে এই প্রকল্প রচিত ও রূপায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পে বেশ কয়েকটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পানচেতে। দুর্গাপুরে তৈরি হয়েছে ৬৯২ মিটার দীর্ঘ ও ১১·৫৮ উঁচু ব্যারেজ। তিনটি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে। নির্মীয়মান জলসেচ খালের দৈর্ঘ্য ২,৪৯৫ কিলোমিটার। প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ৫·১৫ লক্ষ হেকটর জমিতে জলসেচের সুবিধে পাওয়া যাবে।

ভারতে নির্মিত বাঁধের খতিয়ান

নদীর জলসম্পদ মানুষের নানা প্রয়োজনে লাগাবার জন্য ভারতে বহু নদীর বুকে বাঁধ তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার বেশ কিছু আগে থেকেই। তবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই ধরনের বাঁধের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৩০ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতার বাঁধের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫টি। সেই তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে বাঁধের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত বাঁধের সংখ্যা ৮৬৯। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নির্মিয়মান বাঁধের সংখ্যা ৪৭৯। এর মধ্যে ১৯৫২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ৩০ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতার সমাপ্ত বাঁধের সংখ্যা ১৭৩ এবং নির্মিয়মান বাঁধের সংখ্যা ১১৩।

এতদিন পর্যন্ত যতগুলি বাঁধ তৈরি হয়েছে সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সাজালে যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তা' এই রকমঃ হিমালয় এবং তৎসংলগ্ন পার্বত্যাঞ্চলে ২০টি, মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চলে ৫৮৩টি, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমতলভূমি ও সন্নিহিত অঞ্চলে ৫১টি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে (এর মধ্যে সমগ্র গুজরাট প্রদেশকে ধরা হয়েছে) ২১৫টি। অর্থাৎ নির্মিত বাঁধের শতকরা ৬৭টি বাঁধ মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চলে অবস্থিত (সুনীল সেনশর্মা ; ধনধান্যে, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩)।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

সব ক'টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বন্যাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। শুধু ধ্বংসের দিক থেকে নয়, খরচের দিক থেকেও। কারণ বন্যা-নিরোধক ব্যবস্থাগুলি প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। ১৯৮০ সালে ভারতে বৃষ্টিপাত ঠিকঠাক হয়েছে, তেমন বড় আকারের কোন বন্যা হয় নি, তবু সে বছর প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ হেকটর জমিতে জলপ্লাবন ঘটেছে, ৫ কোটি মানুষ বন্যার কবলে পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ প্রায় ৪৮৪ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় জল কমিশন (Central Water Commission) হিসেব করে দেখেছেন, দেশের প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেকটর জমিতে বন্যা হবার সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৪ লক্ষ হেকটর জমিতে (এর মধ্যে ৩১ লক্ষ হেকটর চাষের জমি) প্রতি বছর বন্যা হয়। বন্যার ফলে প্রতি বছর আনুমানিক ক্ষতি হয় ২১০ কোটি টাকা (হিসেবের বছর ১৯৫২-৫৩)।

এই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, গড় হিসেবে বন্যার কবলে পড়ে ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ২·৩ ভাগ, মোট চাষের জমির শতকরা ৪·১ ভাগ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জাতীয় সম্পদের শতকরা ১ ভাগ।

১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালের বন্যায় পাটনা শহরের চার ভাগের তিন ভাগ অঞ্চল জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের বন্যায় কলকাতা এবং ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালের বন্যায় দিল্লী শহর ডুবে গিয়েছিল জলের তলায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, বড় শহরও বন্যার প্রকোপ থেকে সব-সময় রক্ষা পায় না।

জাতীয় বন্যা কমিশনের (National Flood Commission) একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর গড়পড়তা ৮২ লক্ষ হেকটর জমি বন্যার কবলে পড়েছিল। এর মধ্যে ৩৫ লক্ষ হেকটর বা শতকরা ৪৩ ভাগ অঞ্চল চাষের জমি। এই পরি-সংখ্যান থেকে আর একটি কথা স্পষ্ট, ১৯৭০ সাল থেকে বন্যার তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। এই সময়ের পর থেকে প্রতি বছর গড়পড়তা ১ কোটি ১৯ লক্ষ হেকটর জমি বন্যার কবলে পড়ছে। এর মধ্যে ৫৪ লক্ষ হেকটর চাষের জমি। ১৯৭০ সালের আগে এক বছরে বন্যাকবলিত সবচেয়ে বেশি জমির পরিমাণ ১ কোটি ১২ লক্ষ হেকটর, অথচ ১৯৭০ সালের পরে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ হেকটর। সর্বোচ্চ চাষের জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ হেকটর ও ১ কোটি হেকটর।

১৯৫০-৬৫ সালের গড় হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ ৫১ কোটি টাকা (১৯৫২-৫৩ সালের টাকার হিসেবে), আর ১৯৭৬ ৭৮ সালের হিসেব অনুযায়ী ৯২ কোটি টাকা। তথ্যগুলির দিকে চোখ বোলালে দেখা যায় ১৯৫০-৬৫ সালের তুলনায়, বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে ১৯৬৬-৭০ সালে দু'গুণ, ১৯৭১-৭৫ সালে তিনগুণ ও ১৯৭৬-৭৮ সালে পাঁচগুণ। যুক্তিতথ্য অনুযায়ী একথা বুঝতে পারা যায়, বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

আগেকার দিনে শহর ও অন্যান্য বসতিস্থান তৈরি হতো কিছুটা উঁচু জায়গায়, যাতে বন্যার সময় বসতিস্থানের ক্ষতি না হয়। সেযুগে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর পাড় (embankment) উঁচু করলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে মানুষ এখন বন্যা-প্রবণ অঞ্চলেও বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিচু অঞ্চলেও বহু মানুষ ঘরবাড়ি তুলেছে।

১৯৫৪ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু আধুনিক পদ্ধতি গৃহীত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে নদীর পাড় উঁচু করা, নদীর গতিপথ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা, অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করা, গ্রামগুলিকে নিচু জায়গা থেকে সরিয়ে উঁচু জায়গায় বসানো, শহরের চারপাশে বন্যা-রোধকারী দেয়াল তৈরি করা ইত্যাদি। কেবল ১৯৮০ সালেই ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়, যেখানে চতুর্থ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হয়েছে যথাক্রমে ১৮৫ কোটি ও ২৮৬ কোটি টাকা। অনুমান করা হচ্ছে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) খরচ ১,৫০০ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাবে। অথচ ১৯৫০-৮০ সালে এই তিরিশ বছরে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজে খরচ হয়েছে মাত্র ৯৪৫ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে ১০,০০০ কিলোমিটার নদীপথের পাড় বাঁধানো অথবা উঁচু করা হয়েছে, ১৮,০০০ কিলোমিটার নতুন খাল খনন করা হয়েছে, ২৫১টি শহরের সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে ও ৪,৭০০টি গ্রামকে উঁচু করা হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কমিটি তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন ও বেশ বন্যা-নিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তবু বছরের পর বছর বন্যার প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে মহানদী, দামোদর ও কোশী নদী পরিকল্পনায় কিছুটা সুফল ফলেছে।

ভারতে প্লাবনের জল আটকাবার জন্য নদীর পাড় উঁচু করা হতো। কিন্তু ১৯৪৫ সালে দামোদর নদীতে ভয়াবহ বন্যার পরে বোঝা গেল, শুধু-মাত্র এভাবে বন্যা নিরোধ করা যাবে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহুমুখী দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরে হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনায়ও এই চিন্তার প্রতিফলন পড়েছে। এই সব পরিকল্পনায় নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়েছে। এই জলাধারের জলকে প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করে বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমানো গেছে।

বন্যার কারণ

প্রাকৃতিক নিয়মে কোন নদীতেই সবসময় একরকম জল থাকে না। দিন, মাস, বছর হিসেবে নদীখাতে জলপ্রবাহ বাড়ে ও কমে। জটিল আবহাওয়াগত কারণে নদীর জলপ্রবাহে তারতম্য ঘটে।

নদীখাতের জলধারণের যা ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশী জল এলে স্বাভাবিক নিয়মেই নদীতে বন্যা হবে। বন্যার তীব্রতা কতটা হবে, তা' নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব এবং ভূমির অবস্থার ওপর। মরুভূমি ও আধা-মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বলে, ওখানে বৃষ্টির জল নিকাশের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই এসব অঞ্চলে হঠাৎ প্রবল বর্ষণ হলে জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় মাঝে মধ্যে বন্যা হয়ে থাকে।

অন্যান্য যে সব কারণ বন্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিক্ষয় ও নদীতে পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে নদী-খাতের জলবহনের ক্ষমতা কমে যায়, নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা (meandering) হয়ে পড়ে। ভূমিকম্প, ধস, মূল ও উপনদীগুলিতে একই সময়ে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি, জোয়ারের জন্য নদীপ্রবাহের শ্লথগতি হওয়া, সাই-ক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাও বন্যার তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

নদীখাতে কতটা জল প্রবাহিত হবে, তা নির্ভর করে ভূমির ঢাল, গাছপালার প্রকৃতি ও পরিমাণ, ও বৃষ্টিপাত কতটা সময় ধরে কতখানি হচ্ছে, তার ওপর। যদি ভূমির ওপরে থাকে ঘাসের আচ্ছাদন, তবে জল-প্রবাহের পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র শতকরা ৪ ভাগ হতে পারে, কিন্তু ভুট্টাক্ষেত অঞ্চলে জলপ্রবাহের পরিমাণ খুব সহজেই শতকরা ৩০-৩২ ভাগ পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। নিবিড় অরণ্য ভূমির ওপরে জলপ্রবাহ কমিয়ে দেয়। কারণ গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত করে রাখে, আর এই মাটি বৃষ্টির জল সহজেই শুষে নেয়।

প্লাবন-ভূমিতে (flood plain) খুব সহজেই জনবসতি গড়ে ওঠে, কারণ এই ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও আরো কিছু সুবিধে আছে এখানে। তাই মিশর গড়ে উঠেছে নীল নদের প্লাবন ভূমিতে। ব্যাবিলন শহর টাইগ্রিস নদীর প্লাবন ভূমিতে। উত্তর ভারতের অনেক শহরও গড়ে উঠেছে গঙ্গা নদীর দু'পাশে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্লাবনভূমিকে কেন্দ্র করে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। তাই আজো দেখা যায়, ভারতে গঙ্গা নদীর প্লাবনভূমি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি মিসৌরি নদীর প্লাবনভূমি, কিংবা চীনের পীত নদীর প্লাবনভূমি সারা পৃথিবীর মধ্যে খুবই ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র গঙ্গা নদীর অববাহিকাতেই ভারতের মোট জনসংখ্যার

প্রায় ৪০ জন মানুষ বাস করে।

ভারতে নদীগুলির প্লাবন ভূমিগুলিকে সার্বিক পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলা হচ্ছে না। প্রতি বছরই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। বন্যা জনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধির একটা কারণ এই, জনসংখ্যার চাপে নদীর প্লাবনভূমিতে ক্রমেই অনেক জনপদ গড়ে উঠছে। তাই প্লাবনভূমি যখন শুধুমাত্র কৃষির কাজে ব্যবহৃত হতো, তখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম ছিল।

ভারতের বিভিন্ন নদীগুলিতে কোন সময়ে সবচেয়ে বেশি বন্যা হয়েছিল, তা' দেখানো হয়েছে নিচের তালিকায়।

নদীর নাম	বন্যার স্থান	বন্যার জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	তারিখ
সিন্ধু নদী			
বিপাশা	মানডি সমতল ভূমি	২১৫·১৭	৬ অকটোবর, ১৯৫৫
রবি	মাধোপুর	৩৪৯·৭৬	৫ অকটোবর, ১৯৫৫
শতদ্রু	হরিকে	২১১·১৯	৬ অকটোবর, ১৯৫৫
গঙ্গা নদী			
গঙ্গা	গুরুমুক্তেশ্বর	১৯৯·০২	১৭ জুন, ১৯৬৩
গঙ্গা	বারাণসী	৭৪·৬৮	১৮৮২
গঙ্গা	পাটনা	৪৯·৬৫	৬ আগস্ট, ১৯৭১
গঙ্গা	নুরপুর	২২·৫৪	২৬ আগস্ট, ১৯৫৫
ঘর্ঘরা	তুরতিপার	৬৪·৬১	৩১ সেপটেম্বর, ১৯৬৯
বড় গণ্ডক	ভৈংসাহা	৯৬·৭১	২২ আগস্ট, ১৯৬১
রামগঙ্গা	রৈনি হেড ওয়ার্কস	২১১·৮৩	৬ আগস্ট, ১৯৬৯
রাপ্তী	বার্ডসঘেট	৭৬·৬৪	১৯২৫
যমুনা	তাজেওয়ালা	৩৮৫·৮৬	১৯২৪
যমুনা	দিল্লী	২০৬·৪৪	১৫ অকটোবর, ১৯৫৬
বাগমতী	হায়াঘাট	৪৬·৮৭	১৬ আগস্ট, ১৯৭০
বুড়ি গণ্ডক	সমস্তিপুর	৪৬·৮৫	২৬ আগস্ট, ১৯৭১
কামলা বালান	জয়নগর	৭০·৮৭	৯ জুলাই, ১৯৬৫

নদীর নাম	বন্যার স্থান	বন্যার জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	তারিখ
কোশী	বড়াক্ষেত্র	১৩১'৮০	৫ অকটোবর, ১৯৬৮
মহানন্দা	ইংলিশ বাজার	২৪'৮৪	১৯৩৮
ব্রহ্মপুত্র নদ			
ব্রহ্মপুত্র	ডিবরুগড়	১০৫'৪৬	১৭ জুলাই, ১৯৬৯
ব্রহ্মপুত্র	গৌহাটি	৫১'০৬	২৩ আগস্ট, ১৯৬২
ব্রহ্মপুত্র	ধুবড়ি	২৯'-৪	১ আগস্ট ১৯৭২
বুড়ি ডিহিং	খাওয়াং	১৩০'৪১	৩১ আগস্ট, ১৯৫৮
মানস	মাথানগুড়ি	১০০'৫৮	২৫ মে, ১৯৬২
সুবর্নসিরি	ভোনিপারঘাট	৯৬'৮৭	৯ আগস্ট, ১৯৫৭
বরাক	শিলচর	২১'৯৪	১৭ জুন, ১৯৫৯
তিস্তা	জলপাইগুড়ি	৮৯'২৫	৫ অকটোবর, ১৯৬৮
তোরসা	কোচবিহার রেলব্রিজ	৪২'৬০	২০ জুলাই, ১৯৬০
অন্যান্য নদী			
সাবরমতী	ধারোই	১৬৬'৮৮	১৯৫০
মাহী	কাদানা	১০৪'৯৪	১৫ সেপটেম্বর, ১৯৫৯
নর্মদা	ব্রোচ	১২'৬৫	৭ সেপটেম্বর, ১৯৬৮
সুবর্ণরেখা	রাজঘাট	৬'২৫	১৯৪৩
তাপ্তী	হোপ ব্রিজ	৩১'০৯	৬ আগস্ট, ১৯৬৮
ব্রাহ্মণী	জোনপুর	২২'৮০	১৯৬০
মহানদী	নারাজ	২৭'৮৬	১৯২৫
গোদাবরী	ধৌলিস্বরম	১৭'৭৫	১৬ আগস্ট, ১৯৫৩
কৃষ্ণা	বেজোয়াড়া	২৪'৩০	৭ অকটোবর, ১৯০৩
পেন্নার	বাঁধ অঞ্চল	৫৩৭'৩৬	২১ অকটোবর, ১৯৬২
কাবেরী	মেট্টুর বাঁধ	২৪২'২৫	২০ আগস্ট, ১৯৬১
ভবানী	খোদিয়ার অ্যানিকাট	২২৪'৯৪	২৬ অকটোবর, ১৯৩০

নদীর নাম	বন্যার স্থান	বন্যার জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	তারিখ
ভাইগাই	পিরনাই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র	১৯৩.৩৮	১ ডিসেম্বর, ১৯২২
বংশধারা	গোট্টা	৩৫.৬৬	১২ জুলাই, ১৯৬০
বুড়া বালাং	বারিপদা	১০.৪৪	১৯৬৭
বৈতরণী	আখুয়াপুদা	২১.৯৫	১৬ আগস্ট, ১৯৬০
ইমফল	ইমফল	৭৮২.৯৬	১৮ জুন, ১৯৬৩

ওপরের তালিকা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, নদীতে বন্যা হওয়ার দিনক্ষণের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। তাই নদীতে আসন্ন বন্যা সম্পর্কেও আগাম পূর্বাভাষ করবার কোন পদ্ধতি আজো আবিষ্কার করা যায় নি।

নদীতে জলপ্রবাহ বাড়লে দু'কূল ছাপিয়ে নদীতে বন্যা হবেই। তাই বন্যা পুরোপুরি রোধ করা যাবে না। তবে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বন্যার তীব্রতা কিছুটা কমানো সম্ভব। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আগেই হয়েছে। তবু এখানে আর একটু বিশদভাবে পদ্ধতিগুলো আলোচিত হলো।

নদীর দু'পাড় উঁচু করে দেওয়ালের মতো বাঁধিয়ে দিলে নদীখাতের জলধারণের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে বন্যার তীব্রতা কমে। বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ, অতিরিক্ত জলপ্রবাহের জন্য খাল খনন, ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতিতে বন্যার তীব্রতা ও বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে ফেলা সম্ভব। নদীর দু'পাড় উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া বন্যা এড়ানোর সবচেয়ে সহজ ও সস্তা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সুফলও খুব সহজে পাওয়া যায়। তবে এই কাজটি সুপরিকল্পনা মাফিক করা প্রয়োজন। যেমন, যে মাটিতে পাড় তৈরি হবে, তার রাসায়নিক ও অন্যান্য ভৌত গুণাবলী সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। মাটির তৈরি বাঁধ নদীর তীব্র স্রোত হয়তো সহ্য করতে পারবে না, তাই নদীর পাড়ের দেওয়াল তৈরি করতে হবে মূল নদীপ্রবাহ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, যাতে স্রোতের ধাককায় মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে না পড়ে।

ভারতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি প্রথম সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা হয় ১৯৫৪ সালে। সে বছরই জাতীয় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কার্যসূচী প্রথম গ্রহণ করা হয়। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে নদীখাতের দু'পাশের ৭,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ দেওয়াল (embankment), ১১,৫০০ কিলোমিটার জলনিকাশী খাল, ২০৫ টি নগর সুরক্ষা কর্মসূচী ও ৪,৬০০ টি গ্রামের উঁচু জায়গায় স্থানান্তরীকরণ। এতে মোট খরচ হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। এসব কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে ২ কোটি হেকটর বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের প্রায় ৭০ লক্ষ হেকটর জমিতে বন্যার প্রকোপ খানিকটা কমেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী হিসেবে যে সব কাজ হয়েছে বিগত বছরগুলিতে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

১) **নদীর পাড়ে দেওয়াল নির্মাণ :** বিগত একশো বছরে কোশী নদী বারবার তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত ১৩০ বছরে কোশী নদী ১১২ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে সরে গেছে। নদীখাতের এই অনবরত পশ্চিমদিকে সরে যাওয়ার ফলে প্রচুর উর্বর জমি বালিচাপা পড়ে অনুর্বর হয়ে গেছে। তাই নদীকে একটি নির্দিষ্ট খাতে ধরে রাখবার জন্য নদীর দু'পাড় বরাবর ২৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। নদীর দু'পাড়ের মধ্যে অনেকটাই দূরত্ব রাখা হয়েছে প্রায় ১২ থেকে ১৬ কিলোমিটার। ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প থেকে ২,৬৫,০০০ হেকটর জমি সুফল পেয়েছে।

কোশী নদীর মতো বাগমতী নদীর দু'কূল ছাপিয়ে প্রতিবছর বন্যা হতো। তাই ছায়াঘাট থেকে শুরু করে ঘুঘরি নদীর মিলনস্থল পর্যন্ত ২৪১ কিলোমিটার দূরত্ব দেওয়াল তৈরি করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরেকটি প্রকল্পে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে শুরু করে হায়াঘাট পর্যন্ত বাগমতী নদীর দু'পাড়ে তৈরি করা হয়েছে দেওয়াল।

উত্তরবঙ্গ ও বিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহানন্দা মিলিত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এই নদীর দু'পাড়ে যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য ২৯০ কিলোমিটার।

২) **নদীর বুকে জলাধার নির্মাণ :** বন্যারোধের উদ্দেশ্যে মহানদীর বুকে তৈরি হয়েছে হীরাকুঁদ বাঁধ। এর জলাধারের আয়তন প্রায় ৫২২ কোটি ঘন মিটার। এই বাঁধ তৈরি হবার আগে মহানদীর বদ্বীপ অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতো। কিন্তু বাঁধ তৈরি হবার পর সেরকম বড় আকারের

বন্যা আর হয় নি।

দামোদর নদী উপত্যকা প্রকল্পে দামোদর ও বরাকর নদীর বুকে তৈরি হয়েছে চারটি বাঁধ (কোনার, মাইথন, পানচেত ও তিলাইয়া)। এই চারটি জলাধারের মোট আয়তন ১৬০ কোটি ঘন মিটার। প্রকাশিত তথ্য থেকে বলা যেতে পারে, বাঁধ নির্মিত হবার পরে এই অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বেশ কমে গেছে।

তাপ্তী নদীর বুকে উকাই বাঁধ তৈরি হয়েছে মূলত সুরাট শহর ও নদীর নিম্নভূমিতে বন্যা রোধের জন্য। এই বাঁধ ও জলাধার তৈরি করবার পর এই অঞ্চলে বন্যা এড়ানো গেছে। বাঁধের জলাধারের আয়তন পর্যাপ্ত, তাই অনেকটাই জল ধরে রাখতে পারে।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী পাগলাদিয়ায় মাঝে মাঝে আচমকা তোড়ে জল আসে। ফলে এই নদীতে বন্যা হলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই এই নদীতে তৈরি হচ্ছে ছোট আকারের বাঁধ। আয়তন হবে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ ঘন ফুট। প্রস্তাবিত খরচের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা।

(৩) **খাল খনন করে অতিরিক্ত জল অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া ঃ** হিমালয়ে জন্মের পর ঘর্ঘর নদী ৪৪০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমণ করে রাজস্থানের বালিয়াড়িতে নিঃশেষ হয়ে যেত। ১৯৫৪ সালের পর ঘর্ঘর নদীতে জলপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রায়ই এই অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ শুরু হয়। তাই ঘর্ঘর নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ বিপদসীমার নিচে রাখবার জন্য নতুন একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী একটি খাল খনন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩৪০ কিউমেক (cumec) পরিমাণ জল রাজস্থানের একটি নিচু বালিয়াড়ি অঞ্চলে প্রবাহিত করা হচ্ছে। এভাবে একদিকে যেমন বন্যা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি মরুভূমি অঞ্চলও সুফলা হয়ে উঠছে।

(৪) **নদীর পাড়ের ক্ষয়রোধ ঃ** নদীর স্রোতে পাড় ভেঙ্গে প্রচুর উর্বর জমি, শহর চলে যায় নদীর গর্ভে। তাই নদীর পাড়ের ক্ষয়রোধ করা খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরি কাজ। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গার মতো বড় নদী ও এদের উপনদীর কূল ভেঙ্গে প্রতিবছর বহু ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ে ভাঙ্গন বেড়ে যাওয়ায় ফলে ডিবরুগড় শহরের নিরাপত্তা কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের কবল থেকে ডিবরুগড় শহরকে বাঁচাবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড় বরাবর পাথরের বাঁধ ও ১০

কিলোমিটার দীর্ঘ দেওয়াল নির্মিত হয়েছে। শুধু ডিবরুগড় শহর নয়, বিহারের মানসি শহরকে গঙ্গার ভাঙ্গন ও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরকে তিস্তার ভাঙ্গন থেকে বাঁচাবার জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

(৫) **জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ঃ** হরিয়ানার গুরগাঁও জেলা, রাজস্থানের ভরতপুর জেলা ও উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার কিছু অংশ বর্ষাকালের অধিকাংশ সময়ই জলমগ্ন হয়ে থাকত। কারণ এই অঞ্চলে জলনিকাশের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থার উন্নতির জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ১৯৬৭ সালে। ফলে ২৯,০০০ হেকটর জমিতে এখন সুফল ফলেছে।

একই ভাবে একটু বেশি বৃষ্টিপাত হলেই হরিয়ানা ও রাজস্থানের নাজাফগড় ঝিলের জল উপছে পড়ে আশেপাশের অঞ্চলও জলমগ্ন হয়ে পড়ত। এই অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বেশ কিছু কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে।

(৬) **খালের সংস্কার সাধন ঃ** কাশ্মীরের উলার হ্রদের নিচের দিকে ঝিলম নদীখাতের জলবহন ক্ষমতা কম হওয়ার ফলে হ্রদের জল প্রায়ই বেড়ে যেত। ফলে হ্রদের উপছে-পড়া জলে ডুবে যেত আশেপাশের প্রায় ৮,০০০ হেকটর পরিমাণ জমি। একটি প্রকল্পে উলার হ্রদ ও ঝিলম নদীর সংযোগস্থল মাটি কেটে (dredging) গভীরতর করায় জলনিকাশের ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে। ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে ১৯৭৮ সালে।

(৭) **নিচু গ্রামগুলিকে উঁচু জায়গায় স্থাপন ঃ** উত্তর প্রদেশের পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে রাপ্তী ও আশেপাশের নদীর দু'পাশের সব গ্রাম প্রায়ই বন্যার জলে ডুবে যেত। সমস্যাটা এমনই যে, দু'পাড়ে দেওয়াল তুলে সমস্যার সমাধান হতো না, কারণ সেক্ষেত্রে জলনিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হতো। তাই নতুন এক প্রকল্পে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪,০০০টি গ্রামকে নিচু ভূমি থেকে তুলে উঁচু ভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য ১৯৮০-৮১ সালে খরচ হয়েছে আনুমানিক ১৬৫ কোটি টাকা। ১৯৮১-৮২ সালে অনুমোদিত খরচের পরিমাণ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৩১ লক্ষ হেকটর জমিতে বন্যা-নিরোধক ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হচ্ছে।

সংযোজন

পশ্চিমবঙ্গের সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্য ডঃ অসীম দাশগুপ্তর সৌজন্যে। এগুলি নিচে দেওয়া হলো। পরবর্তী সংস্করণে অন্যান্য রাজ্যের তথ্য দেওয়া হবে।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (বড় ও মাঝারি)	প্রকল্প-শেষে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ (হাজার হেকটর)	ষষ্ঠ পরিকল্পনার সেচ-প্রাপ্ত জমির পরিমাণ (হাজার হেকটর)
১.	মেদিনীপুর খাল	৪৯·৩৭	৪৯·৩৭
২.	করতোয়া সেচ প্রকল্প	৮·৯০	৮·৯০
৩·	বড়াই খাল	৩·৬৩	৩·৬৩
৪.	সুরংকর দাউরা	২·৪৩	২·৪৩
৫.	ময়ূরাক্ষী	২৫০·৮৬	২৫০·৮৬
৬.	কংসাবতী	৪০১·৬৬	৩৯০·০০
৭.	দামোদর উপত্যকা	৫১৫·৩৮	৪৭০·০০
৮.	তিস্তা ব্যারেজ	৩৭৯·৬০	৪০·০০
৯.	হিংলো	১২·৩৮	১২·৩৮
১০.	শাহরা জোড়	৬·০০	৬·০০
১১.	১৮টি মাঝারি প্রকল্প	২৯·৭৪	২০·০০
	মোট	১,৬৫৯·৯৫	১,২৫৩·৫৭

(সূত্র : ইস্টার্ন রিজিওন্যাল মিটিং ফর ইরিগেশন ডেভেলপমেণ্ট ডিউরিং সিকস্‌থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, ১৯৮০-৮৫ ; ক্যালকাটা অগাস্ট ১৯৮২, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত)

নদী পরিবহন ও অন্যান্য

সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের চেয়েও আগে বোধহয় আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। নদী-নালা বেয়ে মানুষ ভ্রমণ করেছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজনে, পরে ব্যবসা বা সামাজিক প্রয়োজনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে নদী পরিবহন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত তেমন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে নি।

অথচ স্থল পরিবহনের চেয়ে জল পরিবহনের ক্ষেত্রে কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধে রয়েছে। যেমন, নদীতে ঘর্ষণ-জনিত শক্তিক্ষয় কম, তাই এক অশ্ব-শক্তি (horse power) শক্তিতে যেখানে নদীতে ৪,০০০ কেজি মাল পরিবহন করা সম্ভব, সেখানে সড়ক ও রেলপথে যথাক্রমে মাত্র ১৫০ কেজি ও ৫০০ কেজি মাল পরিবহন করা যায়। শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে সড়ক, রেল ও নদী পরিবহনের মধ্যে আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৩ ঃ ১০ ঃ ৮০। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায়, নদীপরিবহন সবচেয়ে সস্তা ও সহজ। পরিসংখ্যান থেকে একথা বলা যাবে না যে ভারতে নদীপরিবহনের গতি শ্লথ। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সড়ক, রেল ও নদীপথে ভারতে একদিনে যথাক্রমে ২৬০, ১৫০ ও ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে নদীপরিবহন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত একটি তথ্য থেকে জানা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক, রেল ও নদীপরিবহনের আনুপাতিক খরচ ৬৫ ঃ ১৫ ঃ ৩। এই তথ্য বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, নদী পরিবহনই খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সস্তা।

ভারতের নদীপথ

ভারতের নদী ও খাল মিলিয়ে মোট নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটার। কিন্তু সংস্কারের অভাবে পলি জমে যাওয়ায় এই জলপথের অধিকাংশই ব্যবহৃত হয় না। তবে এই জলপথের মধ্যে কেবলমাত্র ২,৫০০ কিলোমিটার স্টিমার চলাচলের উপযোগী, বাকিটা আপাতত শুধু নৌ-চলাচলের যোগ্য।

ভারতে নাব্য জলপথ যতটা রয়েছে, তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই রয়েছে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে। এই জলপথ মাল ও যাত্রী পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে এর পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

প্রধান নদীগুলির নাব্যতা সম্পর্কে সেসব তথ্য জানা গেছে, তা' মোটামুটি এই ঃ

সিন্ধু

খানদেল থেকে বারামুলা পর্যন্ত ঝিলম নদীর ১৭০ কিলোমিটার অংশ নৌ-চলাচলের যোগ্য। নদীর এই অংশের গভীরতা অন্ততপক্ষে ১·৩ মিটার। তাছাড়া ঝিলমের প্রবাহের এই অংশের মধ্যে পড়েছে তিনটি হ্রদ, —নাগিন, মানসবাল ও উলার। ঝিলমের এই নাব্য অংশগুলিতে দেখা যায় বেশ কিছু হাউসবোট বা ভাসমান ছোট ছোট হোটেল।

গঙ্গা

ফারাক্কা থেকে বেনারস হয়ে কানপুর পর্যন্ত গঙ্গানদী নৌকো চলাচলের যোগ্য। কিন্তু স্টিমার চলাচল করতে পারে পাটনা থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উজানে বকসার পর্যন্ত। ছোট আকারের নৌকো চলাচল করতে পারে যমুনা নদীতে লখনউ পর্যন্ত ; ঘর্ঘরা, রাপ্তী, গণ্ডক, কোশী নদীতে বর্ষাকালে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত। অন্য সময়ে আরো কম দূরত্ব পর্যন্ত। গঙ্গার খালগুলির ভেতর দিয়ে কেবল ছোটখাট নৌকো ছাড়া আর কিছুই আজকাল যাতায়াত করে না। ঘর্ঘরা নদীর বুকে দোরিঘাট থেকে গঙ্গার সংযোগস্থলে রাভেলগঞ্জ পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার, যমুনা নদীর বুকে এলাহাবাদ থেকে আফগাসি পর্যন্ত ১৮৮ কিলোমিটার, গোমতী নদীর বুকে গঙ্গার সংযোগস্থল থেকে নানগাঁও পর্যন্ত ২৮৩ কিলোমিটার পর্যন্ত জলপথে নৌযান চলাচল করে।

বিহারে নাব্য জলপথ গঙ্গার বুকে পাটনা থেকে বকসার (১৮৫ কিলোমিটার) এবং পাটনা থেকে রাজমহল (৪১৩ কিলোমিটার)। ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী ও শোন নদীর বুকে কিছুটা জলপথ।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাব্য জলপথ হলো গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলী অংশ। রাজমহল থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত গঙ্গানদী নাব্য। গঙ্গার সঙ্গে সংযোগস্থল থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ২৫০ কিলোমিটার ভাগীরথী নৌযান চলাচলের উপযোগী। তবে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে নৌ-

চলাচল করতে পারে না, কারণ গঙ্গার মুখ সেসময় বুজে থাকে। ফারাক্কা ব্যারেজ শেষ হবার পরে অন্য খাল দিয়ে ভাগীরথীতে জল পাঠানো হলে ভাগীরথী সারা বছরই নৌচলাচলের যোগ্য হয়ে উঠবে আশা করা যায়। এই কাজটি শিগগিরই হবে বলে আশা করা যায়। রূপনারায়ণ নদের ৮৩ কিলোমিটার অংশ নৌ-চলাচলযোগ্য। জোয়ারের সময় হলদি নদীর ৩২ কিলোমিটার নাব্য। এই অঞ্চলের চূর্ণি নদীর কিছুটা অংশ নৌ-চলাচল-যোগ্য। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ কিছু খাল রয়েছে, যা জোয়ারের সময় নৌ চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। চব্বিশ পরগণার বেলেঘাটা খালের গেঁওখালি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত অংশ নাব্য।

ব্রহ্মপুত্র

ব্রহ্মপুত্র নদে শুখনো মাসের তুলনায় বর্ষাকালে জলের উচ্চতা অনেক বেড়ে যায়। গৌহাটিতে প্রায় ৯ মিটার বাড়ে। সদিয়া থেকে কলকাতা—এই অংশটি আগে নৌ চলাচলযোগ্য ছিল। কিন্তু এখন নদীতে পলি জমে যাওয়ায় স্টিমার যেতে পারে গৌহাটি থেকে ৩২০ কিলোমিটার উজানে নিয়ামাটি পর্যন্ত। আরো উজানে যেতে পারে কেবল ছোট নৌকা।

সুবর্নাসিরি নদী ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সংযোগস্থল থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। বরাক নদী কাছাড় জেলার প্রধান জলপথ হিসেবে অনেক প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের তোরসা, তিস্তা ও মহানন্দা নদীতে ছোট ছোট নৌকো চালানো যায়।

নর্মদা ও তাপ্তী

সমুদ্রমুখ থেকে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত নর্মদা নদী নাব্য। তাপ্তী নদী সমুদ্রমুখ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুরাট বন্দর পর্যন্ত নাব্য।

সুবর্ণরেখা

সমুদ্রমুখ থেকে কেবলমাত্র ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নাব্য।

মহানদী ও ব্রাহ্মণী

সমুদ্রমুখ থেকে ৪১৬ কিলোমিটার ভেতরে সম্বলপুর পর্যন্ত মহানদী নাব্য। কটকের কাছে মহানদী ও উপনদী বিরূপার বুকে কয়েকটি অ্যানি-কাট রয়েছে। তিনটি সেচখাল—তালডাঙ্গা, কেন্দ্রাপাড়া ও হাই-লেভেল

ক্যানাল বদ্বীপ অঞ্চলে নৌচলাচলের সুযোগ করে দিচ্ছে। তালডাঙ্গা খাল প্রায় পারাদ্বীপ বন্দর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৮৩ কিলোমিটার নৌ-চলাচলের যোগ্য। কেন্দ্রাপাড়া ক্যানালের ৬২ কিলোমিটার নৌ-চলাচলের উপযোগী। এটি বৈতরণী নদীর সঙ্গে ব্রাহ্মণী নদীর যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ব্রাহ্মণী নদীর ৯৬ কিলোমিটার নাব্য। এর মধ্যে মোহনা থেকে ৪৮ কিলোমিটার জলপথে স্টিমার চলাচল করতে পারে।

গোদাবরী

দাউলাইস্বরম অ্যানিকাট থেকে উজানের দিকে ৩০৬ কিলোমিটার পর্যন্ত গোদাবরীর জলপথে নৌকো ও ৪০ টন স্টিমার যাতায়াত করতে পারে জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে। বছরের বাদবাকী সময় অবশ্য মাত্র ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নৌযান চলাচল করতে পারে। দাউলাই-স্বরম অ্যানিকাটের উজানে সেচ-খালের ভেতর দিয়ে নৌ চলাচল করতে পারে। গোদাবরীর দু'টি শাখা—গৌতমী গোদাবরী ও বশিষ্ট গোদাবরীতে সমুদ্র থেকে শুরু করে অ্যানিকাটের ৪০ কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত নৌযান যাতায়াত করতে পারে।

গোদাবরীর সঙ্গে সঙ্গমস্থল থেকে শুরু করে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত শবরী নদী নৌচলাচলযোগ্য।

কৃষ্ণা

সমুদ্র মোহনা থেকে শুরু করে কৃষ্ণা নদীর ৬৬ কিলোমিটার জলপথ নাব্য। এই নাব্য জলপথটি বেজোয়াড়া ব্যারেজের ৪০ কিলোমিটার নিচে। এই জায়গা থেকে জলপথে বেজোয়াড়া যেতে হলে কৃষ্ণার বদ্বীপ অঞ্চলের ক্যানাল দিয়েই যেতে হবে। বেজোয়াড়া ব্যারেজ থেকে উজানের দিকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কৃষ্ণা নদী নাব্য।

উপকূলবর্তী খাল

ভারতের তটরেখা অঞ্চলে যে সব খাল রয়েছে, তাদের মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) পূর্বতট খালসমূহ ও (২) পশ্চিমতট খালসমূহ।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার রসুলপুর নদী থেকে শুরু করে পূর্ব-তট খাল ওড়িশার বালেশ্বর জেলা পর্যন্ত প্রসারিত। ২১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পূর্বতট খাল সমুদ্র থেকে ২ থেকে ১১ কিলোমিটার দূরত্বে প্রবাহিত হয়েছে। এই খালটির কেবল অর্ধেক অংশ নৌ-চলাচল যোগ্য, কারণ

ওড়িশার অংশে পলি জমা পড়ে নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ ভারতে, কৃষ্ণা নদীর কোম্মামুরু খালের সঙ্গে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আরকট জেলার মারকানেরু ব্যাক ওয়াটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে বাকিংহাম ক্যানাল। এই ক্যানালের দৈর্ঘ্য ৪১৬ কিলোমিটার। কোম্মামুরু ক্যানাল থেকে সেচখাল বেয়ে কাঁকিনাড়া পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। সমুদ্রতট থেকে এই সেচখালের দূরত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১ থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে। এই ক্যানাল চওড়ায় ৬ থেকে ৯ মিটার, গভীরতা অন্ততপক্ষে ১ মিটার। মাদ্রাজ শহরের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বাকিংহাম ক্যানালের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে কুয়াম খাল।

তামিলনাড়ুর বেদারণ্য ক্যানাল ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই খালের ভেতর দিয়ে নাগাপত্তিনাম বন্দরে মাল পরিবহন করা হচ্ছে।

পশ্চিমতট ক্যানাল ত্রিবান্দ্রাম শহরের দক্ষিণ থেকে শুরু করে বালিয়াপতনম পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে বহু নদী, উপহ্রদ ও ব্যাকওয়াটারের সঙ্গে সংযোগ করেছে। সমস্ত পশ্চিমতট বিশেষত পোন্নানি থেকে শুরু করে কুইলন পর্যন্ত অঞ্চলে বেশ কিছু নাব্য জলপথ রয়েছে। তবে এর মধ্যে তিনটি জলপথে নৌ চলাচলের কিছুটা অসুবিধে রয়েছে। এগুলো হলো: ১) ৫ মিটার চওড়া ভারকালা টানেল, এটি উচ্চতায় ৫ মিটার ও ১ মিটার গভীর; ২) কডুনগাথুর অপ্রশস্ত খাল ও নিচু ব্রিজ; ৩) বাদাগাড়া ও বালিয়াপতনমের মধ্যে তিনটি ফাঁক (১৬ কিলোমিটার, ৮ কিলোমিটার ও ১৬ কিলোমিটার) রয়েছে।

মাঝারি ও ছোট নদনদী

পশ্চিম তট অঞ্চলের খালের কথা বাদ দিলেও এই অঞ্চলের ছোট নদনদী নৌচলাচলযোগ্য। গুজরাটের পূর্ণা নদী মোহনা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে নভসারি পর্যন্ত নৌচলাচলযোগ্য।

মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ৪৪টি নদী আছে, যাদের নাব্যতা সমুদ্রের জোয়ারের ওপর নির্ভরশীল। এসব নদীর নাব্য অংশের দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার। মোট দৈর্ঘ্য ৫৮০ কিলোমিটার। বোমবাই থেকে কোংকন পর্যন্ত নৌচলাচল করছে এই অঞ্চলের কিছু নদী ও উপকূল দিয়ে। এসব নৌযানে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করছে।

গোয়ার মাণ্ডভি নদী উপকূলের খাঁড়ি থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। এর উপনদীগুলিতে আরো প্রায় ৩০ কিলোমিটার নাব্য

জলপথ আছে। ৩০০ টন বজরা নদীর মোহনা থেকে ৪১ কিলোমিটার ভেতরে উসগাঁও শহর পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। এই অঞ্চলের জুভারি নদীও মোহনা থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত নৌচলাচলের উপযোগী। মূলত এই দু'টো নদীর মাধ্যমেই নিকটবর্তী খনি অঞ্চলের লোহার আকরিক মারমাগাঁও বন্দর হয়ে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। এই দু'টো নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে কামবারজুয়া ক্যানাল; যা বর্ষাকালে সহজেই ব্যবহার করা যায়। করনাটকের পশ্চিমতট অঞ্চলে রয়েছে পনেরোটি নাব্য নদী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিনদী (২৯ কিলোমিটার নাব্য জলপথ), গুরপুর (১৯ কিলোমিটার নাব্য জলপথ) ও শারাবতী (২৯ কিলোমিটার নাব্য জলপথ)। ম্যাঙ্গালোর বন্দর গড়ে উঠেছে গুরপুর নদীর তীরে।

কেরালার ৪৪টি নদী আরব সাগরের জলে মিশেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই অংশত নাব্য। এই জলপথে প্রতি বছর ৪০ লক্ষ টন মাল পরিবাহিত হচ্ছে।

ওড়িশার মাতাই ও বুড়িবালাম নদী মোহনা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত নৌচলাচলযোগ্য।

সামগ্রিক জলপরিবহনের পরিকল্পনা

সমস্ত ভারতের জন্য একটি সামগ্রিক জলপরিবহনের পরিকল্পনার কথা প্রথম চিন্তা করেন স্যার আরথার কটন। জলপরিবহনের যে কত সুবিধে সেকথা হৃদয়ঙ্গম করে গোদাবরী নদী সম্পর্কে তিনি লেখেন, স্থলপথে কার্পাস পরিবহন না করে যদি তা' গোদাবরী, পরে অন্য সংযোগখাল ও গঙ্গানদীর মাধ্যমে পরিবাহিত হতো, তবে অর্থের দিক থেকে কতটাই না সাশ্রয় হতো! আমেরিকার মিসিসিপি নদীর মাধ্যমে মাল পরিবহনের খরচ প্রতি মাইল ও প্রতি টনে মাত্র ১/৬ পেনি। এই খরচের হিসেবও ভারতে নদী পরিবহন ব্যাপকভাবে চালু হলে যে প্রচুর লাভ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জল পরিবহনের জন্য তিনি যে খসড়া পরিকল্পনা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলপথগুলি এই রকম ঃ

১) উত্তর-পশ্চিম বাহিনী জলপথ, যা বোমবাইয়ের সঙ্গে সিন্ধু নদীর সংযোগ ঘটাবে।

২) দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী খাল, যা কন্যাকুমারিকার সঙ্গে সংযোগ করবে কালিনদীর।

৩) কন্যা কুমারিকার সঙ্গে কলকাতার সংযোগকারী খাল।

৪) কলকাতা থেকে হুগলি ও গঙ্গা নদী হয়ে কানপুর পর্যন্ত নাব্য জলপথ।

৫) এলাহাবাদ থেকে চম্বল, নর্মদা, ওয়েনগঙ্গা হয়ে গোদাবরী পর্যন্ত।

৬) ভীমা, তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার নদী হয়ে পূর্বতট খাল পর্যন্ত।

৭) মাদরাজ থেকে কালিকট পর্যন্ত জলপথ।

৮) ওয়েনগঙ্গা ও মহানদী হয়ে কটক পর্যন্ত।

৯) তাপ্তী নদীর সঙ্গে ওয়ার্ধা হয়ে গোদাবরী পর্যন্ত।

ডঃ আরথার কটনের এই জলপথের পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায়, এটি রূপায়িত হলে ভারতের পরিবহন-সমস্যার অনেকটাই মিটে যেত। জল পরিবহনের খরচ অনেক কম হওয়ার ফলে এখানে উৎপাদন খরচও হতো অনেক কম।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন বিভিন্ন প্রধান নদীগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। অবশ্য এজন্য সমীক্ষার কাজ এখনো শুরু হয় নি।

জাতীয় জলরেখা

জাতীয় জলরেখার (National Water Grid) জন্য খনন করা হবে অসংখ্য খাল, যা বিভিন্ন প্রধান নদীবাহিনীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রধান নদীগুলির মধ্যে এমনভাবে সংযোগ তৈরি হবে যাতে এক নদীর উদ্বৃত্ত জল প্রবাহিত করা যায় ঘাটতি জলপ্রবাহ অঞ্চলে। এর ফলে জলবণ্টনের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য খানিকটা ঘুচবে। বিভিন্ন নদীর মধ্যে যোগাযোগ হবে প্রধানত দু'ভাবে—(১) পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও (২) উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে। এক নদী উপত্যকার জল আর এক নদী উপত্যকায় প্রবাহিত করার পরিকল্পনা ভারতে নতুন নয়। এ ধরনের কিছু কিছু প্রকল্প অতীতেও কার্যকরী করা হয়েছে, এবং এখনো হচ্ছে। এ ধরনের প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম দেওয়া হলো নিচে ঃ

১) পেরিয়ার প্রকল্প, ২) কুরনুল-কাড্ডাপা খাল ৩) পরমবিকুলম-আলিয়ার প্রকল্প, ৪) রাজস্থান খাল ৫) বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ খাল,

৬) রামগঙ্গা থেকে গঙ্গায় জলপ্রবাহিত করার প্রকল্প।

জাতীয় জলরেখার জন্য যে বড় প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে, তা, আসলে এইসব ছোট মাঝারি প্রকল্পের পরিবর্ধিত রূপ।

জাতীয় জলরেখার রূপায়ণের জন্য প্রস্তাবিত প্রধান প্রকল্পগুলির নাম দেওয়া হলো নিচে ঃ

১) গঙ্গার সঙ্গে কাবেরীর সঙ্গে সংযোগসাধন। এই সংযোগকারী খালগুলি পেরোবে শোন, নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার নদী-উপত্যকার ভেতর দিয়ে।

২) ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগসাধন।

৩) নর্মদা থেকে খাল খনন করে গুজরাট ও পশ্চিম রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলে জল প্রবাহিত করা।

৪) চম্বল নদী থেকে খাল খনন করে মধ্য রাজস্থানে জল প্রবাহিত করা।

৫) পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত নদীগুলির সঙ্গে পূর্বঘাট অঞ্চলের নদীগুলির সঙ্গে সংযোগসাধন।

গঙ্গা-কাবেরী সংযোগ প্রকল্প

ভারতের অধিকাংশ নদনদীই পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রবাহিনী। নদী-প্রবাহের এই বিন্যাসের জন্য ঠিক হয়েছে উত্তর-দক্ষিণমুখী কোন খাল খনন করা হলে ভারতের প্রায় সব নদীর সঙ্গেই তা' যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে।

এই পরিকল্পনার মোদ্দা কথা, বর্ষার সময় পাটনার কাছে গঙ্গা থেকে অতিরিক্ত জল পাওয়া যাবে। তাই পাটনার কাছে একটি ব্যারেজ তৈরি করে ১,৭০০ কিউমেক (৬০,০০০ কিউসেক) জল পাম্প করে বইয়ে দেওয়া হবে দক্ষিণমুখী খালের ভেতর দিয়ে। এই জলের মধ্যে ২৯০ কিউমেক (১০,০০০ কিউসেক) জল ব্যবহৃত হবে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের দক্ষিণাংশের শুখনো অঞ্চলের তৃষ্ণা মেটাতে। বাকি ১,৪১০ কিউমেক (৫০,০০০ কিউসেক) জল বছরের মধ্যে ১৫০ দিন পাঠানো হবে গঙ্গা-উপত্যকার বাইরে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, করনাটক ও তামিলনাড়ুর খরা-প্রবণ অঞ্চলে।

গঙ্গা নদী থেকে দক্ষিণ ভারতে জল প্রবাহিত করতে হলে বিন্ধ্য পর্বত তো অতি অবশ্যই পেরোতে হবে। এজন্য গঙ্গার জল পাম্প করে তুলতে হবে ৩৩৫ থেকে ৪০০ মিটার। স্বাভাবিক কারণেই জল উত্তোলন ও

প্রবাহনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে শোন ও অন্যান্য উপনদীর বাঁধ।

শোন নদীর খাত বরাবর জল প্রবাহিত হয়ে পড়বে নর্মদা নদীর বাগারি জলাধারে। প্রস্তাবে রয়েছে, এই জলাধার থেকে দক্ষিণমুখী জলধারা প্রবাহিত হবে ওয়েনগঙ্গা, প্রাণহিতা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার নদী হয়ে কাবেরী নদীতে। শোন নদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত প্রস্তাবিত খাল ও নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার। আর এখান থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৯৬০ কিলোমিটার। যাতে কম পাম্প করতে হয় এজন্য অন্য জলপথের যাথার্থ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এতে খাল ও নদীখাতের দৈর্ঘ্য অনেকটাই বেড়ে যাবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে কোন জলপথ গৃহীত হবে, তা নির্ভর করছে গঙ্গা-কাবেরী সংযোগ সম্পর্কিত সমীক্ষার ওপর।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গাসংযোগ প্রকল্প

শুখনো গ্রীষ্মের দিনেও ব্রহ্মপুত্র নদে জলপ্রবাহের পরিমাণ ৩,৫০০ থেকে ৫,০০০ কিউমেক। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জলের চাহিদার তুলনায় এই জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। কিন্তু অন্যদিকে বছরের শুখনো মাসগুলিতে ভারত ও বাংলাদেশের নানা প্রয়োজন মেটাতে গঙ্গার জলের চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রহ্মপুত্র থেকে অতিরিক্ত জল পাওয়া গেলে গঙ্গা নদীর নিম্নাংশে জলঘাটতির সমস্যা খানিকটা মেটানো যেতে পারে।

প্রস্তাব রয়েছে, এজন্য ব্রহ্মপুত্রের বুকে ধুবড়ির কাছে একটি ব্যারেজ তৈরি হবে। সেই ব্যারেজ থেকে একটি ফিডার ক্যানাল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ফারাক্কার ৩২০ কিলোমিটার উজানে গঙ্গার সঙ্গে মিশবে। এই প্রকল্প থেকে বাংলাদেশেরও কিছুটা সুবিধে হবে। কারণ এই ফিডার ক্যানালের জলের খানিকটা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার কাজে লাগানো যাবে। শুধু তাই নয়, ভারত ও বাংলাদেশ—এই দু'দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনও চলবে এই ফিডার ক্যানালের মারফৎ। প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধুবড়ির কাছে ব্রহ্মপুত্র থেকে ১,১৫০ কিউমেক পরিমাণ জল ফিডার খালের ভেতর দিয়ে পাঠানো যাবে। এই অঞ্চলের ভূ-সংস্থান (topography) তেমন উঁচু-নিচু নয়, তাই ব্রহ্মপুত্র থেকে গঙ্গায় পাঠাতে জল পাম্প করে ওপরে তুলতে হবে মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিটার।

ভূগর্ভের জলসম্পদ

যে জল প্রতিদিন ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হচ্ছে, তার একভাগ দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে আবহমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যায়, আর একভাগ নদী-নালার আকারে ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, অন্য একভাগ ভূপৃষ্ঠের নিচে চলে গিয়ে আশ্রয় নেয় শিলাস্তরে। এই শেষোক্ত জলকেই বলা হয় ভূ-জল অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত জল। তবে ভূ-গর্ভের একাংশ আবার ঝরণার আকারে ফিরে আসে ভূপৃষ্ঠে।

মোট জলের কতটা বাষ্পীভূত হবে, কিংবা নদী-নালায় বয়ে যাবে অথবা ভূ-জলে পরিণত হবে, তা' নির্ভর করে কোন জায়গার জলবায়ু, ভূ-সংস্থান এবং শিলার গঠন – এই তিনটি মূল কারণের ওপর। শিলার গঠন বলতে এখানে অবশ্য বোঝায় শিলার সছিদ্রতা (porosity) এবং প্রবেশ্যতা (permeability)।

ভূপৃষ্ঠের নিচে কোন এক গভীরতায় সমস্ত শিলাস্তর ভূ-জলে পরিপৃক্ত (saturated) থাকে, অর্থাৎ শিলাস্তরের সমস্ত ছিদ্রই জলে টইটুম্বুর। ভূপৃষ্ঠের গভীরে যে তলের নিচে সব শিলাস্তরই জলে পরিপৃক্ত, তার বৈজ্ঞানিক নাম জলপীঠ (water table)। জলপীঠ সাধারণত সমতল হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' ভূপৃষ্ঠের ভূ-সংস্থানের সমান্তরাল। জল-বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এই জলপীঠের নিচের সমস্ত জলকেই বলা হয় ভূ-জল এবং এই অঞ্চলকে বলা হয় পরিপৃক্ত অঞ্চল।

ভারতবর্ষের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে জলের ভূমিকা অসাধারণ। এছাড়া সাম্প্রতিক দ্রুত শিল্পায়নের তাগিদে জলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই প্রয়োজন মেটাতে শুধু নদী-নালার জল নয়, ভূগর্ভস্থিত জলের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের আয়োজন চলছে। অবশ্য ভারতের মতো সুপ্রাচীন দেশে ভূ-জলসম্পদ কাজে লাগানোর চেষ্টা এই প্রথম নয়। মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর দুর্গের ভেতর মধ্যযুগে জলবণ্টন-ব্যবস্থায় ভূ-জল আহরণের বন্দোবস্ত দেখে খুবই অবাক হতে হয়।

স্বাধীনতার পর ভারতে শুধু কৃষিব্যবস্থা নয়, ছোট, বড় বা মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনে ভূ-জলের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ভারতের বড় বড় শহর কলকাতা, দুর্গাপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী, কানপুর ইত্যাদি জায়গায়ও ভূ-জলের কদর বেড়েই চলেছে।

ভূ-জলবিজ্ঞানীদের হিসেবমতো, ভারতে প্রতি বছর ২·৭৫ কোটি ঘন মিটার জল পাওয়া যেতে পারে। এই জল থেকে প্রায় ৪ কোটি হেকটর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব।

ঝরণার কথা আগেই বলা হয়েছে। জল-পীঠের (water table) সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের মিলনস্থলেই গড়ে ওঠে অজস্র ঝরণা। এই ধরনের ঝরণা থেকে বেশ কিছু খনিজ সম্পদও পাওয়া সম্ভব। সাধারণত ঝরণার জলে মিশে থাকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের বাইকারবনেট, ক্লোরাইড এবং সালফেট; সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ, বোরাক্স ইত্যাদি এবং কারবন ডাইঅকসাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। আবার কখনো বা Fe_2O_3, অ্যালুমিনিয়াম এবং পটাশিয়াম সল্টও মিশ্রিত থাকে।

এ ধরনের ঝরণার দেখা মিলবে বিহারের রাজগীর এবং সীতাকুণ্ড, গাড়োয়ালের বদরীনাথ এবং যমুনোত্রী, পশ্চিমবাংলার বক্রেশ্বর (বীরভূম) ইত্যাদি স্থানে। এইসব ঝরণার জলের উত্তাপ কোথায় কোথায়ও এতই বেশি, যা মাঝে মধ্যে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পেঁছে যায়।

ভূস্তরে ভূ-জলের অবস্থান প্রধানত দু'টি অঞ্চলে –

(১) পরিপৃক্ত অঞ্চল (zone of saturation) এবং

(২) বায়বীয় অঞ্চল (zone of aeration)।

পরিপৃক্ত অঞ্চলে শিলাস্তরের সমস্ত খালি জায়গা, ছিদ্র, ফাটল ইত্যাদি সবসময়ই জলে পরিপূর্ণ এবং সেই জলের চাপও থাকে।

কিন্তু বায়বীয় অঞ্চলে শিলাস্তরের কিছুটা অংশ বায়ু এবং কিছুটা অংশ জলে ভর্তি থাকে।

একথা আগেই বলা হয়েছে, জলপীঠের (water table) নিচে যে জল থাকে, তারই নাম ভূ-জল। এই জল থাকে শিলাস্তরের পরিপৃক্ত অঞ্চলে। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সংস্থান যথাযথ হলে তবেই ভূ-জল নিরাপদে ভূ-স্তরে সংরক্ষিত হতে পারে।

ভূ-জল সংরক্ষণের দিক থেকে ভূ-স্তরের শিলাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) নরম পাথর (soft rock)। এর আবার তিনটি ভাগ, (ক) অসংহত (unconsolidated) – পলিমাটি, বালি ইত্যাদি, (খ) অল্প-সংহত (semiconsolidated) – ভঙ্গুর বালিপাথর ইত্যাদি, (গ) সংহত (consolidated) – বালিপাথর, শেল, স্লেট ইত্যাদি। (২) শক্ত পাথর

(hard rock) – গ্র্যানাইট, নাইস, মার্বেল ইত্যাদি।

ভূ-স্তর থেকে যে ভূ-জল আহরণ করা হয়, তার বেশির ভাগই পাওয়া যায় (১) (ক) জাতীয় পাথর থেকে। এ ধরনের জল সাধারণত মেলে নদী-উপত্যকা অঞ্চলে। ছিদ্রযুক্ত বালিপাথরেও ভূ-জল সঞ্চিত হয়। আর শক্ত পাথরের ফাটলে এবং ক্ষয়িত অংশে ভূ-জল থাকবার সম্ভাবনা।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভূতাত্ত্বিক সংস্থানই ভূ-জলের সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং জলবায়ু স্বভাবতই এ রাজ্যে ভূ-জলের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর ভাগের পাহাড়ী এবং পাহাড়ী ঢাল অঞ্চল এবং জেলার পশ্চিমে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে ভূ-জলের সঞ্চয় বেশি নয়। এই অঞ্চলগুলি বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাদবাকি অঞ্চল গাঙ্গেয় পলিমাটিতে ঢাকা। এই গাঙ্গেয় পলিভূমিতে বালি ও বালিমাটির স্তরগুলি ভূ-জলের ভাণ্ডার। পলিভূমির ভেতরে কোথায় রয়েছে প্রয়োজনীয় ভূ-জল সম্পদ, এই গোপন কথাটি বেরিয়ে আসে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যে নলকূপ বসাবার কাজ হয়েছে, তাতে ভূ-স্তরের ভেতরে সঞ্চিত জলের অনেক কথাই জানা গেছে।

এবার পশ্চিমবঙ্গের ভূ-জল সম্পদের একটা গাণিতিক চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ভারতের সব জায়গায় সমান নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত বৃষ্টির প্রাচুর্য এবং উপযুক্ত ভূ-জলবাহী স্তরের বিন্যাসের ফলে এ রাজ্যে ভূ-স্তরের জলভাণ্ডার বিরাট এবং আনুপাতিক হিসেবে, ভারতে এ রাজ্যের স্থান প্রথম (সুরজিৎ গুহ, ১৯৭৬)। এ রাজ্যে গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার প্রায় ৬০ লক্ষ হেকটর জমির নিচে ৫০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতার মধ্যেই প্রচুর জলবাহী স্তর রয়েছে। অবশ্য উত্তরবঙ্গ এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য জল রয়েছে ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত। সমস্ত পলিভূমি অঞ্চলে ১ থেকে ৮ মিটারের মধ্যেই ভূ-জল পাওয়া যায় এবং বেশির ভাগ অঞ্চলেই বড় ব্যাসের নলকূপ দিয়ে ঘণ্টায় ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ গ্যালন জল পাওয়া সম্ভব। রাসায়নিক দিক থেকে এ জল সব রকম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, যদিও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় লোহা এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গে লবণের

আধিক্য রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-জল সম্পদের পরিমাণ আশাব্যঞ্জক হলেও চাষবাসের কাজে তেমনভাবে লাগানো হচ্ছে না। যদিও একথা সহজেই বলা যায় এ রাজ্যের সেচবিহীন অঞ্চলের একটি বড় অংশে ভূজলের সাহায্যে এক বা একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব। তবে আশার কথা, গত কয়েক বছর ধরে ভূ-জল সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে চেতনা বেড়েছে। হয়তো ষষ্ঠ যোজনার শেষে গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে আরো বেশি জমিতে ফলন সম্ভব হবে।

শিল্পের প্রয়োজনে জল

ভারতে এখন শিল্পের প্রসার বাড়ছে। গত তিন দশকে এখানে বেশ কিছু নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও আরো হচ্ছে। যেহেতু অধিকাংশই বড় বড় শহরের আশেপাশে অবস্থিত, তাই এসব শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ পড়ছে। বোঝা যায়, আগামী বছরগুলিতে আরও চাপ বাড়বে।

জল-সরবরাহের দিক থেকে প্রধান শিল্পগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থা। দ্বিতীয়ভাগে কাগজ শিল্প। এর প্রয়োজনে লাগে সিংহভাগ জল। এক টন কাগজ তৈরি করতে জল প্রয়োজন ২ থেকে ১০ লক্ষ লিটার। এক টন জ্বালানির জন্য প্রয়োজন ২০,০০০ লিটার। আর এক টন অপরিশুদ্ধ পেটরোলিয়ামের জন্য লাগে ৩০,০০০ লিটার। রসায়ন শিল্পের বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করতে জল লাগে টন প্রতি ৫০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ লিটার। বয়নশিল্পে টন প্রতি উৎপাদন করতে জল চাই ৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ লিটার। খনি শিল্পে এক টন আকরিক উত্তোলন করতে প্রয়োজন প্রায় ৩,০০০ লিটার জল। ৪০,০০০ টন ব্লাস্ট ফারনেসের জন্য ৬০,০০০ লিটার জল লাগে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক টন কয়লার তৃষ্ণা মেটায় ৩,০০,০০০ লিটার জল। বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করতে টন প্রতি জল লাগে ৮,০০,০০০ লিটার।

একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে জলের চাহিদা ছিল ১,১০০ কোটি ঘন মিটার। দেশে জল-সরবরাহের পরিমাণের তুলনায় জলের চাহিদার পরিমাণ তেমন বেশি নয়। তবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হলে মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা

দেয়। অথবা এমন কিছু কিছু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে জলের যোগান কম। যেমন ধরা যাক, ব্যাঙ্গালোর শহরের কথা। এই শহরের আবহাওয়া ভালো, জলবিদ্যুৎও যথেষ্ট, কিন্তু জলের সরবরাহ কম। জল আনতে হয় ১২০ কিলোমিটার দূরে থেকে। হায়দ্রাবাদ শহরেও জলের ঘাটতি রয়েছে। কলকারখানায় যে জল ব্যবহৃত হয়, তা' নিষ্কাশনে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। বিশেষত রাসায়নিক শিল্পগুলিতে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা' শোধন না করে কারখানার বাইরে নদী-নালায় পাঠালে স্বভাবতই তা' জন-জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই কলকারখানায় ব্যবহৃত দূষিত জল শোধন করে কীভাবে আবার তা' ব্যবহার করা যায়, এ ব্যাপারে নানা গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। শিল্পের ফলে জলে দূষণ হয় দু'ভাবে। প্রথমত উত্তাপ জনিত দূষণ, দ্বিতীয়ত পরিত্যক্ত আবর্জনা-জনিত দূষণ। শিল্পে পরিত্যক্ত তাপ জলের সাহায্য আশেপাশের পুকুর, নদী কিংবা সাগরের জলে পরিবাহিত হয়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন সংশয় হয়। বিশেষ কয়েকটি শিল্পের জন্য আমাদের জল কী পরিমাণে দূষিত হচ্ছে, তার আনুমানিক হিসেব এই রকম (প্রতিটি শিল্পের নামের পাশে প্রতি টন উৎপাদনে নিষ্কাশিত দূষিত জলের পরিমাণ গ্যালনে দেওয়া হলো): রাসায়নিক সার: ১,৫০০—২,০০০; তেল শোধনাগার: ৩৫০—৪৫০; চামড়া শিল্প: ৩০০—৪০০; সুতীবস্ত্র শিল্প: ৩০,০০০—৯০,০০০; ইসপাত ৭০—১,০০০; কাগজ ও বোর্ড: ৫০—১০০০।

পানীয় জল সরবরাহ

পান করবার জন্য ও সাংসারিক প্রয়োজনে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত জল প্রয়োজন। এজন্য গ্রামীণ অঞ্চলে জনপ্রতি প্রতিদিন ৪৫·৫ লিটার ও শহর অঞ্চলে ১৩৭ লিটার জল পাওয়া যাচ্ছে। তবে কাপড় চোপড় কাচা, আগুন নেভানো—এসব নানা কাজের জন্য জলের যোগান আরো বাড়ানো হচ্ছে।

সারা পৃথিবীর মতো ভারতেও মানুষজন গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। কারণ কারো অজানা নয়। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯৮২ সালে সারা ভারতে পানীয় জলের আনুমানিক চাহিদা ছিল ৪,০০০ কোটি ঘন মিটার। এই জল নদনদীতে প্রবাহিত জলের শতকরা মাত্র ২·২৫ ভাগ।

গ্রামীণ অঞ্চলে পানীয় জল আহরিত হয় কুঁয়ো থেকে। ভারতের

৫,৭০,০০০ গ্রামের অধিকাংশ গ্রামেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতের যে সব অঞ্চলে শক্ত কঠিন পাথরের আধিক্য, সেখানে পানীয় জল সংগ্রহ করা বেশ সমস্যাদায়ক ব্যাপার। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এসব জলে ফ্লোরাইড অথবা অন্যান্য অবস্থিত খনিজ পদার্থের আধিক্য। তাই গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা সবচেয়ে জরুরী কাজ। যদিও এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে যথেষ্ট অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন, তবু জাতীয় স্বার্থে একেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অবশ্য পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা শহরেও বাড়ছে, কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধে একই মাত্রায় বাড়ানো যাচ্ছে না। কারণ অধিকাংশ শহরের ক্ষেত্রেই জল আনতে হয় অনেক দূর থেকে।

দেশের চারটি বড় শহর—দিল্লী, বোমবাই, মাদরাজ ও কলকাতার পানীয় জল-সরবরাহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিচে পরিবেশিত হলো।

দিল্লী

পৌর প্রতিষ্ঠানের মারফৎ দিল্লী শহরে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা হয় ১৮৬৯ সালে। আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৯৬ সালে। এজন্য যমুনা নদীর তীর বরাবর ৮৬টি কুঁয়ো খোঁড়া হয়। হিসেব ছিল এই কুঁয়োগুলি থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ গ্যালন জল পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাওয়া গেল এর অর্ধেক। তবে তখন দিল্লীর লোকসংখ্যা ছিল কম, মাত্র দু'লাখ। দিল্লী ভারতের রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হবার পর, বিশেষত ১৯৪৭ সালের পর থেকে দিল্লীর লোকসংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। বর্তমানে দিল্লীর লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী।

বর্তমানে প্রতিদিন দিল্লী শহরে প্রায় ১০০ কোটি লিটার জল সরবরাহ হচ্ছে যমুনা নদী ও কাছাকাছি কুঁয়োগুলি থেকে। তবে বেশির ভাগ জলই যাচ্ছে নদী থেকে। বাড়ি বাড়ি পাঠাবার আগে জল ফিলটার ও পরিশোধন করে নেওয়া হচ্ছে। যমুনা নদী দিল্লী শহরের ভেতর খুবই এঁকেবেঁকে গেছে। তাই অতীতে প্রয়োজন মাফিক জল সব সময় যমুনা নদী থেকে পাওয়া যায় নি। এজন্য ১৯৫৮ সালে যমুনা নদীর বুকে একটি বাঁধ নির্মিত হলে এই সমস্যা খানিকটা মেটে।

জনসংখ্যার বর্তমান হার লক্ষ করলে বোঝা যায়, বিশ শতকের শেষে দিল্লীর জনসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ভবিষ্যতের সেই বিশাল সংখ্যক দিল্লীবাসীর পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হলে প্রতিদিন প্রায়

২২৮ কোটি লিটার জল সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া কলকারখানার প্রয়োজন মেটাতে আরো একই পরিমাণ জল প্রয়োজন। অর্থাৎ ২,০০০ সালে দিল্লী শহরের জন্য প্রয়োজন হবে ৪৫৫ কোটি লিটার জল বা ৫২˙৬ কিউমেক (প্রতি সেকেন্ডে ঘন মিটার)। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশ সরকার রামগঙ্গা জলাধার থেকে ৫˙৭ কিউমেক পরিমাণ জল সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে। যমুনা নদী থেকে পাওয়া যাবে ১১˙৩ কিউমেক পরিমাণ জল। ওখলা ও অন্য কয়েকটি জায়গায় দূষিত জল পরিশোধন করে পাওয়া যাবে আরো ৫˙৭ কিউমেক পরিমাণ জল। পং বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হলে রবি ও বিপাশা নদী থেকে আরো অন্তত ৫˙৭ কিউমেক পরিমাণ জল পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে মোট জলের পরিমাণ হবে ২৮ কিউমেক। বাকি জলের জন্য হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরো কিছু জলাধার তৈরি করতে হবে। সাম্প্রতিক কালে দিল্লী শহরে জল সরবরাহের পরিমাণ কীভাবে বেড়েছে—এই পরিসংখ্যানের ওপর চোখ রাখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রতিদিন ৪৫˙৫ লক্ষ লিটার দিয়ে শুরু করে এই শতাব্দীর শেষে ৪৫,৫০০ লক্ষ লিটার প্রতিদিন সরবরাহ করেও কুলোনো যাবে কিনা সন্দেহ।

দিল্লী শহরে জল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য সম্প্রতি আরো বেশ কিছু বড় আকারের কুঁয়ো খোঁড়া হচ্ছে। এই কুঁয়োগুলির ভেতরের ব্যাস ৫ মিটার, কুঁয়োর দেওয়ালের বেধ ½ মিটার। এই কুঁয়োগুলির নিচের দেওয়ালের সঙ্গে অনেকগুলি বড় পাইপ লাগানো আছে, যাতে কাছের জলবাহী আর্টেজিয় (artesian) স্তর থেকে সহজে কুঁয়োর ভেতরে জল আসতে পারে। এই কুঁয়োগুলির গভীরতা প্রায় ১০ মিটার, তাছাড়া কুঁয়োর তলা ২˙৫ মিটার বেধের কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। এসব কুঁয়োগুলির প্রতিটি থেকে প্রায় ১১৩˙৮ লক্ষ লিটার জল পাওয়া যায় প্রতিদিন।

বোমবাই

বোমবাই শহরে জল সরবরাহের জন্য চারটি বড় জলাধার রয়েছে। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ভালো, তাই জলাধারগুলি প্রায় সব সময়েই জলে ভর্তি থাকে। এই চারটি জলাধার থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৪৮ কোটি লিটার জল সরবরাহ করা হয়। এদের মধ্যে বৈতর্ণ ও উচ্চ বৈতর্ণ বাঁধের জলাধার থেকে প্রতিদিন ১০০ কোটি ১০ লক্ষ লিটার জল পাওয়া যাচ্ছে। তাংসা হ্রদ দিচ্ছে ৩১ কোটি ৮৫ লক্ষ লিটার, বিহার ও তুলসি হ্রদ প্রতিদিন

যথাক্রমে দিচ্ছে ৫ কোটি লিটার এবং ১ কোটি ৮২ লক্ষ লিটার জল। উল্লাস নদী থেকে প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে ৯ কোটি ১০ লক্ষ লিটার। বাকি ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ লিটার জল অন্য জায়গা থেকে আসছে।

বাঁধের জল পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত। তাই এই জল ফিলটার না করে কেবলমাত্র ক্লোরিন মিশিয়েই বাড়ি বাড়ি পাঠানো হচ্ছে। হ্রদের অবস্থান বোমবাই শহরের চেয়ে উঁচুতে। তাই পাম্প ছাড়াই জলাধার থেকে পাইপের ভেতর দিয়ে সহজ গতিতে জল বোমবাই শহরে পেঁছয়। শহরের লোকসংখ্যা এখন ৬০ লক্ষের বেশি এবং এই শতাব্দীর শেষে এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। কলকারখানার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও বর্ধিত মানুষের চাহিদা মেটাতে এই শতাব্দীর শেষে জলের চাহিদা হবে প্রতিদিন ৩৮৭ কোটি লিটার জল। ভবিষ্যতের এই জলের চাহিদা মেটাতে ভাতসাই উপত্যকার দিকে হাত বাড়ানো হয়েছে এবং এই উপত্যকা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার জল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

জলাধার থেকে বোমবাই শহরে আনবার পথে বেশ কিছু কলকারখানা ও জনপদে জল সরবরাহ করা হয়। বৃহত্তর বোমবাই শহরের কথা ধরলে বলতে হয়, এজন্য আরো বেশি জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাদরাজ

মাদরাজ শহরের আয়তন প্রায় ১২৮ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। প্রতিদিন প্রায় ৩০ কোটি লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে শহরে। মাদরাজ শহরে জল সরবরাহ করবার প্রধান উৎস কোরতালায়ার নদী। মাদরাজ শহরের ১৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নাগারি পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে কোরতালায়ার নদী এন্নোরের কাছে সমুদ্রে মিশেছে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বৃষ্টিপাত থেকে এই নদীটি জল পাচ্ছে। মাদরাজ থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তামারাপাক্কামের কাছে নদীর বুকে একটি ছোট বাঁধ (weir) নির্মিত হয়েছে। এই ছোট বাঁধের সাহায্যে বন্যার অতিরিক্ত জল শোলাভরম ও রেড হিলস জলাধারে পাঠানো হয়। এই দু'টি জলাধারের আয়তন যথাক্রমে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ঘন মিটার ও ৬ কোটি ২০ লক্ষ ঘন মিটার। এই ছোট বাঁধের ২০ কিলোমিটার উজানে আর একটি জলাধার তৈরি হয়েছে। এর আয়তন ৭ কোটি ৮ লক্ষ ঘন মিটার। এই জলাধারের জল বালির স্তরের ভেতর দিয়ে ফিলটার করে শহরে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় জলের পরিমণ

কম হওয়ায় আর একটি জল-সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হলে ২১০ কিলোমিটার দূরে থেকে কাবেরী নদীর জল ভীরানাম জলধারের মাধ্যমে মাদরাজে আনা হবে। এই জল সরবরাহের পরিমাণ হবে প্রতিদিন ১৮ কোটি ২০ লক্ষ লিটার জল। এছাড়া শহরের আশেপাশে বেশ কিছু বড় কুঁয়ো খোঁড়া হয়েছে। এসব কুঁয়ো থেকে দিনে প্রায় ৫ কোটি লিটার জল পাওয়া যাচ্ছে।

মাদরাজ শহরে যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে আশা করা যায়, ২০০০ সালে শহরের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জন্য জলের চাহিদা মেটাতে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণা ও পেন্নার নদী থেকে জল আনতে হবে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০০ সালে মাদরাজ শহরে জলের চাহিদা দাঁড়াবে প্রতিদিন প্রায় ১৩৫ কোটি লিটার।

কলকাতা

কলকাতার ২২ কিলোমিটার উত্তরে পলতা জলসরবরাহ কেন্দ্র থেকে কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ হয়। পলতার জল নেওয়া হয় হুগলী নদী থেকে। তারপর সেই জল বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিস্রুত করে চারটে বড় পাইপের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে উত্তর কলকাতার টালার ট্যাংকে। পলতা থেকে পাঠানো জলের পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় ১৬ কোটি গ্যালন। পৃথিবীর বৃহত্তম লোহার তৈরি টালার জলাধার থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এই জল মহানগরীর সব জায়গায় সরবরাহ করা হচ্ছে। কলকাতার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জল সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ১২০ টি বড় নলকূপ বসানো হচ্ছে। আরো বসানো হচ্ছে, এছাড়া সারা শহরে আরো প্রায় ৪,০০০ টি ছোট নলকূপ আছে। এই নলকূপগুলি থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই কোটি গ্যালন জল পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালে কলকাতায় প্রায় ৯ কোটি বীজাণুমুক্ত অপরিস্রুত জল সরবরাহ হতো। খিদিরপুরের কাছে ওয়াটগঞ্জ পামপিং স্টেশন ও হাওড়া পুলের দক্ষিণে অবস্থিত মল্লিকঘাট পামপিং স্টেশন থেকে হুগলি নদীর জল বীজাণুমুক্ত করে শহরের সব জায়গায় পাঠানো হয়।

সাম্প্রতিক কালে দু'টি জল পরিশোধন প্ল্যাণ্ট তৈরি হয়েছে। একটি টিটাগড়ে, আরেকটি পলতায়। অন্যদিকে পলতা জলকেন্দ্রের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। অকল্যাণ্ড স্কোয়ার ও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভূগর্ভস্থ জলাধার (৬০ লক্ষ গ্যালন) তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি গারডেনরিচ

(প্রতিদিন ৬ কোটি গ্যালন) ও হাওড়ায় নতুন জলপ্রকল্পের (প্রতিদিন ৪ কোটি গ্যালন) কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া বসানো হচ্ছে ৩০০টি গভীর নলকূপ। এসব কাজ ১৯৮৩-৮৪ সালে শেষ হবার কথা।

মাছ চাষ

আহার্য জিনিসের মধ্যে মাছ একটি অত্যন্ত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় পদ। তাই বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে নদী-নালা-হ্রদে মাছ-চাষ খুবই উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৭ কোটি টন মাছ উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মাছই ধরা হয় সমুদ্র থেকে। ভারতে মাছের মোট বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ২০ লক্ষ টন। এদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে ধরা পড়ে শতকরা ৩৫ ভাগ, বাদ বাকিটা পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে।

একটি দেশের লাগোয়া সমুদ্র, খাঁড়ি ও নদ-নদী তার মাছ পাওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মাধ্যম। কিছু কিছু মাছ, যেমন স্যালমন ও ইল, সমুদ্র থেকে নদীতে ঢোকে ডিম ছাড়বার প্রয়োজনে। ভারতেও ইলিশ মাছ মোহনা অঞ্চল ছেড়ে নদীর অনেকটা উজানে চলে আসে ডিম ছাড়বার সময়। এ ধরনের মাছের বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে নদীর জলকে এমন ক্লেদ-মুক্ত রাখতে হবে, যাতে মাছের চলাফেরায় কোন ধরনের বাধা না পড়ে। তা' না হলে নদীতে এ ধরনের মাছের সংখ্যা কমে আসবে।

ভারতে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রচুর মাছের ভোঁড় আছে। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির যতটা ভারতের মধ্যে পড়েছে, তার মধ্যে বাদামী রংয়ের ট্রাউট মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় নদীর মধ্যে গঙ্গা নদীতেই সবচেয়ে বেশি মাছ মেলে। গঙ্গা নদীতে মহাশোল, বাটা, পারসে, ইলিশ ইত্যাদি নানা ধরনের মাছ পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীতেও নানা ধরনের মাছ মেলে। হুগলির মোহনায় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর বাগদা গলদা চিংড়ি মেলে। এই মাছ আজকাল বিদেশে রপ্তানী করে বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে ভারত।

পৃথিবীর কয়েকটি বড় নদী

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে বয়ে চলেছে ছোটবড় অসংখ্য নদনদী। এদের মধ্যে যেগুলি দৈর্ঘ্য ও অববাহিকার আয়তনে উল্লেখযোগ্য, তাদের তালিকা দেওয়া হলো নিচে।

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য		অববাহিকার আয়তন	
	মাইল	কিলোমিটার	বর্গমাইল	বর্গকিলোমিটার
নীল নদ, আফরিকা	৪,১৫৭	৬,৬৫১	১৮,১২,৫০০	৪৬,৪০,০০০
আমাজন, দক্ষিণ আমেরিকা	৩,৯১৫	৬,২৬৪	২৭,২২,০০০	৬৯,৬৮,৩২০
মিসিসিপি-মিসৌরি, উত্তর আমেরিকা	৩,৮৬০	৬,১৭৬	১২,৪৩,৭০০	৩১,৮৩,৮৭২
ইয়াংসি, চীন	৩,৬০৪	৫,৭৬৬	৭,৫৬,৪৯৮	১৯,৩৬,৬৩৫
ওব, সোভিয়েট রাশিয়া	৩,৪৬১	৫,৫৩৮	১১,৩১,২৭৩	২৮,৯৬,০৫৯
পীত নদী, চীন	২,৯০২	৪,৬৪৩	৪,৮৬,৪৮৬	১২,৪৫,৪০৪
কঙ্গো, আফরিকা	২,৭১৬	৪,৩৪৬	১৪,২৫,০০০	৩৬,৪৮,০০০
লেনা, সোভিয়েট রাশিয়া	২,৬৫৩	৪,২৪৫	৯,৩৬,২৯৩	২৩,৯৬,৯১০
ম্যাকেনজি, ক্যানাডা	২,৬৩৫	৪,২১৬	৬,৮২,০০০	১৭,৪৫,৯২০
নাইজার, আফরিকা	২,৬০০	৪,১৬০	৫,৮০,০০০	১৪,৮৪,৮০০
আমুর-কেরুলেন, সোভিয়েট রাশিয়া	২,৫৫২	৪,০৮৩	৭,৫৮,০০০	১৯,৪০,৪৮০
ইনেসি, সোভিয়েট রাশিয়া	২,৪৮৫	৩,৯৭৬	১০,৪৫,১৭৩	২৬,৭৫,৬৪৩
রিও ডিলা প্লাটা দক্ষিণ আমেরিকা	২,৩৪৯	৩,৭৫৮	১৬,৭৯,৫৩৫	৪২,৯৯,৬১০
ভোলগা, সোভিয়েট রাশিয়া	২,২৯৩	৩,৬৬৯	৫,৩২,৮১৮	১৩,৬৪,০১৪

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য		অববাহিকার আয়তন	
	মাইল	কিলোমিটার	বর্গমাইল	বর্গকিলোমিটার
সেণ্ট লরেন্স উত্তর আমেরিকা	১,৯০০	৩,০৪০	২,৯১,০০০	৭,৪৪,৯৬০
ব্রহ্মপুত্র, এশিয়া	১,৮০০	২,৮৮০	৩,৬১,০০০	৯,২৪,১৬০
সিন্ধুনদ, ভারত/ পাকিস্তান	১,৮০০	২,৮৮০	৩,৭২,০০০	৯,৫২,৩২০
দানিয়ুব, ইউরোপ	১,৭৭৬	২,৮৪২	৩,১৫,৪৪৪	৮,০৭,৫৩৭
জামবেসি, আফরিকা	১,৭০০	২,৭২০	৫,১৩,৫০০	১৩,১৪,৫৬০
মারে, অস্ট্রেলিয়া	১,৬০৯	২,৫৭৪	৪,১৪,২৫৩	১০,৬০,৪৮৮
গঙ্গা, ভারত	১,৫৭৮	২,৫২৫	৩,৩৬,৪৮৬	৮,৬১,৪০৪
ওরিনোকো, ভেনেজুয়েলা	১,২৮১	২,০৫০	৩,৫০,০০০	৮,৯৬,০০০

রাইন

পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী রাইন। জন্ম সুইজারল্যাণ্ডের কনস্ট্যান্স হ্রদে। দৈর্ঘ্য ১,৩১৫ কিলোমিটার, অববাহিকার আয়তন ১৮,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বেসল শহর পর্যন্ত পেঁছতে নদীটি পাহাড় থেকে প্রায় ১২২ মিটার নিচে নেমে এসেছে। মোহনা থেকে বেসল শহর পর্যন্ত এই ৮৮০ কিলোমিটার দূরত্ব রাইন নদী নাব্য। ফলে শিল্পনগরী বেসলে গড়ে উঠেছে এক বড় নদীবন্দর। এই অঞ্চলে তাই তৈরি হয়েছে কয়েকটি ব্যারেজ ও বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র।

বেসল শহরে পেঁছে রাইন নদী হঠাৎ বাঁক নিয়েছে উত্তরদিকে। তারপর ফ্রান্স ও জারমানির সীমানা ধরে ল্যাকসেমবার্গ পর্যন্ত বয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে হল্যাণ্ডে। এই জায়গাটি উৎস-মুখ থেকে প্রায় ১,০৪০ কিলোমিটার দূরে। আরো খানিকটা পথ পেরিয়ে রাইন নদী দু'টি শাখা নদীতে বিভক্ত হয়েছে। একটি ওয়াল, অন্যটি ইজসেল (জুইডার জী)। এদের মধ্যে প্রথম শাখা নদীটি মোট জলপ্রবাহের তিনভাগের দু'ভাগ নিয়ে উত্তর সাগরে (North sea) মেশে।

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এই দীর্ঘপথে অনেক উপনদীই মিশেছে রাইনের সঙ্গে। তবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইল (জন্ম বেসল শহরের কাছে, সঙ্গম স্টার্টসবুর্গে), নেকার (ডানতীরে), নাহে (বাম তীরে), লাহ্ন (ডান তীরে) ও মেকসেলি (বামতীরে)। এই সব উপনদীর জলবহনের ক্ষমতা নেহাৎ কম নয়। কোন নদীরই ক্ষমতা ২৮০ কিউসেকের কম নয়। নদীতে জোয়ার-ভাঁটার জন্য বছরে প্রায় মাস খানেক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

নৌ-চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রাইন নদী পৃথিবীর অন্যান্য নদী থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে, একথা সহজেই বলা যায়। কারণ বহুকাল ধরেই রাইন নদী বয়ে চলেছে এক জনবহুল সমৃদ্ধ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। তাছাড়া রাইন নদীর মোহনার বিপরীতেই গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ থাকায় এই সমুদ্রপথও সদাব্যস্ত কর্মচঞ্চল। অন্যান্য কয়েকটি নদী রোন, মার্ভে দানিয়ুব—ইত্যাদির সঙ্গে রাইনের যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া অ্যাণ্টওয়ার্প ও আমস্টারডামের মতো শহরের সঙ্গে খালের (canal) মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে। এই নদীপথে যে সব জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানী হয় তার মধ্যে রয়েছে দানাশস্য, আকরিক, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্য। এসব দ্রব্যের ওজন প্রায় ২,৫০০ কোটি মেটরিক টন। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বেড়েছে আনুষঙ্গিক রেলপথ ও রাস্তাঘাটের ভালো যোগাযোগের জন্য।

নৌ-চলাচলের উন্নতির জন্য কেম্ব (বেসল শহরের ৬ কিলোমিটার নিচে) ও স্ট্রাসবুর্গ শহরের মধ্যে একটি সমান্তরাল খাল (Grand Canal) কাটা হয়েছে। এই অংশের মধ্যে আটটি লকগেট তৈরি করা হয়েছে এবং নদীটি প্রায় ১০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে রাইন নদীতে একটি ১,০০০ মেটরিক টন জাহাজ চালাতে ৮৫০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন ইনজিন প্রয়োজন, কিন্তু গ্র্যাণ্ড ক্যানালে একই জাহাজ চালাতে প্রয়োজন ২২০-অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইনজিন। ফলে বিগত কয়েক বছরে এই গ্র্যাণ্ড ক্যানালে নৌ-যানের সংখ্যা পাঁচ লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ লাখ। এই নদী ও খালের ধারে ধারে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রও নির্মিত হয়েছে। ফরাসী অঞ্চলে আট-ন'টি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র বসানো হয়েছে। আর সুইজারল্যাণ্ডে ১৩-১৪টি।

অতীতকাল থেকেই রাইন নদী ধরে ব্যাণিজ্য চলে আসছে। এই বিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও রাইন

নদীর অববাহিকায় অবস্থিত পশ্চিম জারমানি, পূর্ব ফ্রান্স, হল্যান্ড ইত্যাদি দেশে প্রায় একই ধরনের অর্থনীতি বিরাজ করছে। এই অর্থনীতির মূল বনিয়াদ নদী-বাহিত ব্যবসা-বাণিজ্য।

রোন

এই নদীটির জন্ম সুইজারল্যাণ্ডের গ্রিমসেল হ্রদে ১৮০০ মিটার উচ্চতায়। তারপর ১৬৮ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে মিশেছে জেনিভা হ্রদে। হ্রদ থেকে আবার বেরিয়ে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার দূরে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে মিলন ঘটে রোন নদীর। নিচের দিকে নদীটি প্রায় ৩৭০ কিলো-মিটার নাব্য। এই অংশে নদীটির উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪০ মিটার। এই অংশে নদী-বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেটরিক টন। রোন নদীতে জলপ্রবাহের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১১৩ কিউমেক (Cumec)। ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড—উভয় অংশেই এই নদীর বুকে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি বাঁধ ও বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র। কেবল ফ্রান্সে প্রায় ২০টি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ প্রায় ৫ মেগাওয়াট। সুইজারল্যাণ্ডে যে আটটি বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র রয়েছে, তার বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট।

দানিয়ুব

'দানিয়ুব' শব্দের অর্থ নদীর রাজা। এই নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ন। মধ্য ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সীমারেখা রচনা করেছে দানিয়ুব। অতীতে এই নদীর তীরে যুদ্ধ হয়েছে বহুবার।

দানিয়ুব নদীর জন্ম পশ্চিম জারমানির ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলে, ১,০০০ মিটার উচ্চতায়। প্রায় ১,৮৮৮ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে মিশেছে তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে। উৎস অঞ্চলে বছরে প্রায় ৩০-৪০ দিন বরফে ঢাকা থাকে এই নদী। অববাহিকার আয়তন প্রায় ৮,০৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বছর দানিয়ুবের নদীখাতে প্রায় ২০,০০,০০০ ঘন মিটার জল প্রবাহিত হয়। অববাহিকা বারোটি দেশ জুড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে দানিয়ুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। এই নদীপথে বছরে প্রায় ৮৫০ লক্ষ মেটরিক টন মালপত্র বাহিত হয়। মাঝে মাঝে নদীটির নিচের দিকে বন্যা হয়। নদীর দু'পারে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ-শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। নদীটির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ৪১

মেগাওয়াট। নদীর জলে প্রায় ১৩ লক্ষ হেকটর জমিতে সেচের কাজ হচ্ছে। আশা করা যায়, আরো প্রায় একই পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা চলবে। তবে জলসেচের পরিমাণ যদি বাড়ানো হয়, তবে নৌ-চলাচলের কাজ ব্যাহত হবে। কারণ চলাচলকারী বজরা বা স্টিমারের জন্য জলের অন্তত পক্ষে ২ মিটার গভীরতা প্রয়োজন। দাঁড়-টানা নৌকোর গতিবেগ এই নদীতে উজানের দিকে প্রতি ঘণ্টায় ৪ থেকে ৬ কিলোমিটার ও নিচের দিকে ১৬ কিলোমিটার।

হাঙ্গেরিতে দানিয়ুব নদীর যে অংশ পড়েছে, তাতে নদীর বুকে অনেকটাই চড়া পড়েছে। তাই নাব্যতা বজায় রাখতে সবসময় ড্রেজিং করে নদীকে চড়ামুক্ত রাখতে হয়। এসব ড্রেজারের সাহায্যে ঘণ্টায় ২০০ থেকে ২৫০ ঘন মিটার চড়া পরিষ্কার করা সম্ভব। প্রতি বছর দানিয়ুব নদীর এ অঞ্চলে যতটা চড়া কাটা হয়, তার পরিমাণ প্রায় ৫,০০,০০০ ঘন মিটার। জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখবার জন্য নদীর পাড় ভালো করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নীল নদ

নীল নদ কথাটি এসেছে ল্যাটিন নীলুস (Nilus) ও গ্রীক নীলোস (Nilos) শব্দ থেকে। এর অর্থ 'যার উৎস অজানা'। নীল নদের জন্ম আফরিকার ভিকটোরিয়া হ্রদের ৬৫ কিলোমিটার পূর্বে, ২,৫০০ মিটার উচ্চতায়। ৬,৬৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ নীল নদই সম্ভবত পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। দীর্ঘতায় এর প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরি ও দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন। নীল নদের অববাহিকার আয়তন ৪৬,৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৮,১২,৫০০ বর্গ মাইল), যা আফরি-কার মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ।

উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে নীল নদ উগান্ডা, কেনিয়া, টানজানিয়া, জাইরে, সুদান, ইথিয়োপিয়া ও ইজিপ্ট (মিশর) পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে।

তিনটি মূল জলধারা মিশে নীলনদের জন্ম। এদের মধ্যে প্রধানতম ব্লু নীল (Blue Nile) যার ভেতর দিয়ে নীলনদের মোট জলপ্রবাহের সাত ভাগের প্রায় চার ভাগ প্রবাহিত। ব্লু নীল নদের জন্ম ইথিয়োপিয়ায়। গুরুত্বের দিক থেকে হোয়াইট নীলের (White Nile) স্থান এর পরেই। এর মাধ্যমে সাত ভাগের দুভাগ জল প্রবাহিত হয়। দৈর্ঘ্যে এই জলধারাটি

সবচেয়ে বড়। হোয়াইট নীলের উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাহ্‌র এল আরব, লোল, জুর, আসোয়া ও সেলমিকি। ব্লু নীলের উপনদীর মধ্যে রয়েছে দিনদার ও রাহাদ। ব্লু নীল ও হোয়াইট নীলের মিলন ঘটেছে সুদানের রাজধানী খার্তুমে।

তৃতীয় জলধারা আটবারা মূল নদীর ধারার সঙ্গে মিশেছে আরো ২০০ কিলোমিটার উত্তরে। আটবারা নদীর অববাহিকার মধ্যে রয়েছে ইথিয়োপিয়ার উত্তর পশ্চিম অংশ। বর্ষার সময় ব্লু নীল ও আটবারা নদী নিয়ে আসে প্রচুর পলি, যাতে গঠিত হয়েছে মিশর ও সুদানের শস্য শ্যামল ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না। কেবলমাত্র নীল নদের জলের ওপরই সমস্ত অঞ্চলের সেচের কাজ নির্ভরশীল। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে নীল নদের অনেকটাই নাব্য, বিশেষত ১,৫০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ওয়াদি হালফা পর্যন্ত। আসওয়ান বাঁধ ও অন্যান্য ব্যারেজ পেরোতে লক-গেট ব্যবহার করতে হয়। ওয়াদি হালফা ও খার্তুমের মধ্যে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাতও রয়েছে। আসোয়ান বাঁধের উচ্চতা প্রায় ৫৩ মিটার (১৭৪ ফিট) দৈর্ঘ্য ২ কিলোমিটার এবং জলাধারের ক্ষমতা প্রায় ৫৩০,০০,০০,০০০ টন।

সেচকাজের সুবিধের জন্য নীল নদ থেকে বহু খাল কাটা হয়েছে। নীল নদের জলে যা চাষ হয়, তার মধ্যে রয়েছে কার্পাস, গম, বার্লি, আখ, বাদাম, যব, তিল (Sesame), ভুট্টা ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ ফসল কার্পাস, যা মোট কৃষিক্ষেত্রের চার ভাগের এক ভাগ অংশে চাষ হয়। তুলো-জাত জিনিস মিশরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

আসোয়ান বাঁধ থেকে শুরু করে কায়রো পর্যন্ত নীল নদের দুপাশে বিস্তৃত পলিভূমি। এই পলিভূমি কোথাও কোথাও ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। নীলনদ থেকে খাল কেটে এই পলিভূমিতে কৃষিকাজ করা হচ্ছে। এই পলিভূমির সীমানার বাইরেই মরুভূমি। এই মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টি-পাত একেবারে হয় না বললেই চলে। তবে যেখানে অল্প স্বল্প বৃষ্টি হয় সেখানে কাঁটা ঝোপ বা অ্যাকাশিয়া জাতীয় গাছপালা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। আটবারা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে গেলে চোখে পড়বে সাভানা তৃণভূমি। এই অঞ্চলে ঘাসের দৈর্ঘ্য ২ থেকে ৩ মিটার। বৃষ্টির জলে ঘাস বড় হয়ে ওঠে আর শুখনোর সময় সব ঘাস মরে যায়। এই অঞ্চলে নদীর বুকে গজায় নলখাগড়ার জঙ্গল, প্যাপিরাস, জল লেটুস ইত্যাদি।

আমাজন

দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী আমাজন। জলের আয়তন ও অববাহিকার আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। আমাজন নদীর জন্ম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে মধ্য পেরুর আনদিজ পর্বতে। পেরু ও ব্রাজিলের ভেতর দিয়ে ৩,৯১৫ মাইল (৬,২৬৪ কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে বিষুব রেখার কাছে আটলানটিকে পড়েছে আমাজন। এক সময় মনে করা হতো আমাজন বোধহয় পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী, কিন্তু পরবর্তী সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ৪,১৫৭ মাইল দীর্ঘ নীল নদই পৃথিবীর দীর্ঘতম, অববাহিকার আয়তন ২৭,২২.০০০ বর্গ মাইল (৬৯,৬৮,৩২০ বর্গ কিলোমিটার)। তবে এর মধ্যে টোকানটিনস নদীর হিসেবও ধরা হয়েছে। বলতে গেলে দক্ষিণ আমেরিকার মোট আয়তনের দশ ভাগের চার ভাগ অংশই আমাজনের অববববাহিকার মধ্যে পড়ে।

উৎস থেকে শুরু করে ইকুইটস পর্যন্ত আমাজনের নাম মারানন (পর্তুগিজ শব্দ)ও সেখান থেকে সাগর পর্যন্ত নাম আমাজোনাস বা আমাজন! এই নামকরণ করেছেন পর্যটক ওরেল্লানা ১৫৪১ সালে।

আমাজন নদীর জলপ্রবাহের আয়তন কখনোই নির্ভুলভাবে মাপজোক করা হয়নি। তবে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে অনুমান করা হয়েছে, এর জলপ্রবাহের গড় পরিমাণ ৪২,০০,০০০ কিউসেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন ফিট), যা মিসিসিপি নদীর জলপ্রবাহের প্রায় সাত গুণ। বর্ষাকালে জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে গিয়ে হয় ৭০,০০,০০০ কিউসেক। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠে যত জল প্রবাহিত হয়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই প্রবাহিত হয় আমাজন নদীখাত ধরে। আমাজন নদীতে এত জলপ্রবাহের কারণ এই, যে আমাজন নদীর অববাহিকার অবস্থান বৃষ্টি প্রধান নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে। আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চল মূলত ব্রাজিলের মধ্যে পড়লেও এর কিছু কিছু অংশ পড়েছে পেরু, বলিভিয়া, ইকোয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলাতে।

মোহনা থেকে সুরু করে ২,৩০০ মাইল নদীর ভেতরে ইকুইটস পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করে। আর ছোট জাহাজ যেতে পারে আরো ৪৮৬ মাইল (৭৭৮ কিমি) ভেতরে পঙ্গো দ্য মানকোরিকে পর্যন্ত।

প্রকৃতপক্ষে আমাজন একটি নদী নয়, অসংখ্য উপনদী মিলিয়ে বহমান এক বিশাল জলধারা।

টোকানটিনস প্রকৃত অর্থে আমাজনের উপনদী নয়, আলাদা একটি নদী। মোহনার কাছে আমাজনের সঙ্গে মিশেছে। গোইয়াস শহরের কাছে প্ল্যানালটো সেনট্রালের কাছে এর জন্ম। দৈর্ঘ্য ১,৬৭৭ মাইল (২,৬৮৩ কিলোমিটার)। মোহনার কাছে টোকানটিনস নদী যে খাঁড়ি সৃষ্টি করেছে, তার নাম পারা নদী।

টোকানটিস নদীর পশ্চিমে জিংগু নদী। জন্ম কুইয়াবার ১৫০ মাইল (২৪০ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে ব্রাজিলের প্লানালটো সেন্ট্রাল মালভূমিতে। নদীটি খুবই খরস্রোতা। নদীতে অনেক জলপ্রপাত থাকায় নৌচলাচল খুবই অসুবিধেজনক। নদীটির দৈর্ঘ্য ১,৩০৪ মাইল (২,০৮৬ কিলোমিটার)।

টাপাজোঁ নদী আমাজনের সঙ্গে মিশেছে বেলেম শহরের ৫০০ মাইল (৮০০ কিলোমিটার) উজানে। দৈর্ঘ্য ৮০৭ মাইল (১,২৯১ কিলোমিটার)। আমাজন নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে টাপাজোঁ ইত্যাদি কয়েকটি নদীর মিলনে তৈরি হয়েছে অ্যারিনো নদী।

মাদিরা নদী আমাজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বেলেম শহরের ৮৭০ মাইল (১,৩৯২ কিলোমিটার) উজানে। এর জলবহনের ক্ষমতা প্রচুর, প্রায় আমাজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। দৈর্ঘ্য ২,০১৩ মাইল (৩,২২১ কিলোমিটার)। এর মধ্যে ৮০৭ মাইল নাব্য।

পুরু নদী আমাজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মাদিরা নদীর চেয়েও ২৩০ মাইল পশ্চিমে। দৈর্ঘ্য ১,৯৯৫ মাইল (৩,১৯২ কিলোমিটার)। নদীটির গতিপথ ঋজু নয়, খুবই আঁকাবাঁকা।

আমাজনের অন্যান্য উপনদীর মধ্যে রয়েছে জুরুয়া, জাভারি (১,০৫০ কিলোমিটার), উকায়ালি, হুয়াল্লাগা, মারানন, ট্রমবিটাস, নেগরো, জাপুরা বা ককেটা, ইকা বা পুটুমায়ো, নাপো, নানায়, টিগরে, পাসটাজা, মোরোনা ইত্যাদি।

আমাজন নদী উপত্যকার জন্ম শিলাচ্যুতির ফলে। টারশিয়ারি যুগে নদী বাহিত পলিতে ভরাট হয়ে আজকের উপত্যকা তৈরি হয়েছে। আমাজন নদীর মতো এত বড় মোহনা পৃথিবীতে বিরল। কাবো নরটে থেকে পনটা টিজোকা পর্যন্ত দূরত্ব ২০৭ মাইল (৩৩১ কিলোমিটার)।

আমাজন নদী উপত্যকায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জন্য জন্ম নিয়েছে এক সমৃদ্ধ চিরহরিৎ অরণ্য। এই অরণ্যে রয়েছে অসংখ্য রকমারি বৃক্ষ। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ ½ মাইল স্কোয়ার এলাকায়

পেয়েছেন ১১৭ রকমের গাছপালা। আকাশ থেকে এই অঞ্চলের বিচিত্র অরণ্য দেখলে মনে হয় কে যেন বিছিয়ে রেখেছে এক অন্তহীন সবুজ কারপেট। এই অরণ্যে রয়েছে পাম, অ্যাকাসিয়া, শিরীষ, রাবার, ডুমুর, কুইনিন, কাকাও, কাসাভা ইত্যাদি নানা রকমের গাছ। এই অঞ্চলে প্রচুর জন্তু জানোয়ার থাকলেও বড় আকারের স্তন্যপায়ী জানোয়ার প্রায় নেই বললেই চলে। নদীর জলে যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, তাদের সংখ্যা ৫০০ থেকে ২,০০০ এর মধ্যেই হবে।

আমাজন নদী অঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, সমৃদ্ধ অরণ্য ও বিচিত্র প্রাণী থাকলেও জনসংখ্যা খুবই কম। ফলে বিভিন্ন যুগে এই অঞ্চলে আগমন ঘটেছে অসংখ্য পর্যটকের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লা কনডামাইন, আলেকজানডার হামবোল্ট, কার্ল ফন মারটিয়াস, রবার্ট স্কমবার্গ হার্নম, হের্নার লিসটার, উইলিয়াম স্মিথ ইত্যাদি নাম।

ভোলগা

ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভোলগা। দৈর্ঘ্য ২,৩২৫ মাইল (৩,৭২০ কিলোমিটার)। জন্ম পশ্চিম রাশিয়ার ভালদাই পাহাড়ে। উৎস থেকে আঁকাবাঁকা দীর্ঘপথ পেরিয়ে আসট্রাখানের কাছে কাসপিয়ান সাগরে মিশেছে। আর কাসপিয়ানের মুখে তৈরি হয়েছে একটি প্রশস্ত বদ্বীপ। ভোলগা নদীর উপনদগুলির ভেতরে উল্লেখযোগ্য ওকা, সুরা, ভেটলুগা, কামা, সামারা ইত্যাদি।

ভ্যানকোভা থেকে ভোলগাগ্রাদ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ২,৫০০ কিলোমিটার। এই দূরত্বের মধ্যে নদীটির উচ্চতা কমেছে ১২০ মিটার। নানা ধরনের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনে ভোলগা নদীর জল ব্যবহৃত হয়েছে। বলতে গেলে নদীটির প্রায় অর্ধেক দৈর্ঘ্য জুড়েই নানা ধরনের খাল (canal)।

ভোলগা নদীর জলধারা নৌ-চলাচলের কাজেও লাগছে। প্রচণ্ড শীতের জন্য বছরে প্রায় ২০০ দিন ভোলগা নদী নৌ-চলাচলের যোগ্য থাকে। নদীপথে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ বাহিত হয়। নদীখাতের ঢাল খুবই কম। ১ : ১০,০০০। ভোলগা নদীকে নাব্য রাখবার জন্য বছরের বেশির ভাগ সময়েই প্রায় কুড়িটি ড্রেজার কাজ করে বিভিন্ন নদী-বন্দরে ও নদীখাতে। ভোলগা নদীর নিচের দিকে নদীখাতের ঢাল আরো কম (১ : ২০,০০০)। এখানে ১০০ মিটার প্রশস্ত নদীর বুকে

গভীরতা অন্ততপক্ষে ৩'৫ মিটার।

ভোলগার সঙ্গে ডনের সংযোগ সাধনের জন্য ১৯৫২ সালে তৈরি হয়েছে ভি, আই, লেনিন ভোলগা-ডন ক্যানাল। ক্যানালটি চওড়ায় প্রায় ৬০ মিটার। ক্যানালের প্রান্তভাগ পাথর দিয়ে বাঁধানো। খালপথে জলযানের সর্বোচ্চ গতিবেগ বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার, যাতে চলমান জলযানের ঢেউয়ে ক্যানালের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ৩'২-গভীরতা যুক্ত যে কোন জলযান স্বচ্ছন্দে এই খালপথে চলাচল করতে পারে। খালপথে পশ্চিম রাশিয়ার এই জলপথ পাঁচটি সাগরের সঙ্গে যুক্ত। শ্বেত সাগর, বালটিক সাগর, কাসপিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও অ্যাজভ সাগর। ভোলগা নদীপথ, তার খাল ও বিভিন্ন হ্রদের মারফৎ ভোলগা উপত্যকার সঙ্গে বালটিক ও শ্বেত সাগরের যোগসূত্র রচিত হয়েছে। মসকো ক্যানালের মারফৎ ভোলগা নদীর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে মসকো শহরের। এভাবেই জলপথে মসকোর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকাংশ-বন্দরের যোগ রয়েছে। উত্তরে লেনিনগ্রাদ, দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও কাসপিয়ান বন্দর মসকোর সঙ্গে জলপথে যুক্ত।

মিসিসিপি-মিসৌরি

দৈর্ঘ্যের দিক থেকে মিসিসিপি-মিসৌরি নদী পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। বাহিত জলের পরিমাণের হিসেবে পঞ্চম। নদী-অববাহিকার আয়তনের হিসেবে পঞ্চম। মিসিসিপি-মিসৌরির যৌথ দৈর্ঘ্য ৬,১৭৬ কিলোমিটার। মিসিসিপির জন্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা প্রদেশের ইটাসকা হ্রদের কাছে। অববাহিকার আয়তন প্রায় ৩২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কেবলমাত্র মিসিসিপির দৈর্ঘ্য ২,৩৫০ মাইল (৩,৭৬০ কিলোমিটার)। মিসিসিপির প্রধান উপনদী মিসৌরি। এর জন্ম রকি পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন ১৩'৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। মিসৌরির উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়োলোস্টোন, প্লাট নদী। প্লাট নদীর জন্ম উয়োপ্রদেশে হলেও মূলত নেবরাসকা প্রদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। দৈর্ঘ্য ১,৪০০ মাইল (৩,৫৮৪ কিলোমিটার)। ওমাহা শহরের কাছে মিসৌরি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মিসিসিপির অন্যান্য উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্বদিক থেকে আগত ওহিও নদী। ওহিও নদীর জন্ম পেনসিলভ্যানিয়া প্রদেশে মনঙ্গাহেলা ও অ্যালিঘেনি নদীর মিলনে। এর দৈর্ঘ্য ৯৮০ মাইল (১,৫৬৮ কিলোমিটার)। ওহিও নদীর প্রধানতম উপনদী

৭৮২ মাইল (১,২৫১ কিলোমিটার)-দীর্ঘ টেনিসি। টেনিসি নদীতে আগে প্রায়ই বন্যা হতো। পরে টেনিসি ভ্যালি অথরিটি গঠন করে বহু বাঁধ দেওয়া হয়েছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, টেনিসি ভ্যালি অথরিটির আদলেই ভারতে গঠিত হয়েছে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন। পশ্চিমদিক থেকে আর যে দু'টি বড় উপনদী মিশেছে মিসিসিপির সঙ্গে, তারা হলো আরকানসাস ও রেড নদী। আরকানসাসের জন্ম রকি পাহাড়ে। দৈর্ঘ্য ১,৪৫৯ মাইল (২,৩৩৪ কিলোমিটার)। আরকানসাস নদীর বুকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ১৭টি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। রেড নদীর দৈর্ঘ্য ১,৬০০ মাইল (২,৫৬০ কিলোমিটার)। নদীর নাম 'রেড', কারণ নদীর-উজানে রয়েছে প্রচুর লাল মাটি।

মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর পারে যেসব শহর গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিউ অরলিয়েন্স বন্দর, ব্যাটন রুজ, মিনিপোলিস, মেমফিস, সেণ্ট লুই, কানসাস সিটি ইত্যাদি।

মিসিসিপি-মিসৌরির সব উপনদী মিলিয়ে বেশ বড়সড় একটি নদীপথ গড়ে উঠেছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯,৮৮৫ কিলোমিটার। এই নদীপথে বছরে প্রায় ২,৫০০ লক্ষ মেট্রিক টন মাল পরিবাহিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে ক্রমেই এই নদীপথ খুবই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ফলে এই নদীর পাড়ে বহু বড় বড় শহর ও বন্দর গড়ে উঠছে। মোহনা থেকে শুরু করে মিনিপোলিস পর্যন্ত নৌ-চলাচলযোগ্য। এর পর আরো প্রায় ৮০ কিলোমিটার ইটাসকা হ্রদ পর্যন্ত ছোট ছোট নৌকো চলাচল করতে পারে। এই অংশে মিসিসিপি নদীতে ১৪টি লকহীন (without locks) বাঁধ রয়েছে। মিনিপোলিস থেকে সেণ্ট লুইয়ের মধ্যে ২৭টি লক-যুক্ত বাঁধ রয়েছে। সেণ্ট লুইয়ের নিচে আর কোন বাঁধ বা লক নেই। মিসিসিপির উজানের দিকে নৌ-চলাচলের গভীরতা ১·৫৮ মিটার। কিন্তু নৌ-বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে এই গভীরতা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২·৭ মিটার।

কঙ্গো নদী

কঙ্গো নদীর সাম্প্রতিক নাম জাইরে নদী। ৪,৭৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ অববাহিকার আয়তন প্রায় ১৫,০০,০০০ বর্গ মাইল (৩৮,৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। নদীটির অবস্থান নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর হওয়ায় সব ক'টি নদীতেই সারা বছর জল থাকে। ফলে

অধিকাংশ নদীই বছরের বেশির ভাগ সময় নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে। কঙ্গো নদীর অববাহিকার উচ্চতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১,০০০ ফিটের (৩০০ মিটার) বেশি। উপত্যকার ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বের দিকে। এর চারিদিকে উচুঁ মালভূমি। যেমন দক্ষিণে কাতাংগা-উত্তর অ্যাংগোলার মালভূলি, পূর্বে পূর্ব-আফরিকার রিফ্‌ট মালভূমি এবং উত্তরে উঁচু জলবিভাজিকা (কঙ্গোর সঙ্গে নাইজারচারি নদীর)। পলি-বিধৌত উপত্যকার ভেতরে রয়েছে বহু হ্রদ, জলা-জায়গা। কঙ্গো নদী স্ফটিক পাহাড় পেরোবার আগেই অধিকাংশ উপনদী মিলিত হয়েছে এর সঙ্গে। এই পাহাড়টি পেরোতে ২২০ মাইল পথে তৈরি হয়েছে ৩২টি ছোট মাঝারি ও বড় আকারের জলপ্রপাত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হলো লিভিংস্টোন জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতগুলির মোট উচ্চতা ৭০০ ফিট (৪৩৭ মিটার)। এর আগের ১,০০০ মাইলের ভেতর স্টানলি জলপ্রপাতের উচ্চতা ছিল ৮০০ ফিট। কঙ্গো নদী আটলানটিক মহাসাগরের মুখে খাঁড়ি তৈরি করেছে। বিস্তার প্রায় ১৩-১৬ কিলোমিটার।

কঙ্গো নদীর উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুয়ালাবা, বুসিরা কাসাই, কিইউ, কোয়ানগো ইত্যাদি। যে সব শহর ও নদীবন্দর এর দু'পাড়ে গড়ে উঠেছে, তারা হলো বাসোকা, কিসানগানি, বানডাকা, ইরেবু কিনসাসা, মাটাদি, বোমা, বানানা ইত্যাদি। বড় স্টিমার চলতে পারে সমুদ্র থেকে মাটাদি শহর পর্যন্ত। মাটাদি থেকে মালেবো পর্যন্ত বেশ কিছু জলপ্রপাত থাকায় এই অংশ নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়। তবে এর পর থেকে বোয়োমা জলপ্রপাত পর্যন্ত কঙ্গো নদী নাব্য।

হোয়াং হো

৪,৬৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ হোয়াং নদীর জন্ম উত্তর চীনের কুনলুন পাহাড়ে। নদীর জলে প্রচুর হলুদ মৃত্তিকা মিশে থাকে। তাই আরেক নাম পীত নদী (yellow river)। অনেকটা পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হবার পর হোয়াং হো প্রবেশ করে ওরডোস মালভূমি অঞ্চলে, যা আসলে গোবি মরুভূমিরই বিস্তার। এই উপত্যকা বেয়ে পূবদিকে চলতে চলতে আচমকা দক্ষিণদিকে বাঁক নেয় নদীটি। শেনসি প্রদেশের প্রান্তে দু'টি উপনদী মিলিত হয় এর সঙ্গে। বাঁ দিকে ফেন হো ও ডানদিকে ওয়েই হো। তারপর মিলিত জলপ্রবাহ পূর্ব দিকে ঘুরে গিয়ে টুঙ্গ কুয়ান গিরিখাতের ভেতর দিয়ে পৌঁছয় হোনানের উপত্যকায়। তারপর

উত্তর চীনের সমভূমি পেরিয়ে সমুদ্রে। ১৮৫২ সালের আগে বিগত পাঁচশো বছর ধরে হোয়াং হো মিশেছে পীত সাগরে। কিন্তু ১৮৫২ সাল থেকে এর সঙ্গমস্থল সরে গেছে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে।

পাহাড়ী অঞ্চলে হোয়াং নদী খুবই খরস্রোতা। আবার সমভূমির ওপর নদী প্রশস্ত হলেও অগভীর। ফলে নৌ-চলাচলের পক্ষে হোয়াং হো নদী খুব উপযুক্ত নয়। ওরডোস মালভূমিকে ঘিরে যে নদীপথ, তার মধ্যে চুঙ্গ-ওয়েই থেকে হোকৌ পর্যন্ত নদীপথ নাব্য। কেবল শীতকাল ও বন্যার সময় ছাড়া। হোকৌ থেকে টুঙ্গ-কুয়ান পর্যন্ত নদীপথও নাব্য। কিন্তু স্রোত খুব বেশি হওয়ার ফলে কেবল উজান থেকে নিচের দিকে নৌ চলাচল সম্ভব। এছাড়া মোহনা থেকে ৪০ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত নদীপথ নৌ-চলাচলের পক্ষে প্রায় আদর্শস্থানীয়।

হোয়াংহো নদী ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে চীনের জীবনযাত্রায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ একসময় হোয়াং হো নদীর বন্যা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করে দিত। তাই হোয়াং হো নদীর অন্য নাম 'চীনের দুঃখ'। উত্তর চীনের সমভূমি মূলত গঠিত হয়েছে হোয়াং হো (পীত নদী), হুয়াই হো ও হোপে— এই তিনটি নদীর পলির সাহায্যে। স্ব-বাহিত পলির পরিমাণ এতই বেশি যে হোয়াং হো নদী খুবই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পলি গঠিত সমভূমিকে চাষের কাজে লাগানোর প্রয়োজনে হোয়াং হো নদীকে একটি খাতে বহানোর জন্য দু'পাশে তৈরি হয়েছে দেয়াল বা ডাইক (dyke)। কিন্তু ডাইকের মাঝখানে নদীখাতে এত পলি জমেছে যে নদীর জলের উচ্চতা এখন চারপাশের সমভূমিকে ছাড়িয়েছে। জোয়ার ও ভাঁটার সময় আশেপাশের সমভূমি থেকে জলের উচ্চতা যথাক্রমে ১০ মিটার এবং ৫ মিটার। চেনচৌয়ের উত্তর দিয়ে প্রবাহিত পীত নদীর সঙ্গে সিন-চিয়াংয়ের কাছে ওয়েই হো নদীর সংযোগ সাধন করতে ১৯৫৩ সালে তৈরি হয়েছে পিপলস ভিকটরি ক্যানাল। এটি পিকিং-হ্যানকাউ রেলপথের সমান্তরালে প্রবাহিত।

১৯৫৫ সালে হোয়াং হো নদীকে 'চীনের দুঃখ' এর বদলে 'চীনের সুখ' নদীতে পরিবর্তন করার একটি পরিকল্পনা করেছেন চীন দেশের কম্যুনিস্ট সরকার। সেই পরিকলপনা অনুযায়ী ১৯৫৮-৬২ সালে সান-মেন-সিয়াতে পীত নদীর ওপর তৈরি হয়েছে একটি বাঁধ ও এক মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। দ্বিতীয় বাঁধটি তৈরি হয়েছে ১৯৬৩-৬৭ সালে ল্যানচাউয়ের ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। এবং সঙ্গে এক মেগাওয়াট

শক্তিসম্পন্ন আর একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

ইয়াংসি নদী

চীনের দীর্ঘতম নদী ইয়াংসি। চীনা ভাষায় এর অর্থ ইয়াং গ্রামের নদী। ইয়াংসি নদীর দৈর্ঘ্য ৩,৬০২ মাইল (অর্থাৎ ৫,৭৬৩ কিলোমিটার) ও অববাহিকার আয়তন ৭,৫৬,৪৯৮ বর্গমাইল (১৯,৩৬,৬৩৫ বর্গকিলোমিটার)। তিব্বতীয় মালভূমিতে কুনলুন পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ১৭,০০০ ফিট (৫,১৮৫ মি) উচ্চতায় ইয়াংসি নদীর জন্ম। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ১,২০০ মাইল (১,৯২০ কিমি) চলতে নদীটি প্রায় ২,০০০ ফিট (৬১০ মি) উচ্চতায় নেমে আসে। এই অঞ্চলে উত্তরদিক থেকে আগত ইয়া-লুং উপনদীটি মিলিত হয় ইয়াংসির সঙ্গে। পিংশানের কাছে ইয়াংসি পড়ে সেচওয়ান উপত্যকায়। এখানে তিনটি উপনদী মিলিত হয়। মিন চিয়াং, টো চিয়াং এবং উ চিয়াং। সেচওয়ান উপত্যকা পেরিয়ে ইয়াংসি গিরিখাতে এক সময় প্রবেশ করে ইয়াংসি। স্বাভাবিক কারণেই নদী এখানে খুব খরস্রোতা। গিরিখাত পেরোবার পর ইয়াংসির সঙ্গে হ্যাংকৌর কাছে মিলিত হয় হান সুই নদী। এখানে ইয়াংসি নদীর ওপর ৩,৭৬২ ফিট দীর্ঘ সড়ক ও রেলব্রিজ তৈরি হয়েছে ১৯৫৭ সালে।

উ-হানের পরে নদী-খাতের ঢাল অনেক কমে এসেছে। এই অংশে প্রাচীন কয়েকটি পর্বতমালা পেরোতে হয়েছে এই নদীকে। এই অঞ্চলে দক্ষিণ থেকে বয়ে-আসা বেশ কয়েকটি উপনদী মিলিত হয়েছে ইয়াংসির সঙ্গে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কান-চিয়াং নদী, যা ইয়াংসির সঙ্গে মিলিত হয়েছে চিউ-চিয়াংয়ের কাছে। বন্দর শহর সাংহাইয়ের সঙ্গে ইয়াংসির যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে একটি ক্যানালের (বা খাল) সাহায্যে।

হোয়াং হো নদীর মতো বন্যাজনিত সমস্যা ইয়াংসিতে কম। তবে প্রচুর বৃষ্টি হলে মাঝে মাঝে ইয়াংসি নদীতেও বন্যা দেখা যায়। ১৯৩১ এবং ১৯৫৪ সালে ইয়াংসি নদীতে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। ১৯৩১ সালের বন্যায় প্রায় ৩৪,০০০ বর্গ মাইল এলাকা জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল। এই প্রচণ্ড বন্যার সময় ৩০ লক্ষ কিউসেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন ফিট) জল প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের বন্যায় ৭ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়েছে। একটি তথ্য থেকে জানা যায় ইয়াংসি নদী থেকে প্রতি বছর ১০০ কোটি টন পরিমাণ পলি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

জল-পরিবহনের ক্ষেত্রে ইয়াংসি নদী বহুকাল ধরে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ত্রয়োদশ শতকে বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো চীন দেশে এসে ইয়াংসি নদীতে জলযানের প্রাচুর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। গরমের সময় ১০,০০০ টন ওজনের জাহাজ হ্যাংকো পর্যন্ত, ৪,০০০ টনের জাহাজ ইচ্যাং পর্যন্ত ও শক্তিশালী ১,০০০ টনের জাহাজ চুংকিং পর্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। গরমের সময় উপনদীগুলির ২,০০০ মাইল (৩,২০০ কিলোমিটার) জলপথ স্টিমার পর্যটনের উপযোগী। তা ছাড়া ইয়াংসি নদী ও এর উপনদীগুলির ২৫,০০০ মাইল (৪০,০০০ কিমি) জলপথে সাধারণ জলযান যাতায়াত করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, বছরের প্রায় আট মাসই ইয়াংসি নদী নৌ-চলাচলের উপযুক্ত থাকে।

বিগত শতাব্দীতে ইয়াংসি নদী রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজদের অধীনে ছিল। পরে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় (১৯৩৭-৪৫) ইয়াংসি নদীর ১,০০০ মাইল (১,৬০০ কিমি) জলপথ জাপান অধিকার করে নেয়। ১৯৪৯ সালের এপরিল মাসে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'অ্যামিথিস্ট' নানকিং এ যাওয়ার পথে চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর আক্রমণে তিনমাস আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু মানবিক সেবা-কাজে নিয়োজিত ছিল বলে জাহাজটিকে পরে সমুদ্রে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

গ্রন্থ-পঞ্জী

Wilcox William, 1930 : Lectures on the ancient system of irrigation in Bengal and its application to modern problems. *University of Calcutta.*

Coleman, J. M., 1969 : Brahmaputra river-channel processes and sedimentation. *Sedimentary Geology,* Special issue, Vol. 3.

গুহ সুরজিৎ, ১৯৭৬ ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূ-জল সম্পদ। **সমীক্ষা**, ১৯৭৫-৭৬

চক্রবর্তী সত্যেশচন্দ্র, ১৯৬৫ ঃ পশ্চিমবঙ্গ পরিচিতি। **অমৃত** (পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা), ৫ বর্ষ, ৩ খণ্ড, ৩৩ সংখ্যা।

বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার, ১৯৭৮ ঃ ভারতের খনিজ সম্পদ। **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ**, পৃ ২১৮-২২১।

বসু অসীমকুমার, ১৯৮০ ঃ নদী কাহিনী। **সাক্ষরতা প্রকাশন।**

Bagchi Kanan Gopal, Munshi S. K. and Bhattacharya R., 1972 : The Bhagirathi—Hooghly basin. Proceedings of the interdisciplinary symposium. *University of Calcutta.*

——, 1944 : The Ganges delta. *University of Calcutta.*

ভট্টাচার্য কপিল, ১৯৬৯ ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা (২য় সংস্করণ)। **বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা লি।**

Mukhopadhyay, S. C., 1980 : Geomorphology of the Subarnarekha basin. *University of Burdwan.*

——, 1982 : The Tista basin— a study in fluvial geomorphology. *K. P. Bagchi & Co.*

মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্র, ১৯৮৩ ঃ তিস্তা নদী প্রকল্প ও হিমালয় পরিবেশ সংস্থান। **হিমালয় প্রসঙ্গ**, ১ সংখ্যা।

Rao, K. L., 1975 : India's Water Wealth—its assessment, uses and projections. *Orient Longman.*

Roy, A. K., 1973 : Ground Water resources of West Bengal. *C. G. W. B. Publication.*

রায়চৌধুরী প্রসিত, ১৯৭৭ ঃ আদিগঙ্গা। **বিশ্বকোষ**, ২ খণ্ড, **সাক্ষরতা প্রকাশন।**

Law, B. C., 1968 : Mountains and rivers of India (Edited). *Int. Geog. Congress, 21st Session* India.

Saha, Meghnad, 1938 : The problem of Indian rivers. Presidential address to the National Institute of Sciences of India. *Proc. N. I. S. I.*, Vol IV, No. I.

সেনগুপ্ত সুপ্রিয়, ১৯৮২ ঃ নদী। জিজ্ঞাসা।

The Encyclopedia of the World's Rivers. *Bison Books Limited, London.*

পরিভাষা

Anicut খাল বাঁধ
Aqueduct জলনালী
Barrage ব্যারেজ
Bhangar ভাঙ্গর মাটি
Deciduous forest পাতাঝরা অরণ্য
Dyke দেওয়াল
Earth dam মাটি-বাঁধ
Ebony আবলুস
Evergreen forest চিরহরিৎ অরণ্য
Feeder canal শাখা খাল
Fold mountain ভঙ্গিল পর্বতমালা
Greater Himalaya গরিষ্ঠ হিমালয়
Hardwickia অঞ্জন
Horst হর্স্ট
Humus জৈব মৃত্তিকা

Ironwood অঞ্জন
Landslide ধস
Laterite ল্যাটেরাইট
Lesser Himalaya কনিষ্ঠ হিমালয়
Littoral forest বদ্বীপ অরণ্যের অরণ্য
Masonry dam পাথরের বাঁধ
Mountain forest পাহাড়ী অরণ্য
Mountain pass গিরিদ্বার
Orogeny ভূ-বিপর্যয়
Outer Himalaya বহির্হিমালয়
Regur রেগুর
Rosewood শিশু
Saddle dam স্যাডল বাঁধ
Tidal forest বদ্বীপ অঞ্চলের অরণ্য
Weir ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধিকরণ
১২৭	১৮	পোচামপাদ প্রকল্প (অন্ধ্রপ্রদেশ) ঃ ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় এই প্রকল্পে গোদাবরী ……বাঁধ (এইরূপ পড়িতে হইবে)। ‘৪৩ মিটার উঁচু’র জায়গায় হবে ‘৩৩৪ মিটার উঁচু।’
১৬৩	৬	নদীর তালিকায় নীল নদের অববাহিকার আয়তন হবে ১১,১০,০০০ বর্গমাইল/২৮,১৪,৬০০ বর্গ কিলোমিটার।
ঐ	৮	আমাজনের দৈর্ঘ্য হবে ৪,১৯৫ মাইল/৬,৭১৫ কিলোমিটার।
১৬৫	১৮	২,৫০০ কোটি মেটরিক টনের জায়গায় ৩,০০০ কোটি মেটরিক টন হবে।
১৬৬	শেষ লাইন	৪১ মেগাওয়াটের জায়গায় হবে ৪১,০০০ মেগাওয়াট।
১৬৭	২১	৪৬,৪০,০০০ বর্গ কিমি এবং ১৮,১২,৫০০ বর্গ মাইল-এর বদলে ২৮,১৪,৬০০ বর্গ কিমি এবং ১১,১০,০০০ বর্গ মাইল হবে।
ঐ	২২	দশ ভাগের বদলে ১৮ ভাগ হবে।
১৬৯	১	শুধু দক্ষিণ আমেরিকার নয়, পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী আমাজন (পরিবর্তিত প্রথম লাইন)।
ঐ	৬	৫ম বাক্যটি ‘এক সময় মনে……পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী, কিন্তু পরবর্তী’ বাদ যাবে।
১৭২	২৫	‘উয়ো প্রদেশ’-এর বদলে ‘উয়োমিং প্রদেশ’ হবে।

শিলংয়ের কাছে সতী প্রপাত। এ ধরনের জলপ্রপাত থেকে অনু (micro)-জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। (আলোকচিত্র ঃ লেখক)

ওড়িশার একটি ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ ।
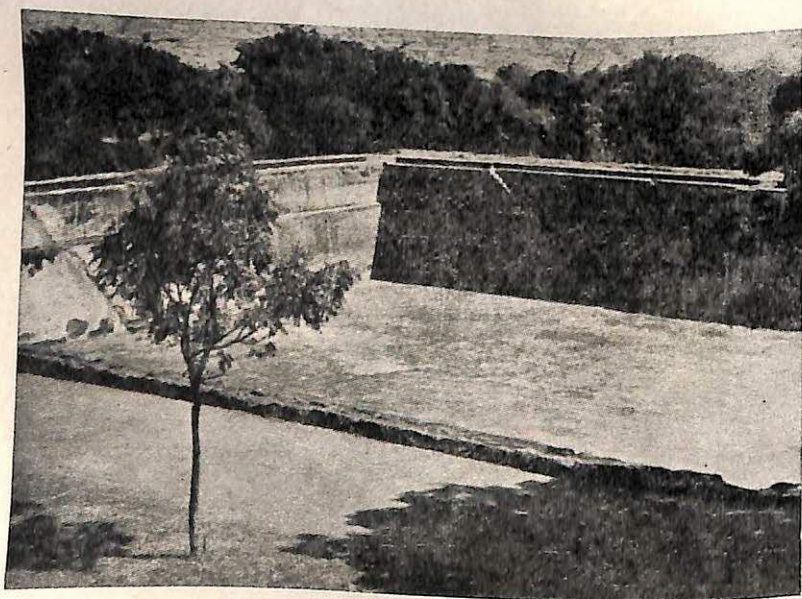
দ্বাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গাবাদের কাছে দৌলতাবাদ দুর্গের ভেতরে জল সংরক্ষণের জন্য এই বিশাল চৌবাচ্চাটি তৈরি হয় । (আলোকচিত্র ঃ লেখক)
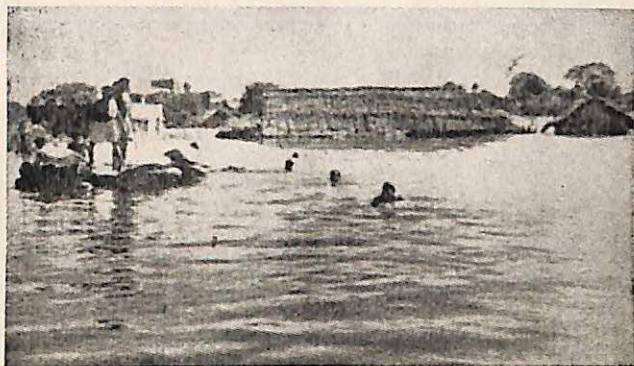
কটক শহরে বন্যার একটি দৃশ্য।

কারশিয়াং শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে মহানন্দা নদী। দু'পাশে উঁচু খাড়াই পাহাড়।
(আলোকচিত্র ঃ প্রণব রায়)
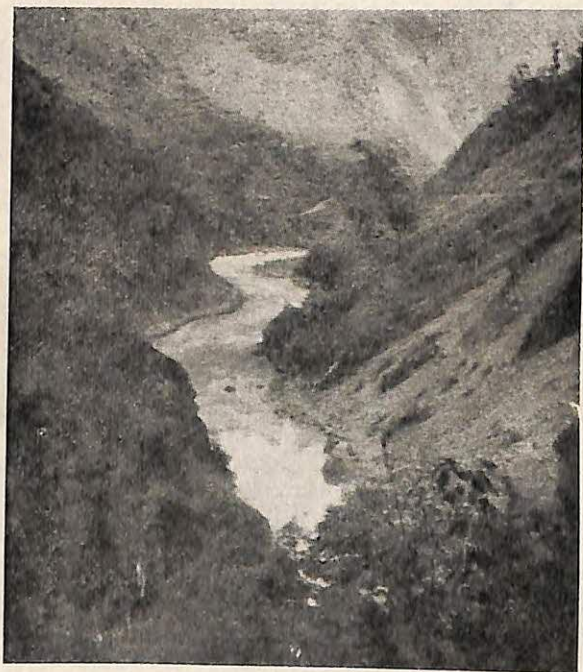
মানবাজারের কাছে পাথুরে জমি কেটে কাঁসাই বয়ে চলেছে। পাথরগুলি গ্র্যানিট নাইস।

(আলোকচিত্র ঃ প্রণব রায়)

দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জলাশয় রয়েছে, যা থেকে শ্যাওলা পরিষ্কার করে অনেক কাজে লাগানো যায়।

(আলোকচিত্র ঃ লেখক)
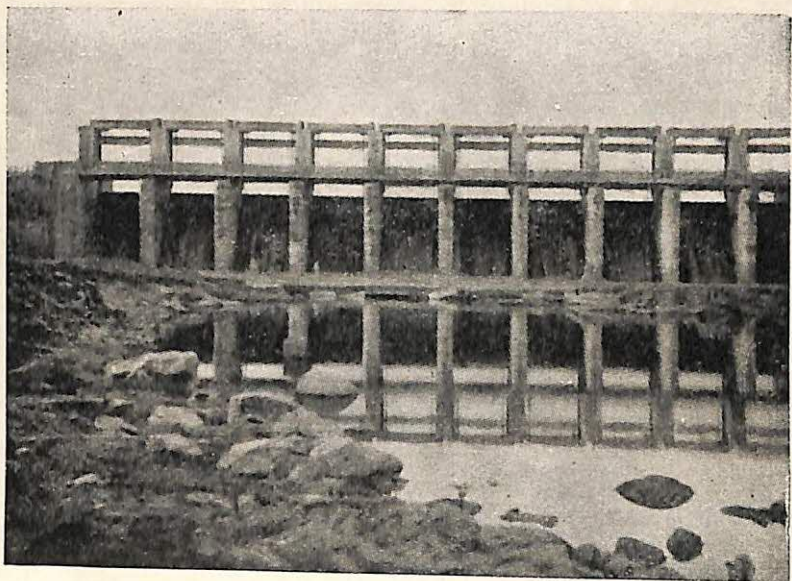
তারাফেনী নদীর বুকে নির্মিত ব্যারেজ।
(আলোকচিত্র ঃ প্রণব রায়)
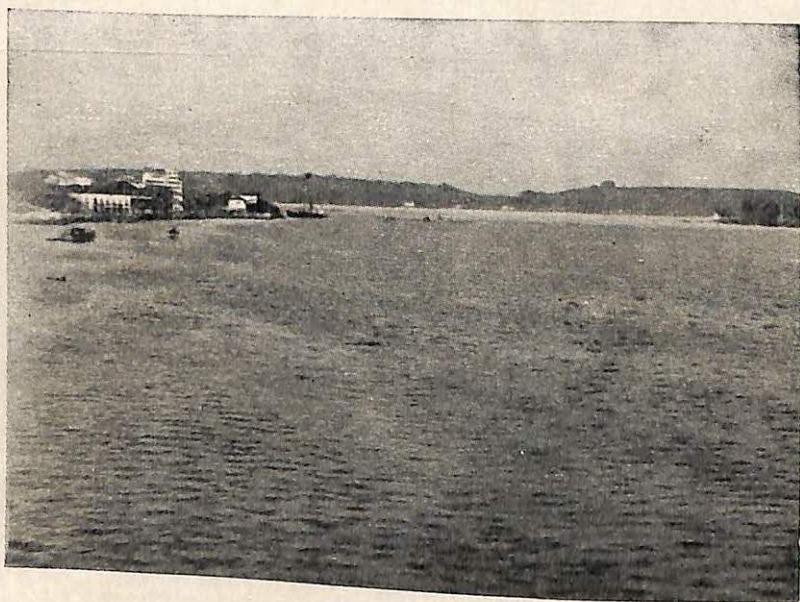
মোহনার কাছে গোয়ার মাণ্ডবি নদী। বাঁদিকে রাজধানী পানাজী।
(আলোচিত্র ঃ লেখক)

ব্রাহ্মণী নদীর উপনদী শংখ (দক্ষিণ কোয়েল) নদী শীতের সময় সহজেই পারাপার করা যায়। নদীর বুকে প্রচুর পাথর রয়েছে।
(আলোকচিত্র ঃ ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণ নদ ক্রমশ চওড়া হয়ে এসেছে।
(আলোকচিত্র ঃ প্রণব রায়)

ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা ।
(আলোকচিত্র ঃ লেখক)

শীতের সময়ে হুগলি নদী ।
(আলোকচিত্র ঃ লেখক)
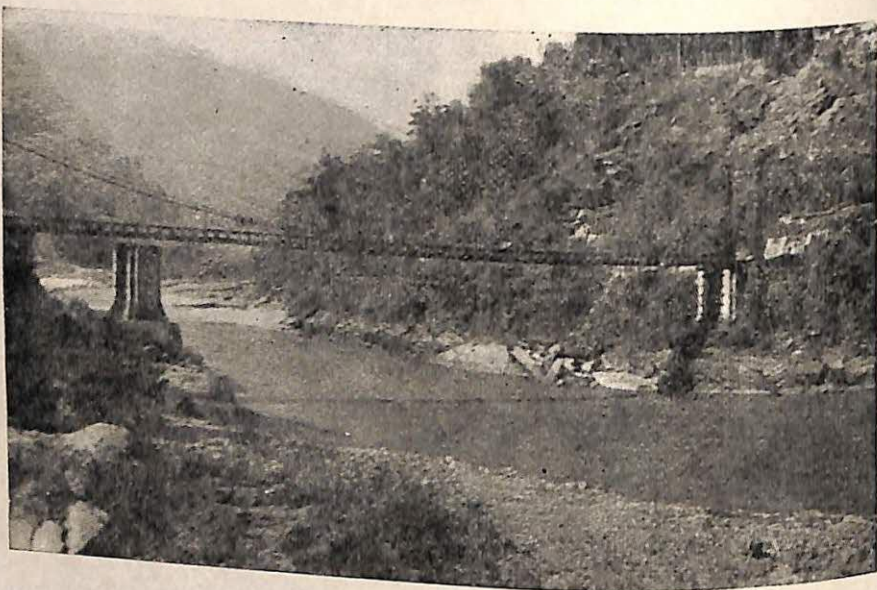
তিস্তা ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী।
(আলোকচিত্র ঃ লেখক)

বিহারের সিংভূম জেলার কালিকাপুর গ্রামের কাছে সুবর্ণরেখার উপনদী গারা। (আলোকচিত্র ঃ গৌরী রায়চৌধুরী)

কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হুগলি নদী স্নান ও নৌ-পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। (আলোকচিত্র : লেখক)

বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদী। (আলোক চিত্র : প্রণব রায়)
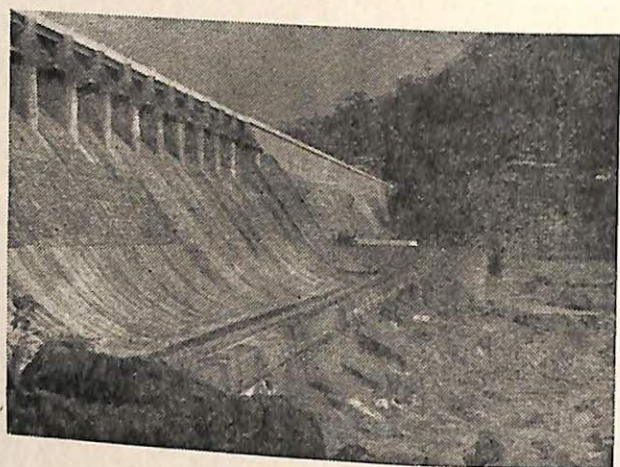
ময়ূরাক্ষী নদীতে ম্যাসানজোর বাঁধ। ওপাশে জলাধার।
(আলোকচিত্র ঃ উদয়শংকর মুখোপাধ্যায়)

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী সুবর্ণসিরি নদী অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। (আলোকচিত্র ঃ জামির আসরফ। শিশির মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।)

গোদাবরীর উপনদী কোলাব নদীর ওপর তৈরী হচ্ছে একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।
(আলোকচিত্র ঃ অসীম কুমার বসু)